সিংহর

শ্রীপারাবত





সিংহদ্বার

শ্রীপারাবত

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৬৯

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ২৯

মুদ্রক
মদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস স্ট্রিট
কলকাতা ৬

শ্রীমণীশচন্দ্র লাহিড়ী
প্রীতিভাজনেষু

সিংহদ্বার

সেই গাড়িটা ছিল ষ্টীম ইঞ্জিন। ওর স্পষ্ট মনে আছে, গাড়িটা তীব্র হুইশেল দেবার পর কিছুটা দূরে গিয়ে আর্তনাদ করতে করতে একেবারে থেমে পড়েছিল। ব্রেক কসতে কসতে যতটা দূর পারে ততটা। আর হুশ্ হুশ্ করে নয়, গল্‌গল্ করে কালো ধোঁয়া ছেড়ে আকাশটাকে আষাঢ়ের মেঘের মত ছেয়ে ফেলেছিল। ইঞ্জিনের ভেতর থেকে বাঁশীর আওয়াজের মত একটানা চোঁ চোঁ শব্দ আসছিল। পেছন দিক থেকে গার্ডসাহেব নেমে পড়েছিল কিনা দেখেনি—তবে ইঞ্জিন থেকে একজনকে লাফ দিয়ে তার কাছে ছুটে আসতে দেখেছিল। আর কামরাগুলো থেকে ঝুপ্ঝাপ্ করে কতলোক নেমে পিলপিল করে এসে জমা হয়েছিল তারই আশেপাশে, লাইনের ধারে যেখানে তার বাবা আর মা পড়েছিল। উরু থেকে দ্বিখণ্ডিত হওয়া মায়ের একখানা পা লাইন থেকে অনেকটা দূরে ছিটকে এক ধরনের ফুল-ফোটা বুনো গাছের পাশে পড়ে ছিল। সে আগে জানত না মায়ের পায়ের রঙ অত ফর্সা। ঠিক সাদা কাগজের মত। বাবার পায়ের অনেকখানি সে হামেশাই দেখতে পেত তেল মাখবার সময়। মায়ের পা অমন নয়। এতটুকু লোম ছিল না তাতে।

কে একজন মন্তব্য করেছিল—ছেলেটা দারুণ শক্ত তো।

আর একজন বলেছিল—বোধহয় ওর কেউ নয়।

—কি খোকা, ওঁরা তোমার কেউ হন ?

ও বলেছিল—আমার বাবা, আমার মা।

—দেখলেন মশাই ? উঃ কী শক্ত। আমারই শরীরের মধ্যে অস্থির করছে অথচ—

একজন রেলের পোশাক-পরা লোক ভীড় সরিয়ে সামনে এগিয়ে এসে বলল,—আপনারা গাড়িতে গিয়ে উঠুন। এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে প্রথম চোটে বোধশক্তি থাকে না। নার্ভ টার্ভ কিছু নয়। হয়ত এক ঘণ্টা পরে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। একদিন পরেও হতে পারে।

—তাই কখনো হয় ?

—হয়। এই বিশ বছরে লোহার লাইনের ওপর অমন কত দেখেছি।

লোকটি ওকে নিয়ে গেল গার্ডের গাড়িতে। সেখানে কী হয়েছিল সে জানে না। হয়ত সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরে এক সময় তার ঘুম ভেঙেছিল। তখন আর সে রেলগাড়িতে ছিল না—একটা বিছানার ওপর পড়েছিল। তার বিছানার পাশে পর পর অনেক খাট। সেইসব খাটেও মানুষ শুয়েছিল। সে ধীরে ধীরে মাথা

ঘুরিয়ে দেখতে পেল কয়েকজন লোক তাকে ঘিরে বসে রয়েছে।

—তোমার নাম কি? টুপি পরা একজন প্রশ্ন করেছিল। পুলিশের মত দেখতে।

—মৃণাল।

—পদবী?

—চৌধুরী। মৃণাল চৌধুরী।

—ওঁরা তোমার বাবা আর মা হতেন?

মৃণালের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল মায়ের সেই মসৃণ আর খুব ফর্সা পা। একটাও লোম নেই বাবার মত। মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আবার বোধহয় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মৃণাল যখন জাগল তখন তার মাথার ওপর লাইট জ্বলছে।

লোকগুলো আবার এল। তার কিছুক্ষণ পরেই এল তার কাকু। এসে তাকে বাড়ি নিয়ে গেল।

মৃণাল রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবে, ঠিক এইখানে। ওই যে বুনো গাছের সেই ঝোপ, তেমনি সাদা সাদা নীলচে ফুল ফুটে রয়েছে। ওই সেই শিমূল গাছটা। আর ওই যে পুরোনো স্লিপারের স্তূপ। ছয়-সাত বছর পরেও এতটুকু নড়চড় হয়নি। ওই স্লিপারের পাশে একটা বড় গোছের পাথরে হোঁচট খেয়েছিল সে রেল লাইনের ওপারে মায়ের সই-এর বাড়িতে যাবার সময়। ব্যথায় সমস্ত শরীরটা কেমন করে উঠেছিল। তবু সে তার মুখ এতটুকু বিকৃত করেনি। বাবা তাকে কোলে তুলে নিয়েছিল।

মা বলে উঠেছিল,—কখনো তো কোলে করতে দেখিনি আগে। এখন বড় হয়েছে, না-ই বা তুললে কোলে।

—ক্ষতি কি? সত্যিই তো আদর করি না। আজ ইচ্ছে হল, ওর সহ্য শক্তি দেখে। মৃণালের মনে নেই বাবার আদরে তার ব্যথার উপশম হয়েছিল কিনা। তবে তার খুব লজ্জা হয়েছিল একথা আজও মনে পড়ে। তার বাবা তার কান্নাকে কখনো প্রশ্রয় দিত না। পড়ে গেলেও তুলে ধরত না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখত, যতক্ষণ না সে নিজের চেষ্টায় উঠে দাঁড়ায়। সেদিন পাথরে হোঁচট খেয়ে তার ভীষণ ব্যথা লাগা সত্ত্বেও সে কাঁদেনি।

বাবা বলেছিল,—মৃণাল খুব শক্ত ছেলে হবে দেখে নিও। তাই আদর করলাম। দেখছ না, চোখে এতটুকু জল নেই। এভাবে নখের কোণা উঠে গেলে আমারও চোখে জল আসত।

একটা ট্রেন আসছে। ইলেকট্রিক ট্রেন। দূর থেকে বুঝতেই পারা যায় না। কোন

রকম শোরগোল নেই—নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। আরও কিছুটা এসে ওই কেবিনের সামনে থেকে একবার কিংবা বড় জোর দুবার হুইশেল দেবে। মিষ্টি সে শব্দ—বুক কাঁপে না। প্রাইভেট মোটর গাড়ির হর্নের শব্দের মত। তারপর শোনা যাবে লাইনের ওপর শব্দ—ঢক্‌ঢক্‌—ঢক্‌ঢক্‌। একই ছন্দে। লাইনের জোড়ায় জোড়ায় চাকার সংঘর্ষে সে শব্দের উৎপত্তি।

মৃণাল লাইন থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে যায়। ট্রেনের নাকি আকর্ষণ শক্তি আছে। দীপা মাসী বলে একথা। সেই আকর্ষণে পাশের মানুষ লাইনের ওপর গিয়ে পড়ে। সাঁৎ করে টেনে নেয়—ঘোড়ার পায়ের নালের মত চুম্বকে আসল সিকি আধুলি যেমন খচ করে সেঁটে যায়। তার মা-বাবার মৃত্যুর কারণ তাই কিনা সে জানে না।

ইলেকট্রিক ট্রেনকে মৃণাল ভয় পায় না। ষ্টীম ইঞ্জিনের গাড়িকেও সে এখন আর ভয় পায় না। অথচ ভয় পেত দু-বছর আগেও। ওই গাড়ির শব্দ আর হুইশেল কানে এলে সে হয়ে উঠত আড়ষ্ট। শিরশির্ করে উঠত গোটা শিরদাঁড়া। হাতের তেলো উঠত ঘেমে। একটা নিঃসীম অন্ধকার ঝুলে পড়ত তার চোখের সামনে। কিন্তু সেই অন্ধকারকে বার বার সে রুখেছে—একেবারে গ্রাস করতে দেয়নি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলাতে গিয়ে ঠোঁট কেটে গিয়েছে বিশ্রী ভাবে। কাকীমা ধমকেছে মারামারি করে এসেছে বলে। কাকীমার ছেলেমেয়ে ঠাট্টা করেছে। তবে দীপা মাসী সস্নেহে কাছে টেনে যত্ন করে ডেটল লাগিয়ে দিয়েছে কয়েকবার—যদিও দীপা মাসী জানত না, কেন কেটেছে তার ঠোঁট।

মনে মনে কবে থেকে যেন সে দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। বুঝতে শুরু করেছিল, এ ভয়ের পেছনে কোন কারণ নেই। তারপর থেকে সে আসে রেল-লাইনের ধারে। দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে কতবার সে সোজা দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্রী আওয়াজ করা ঝড়ের গতির ষ্টীম গাড়িকে বুনো ফুল আর ওই স্লিপারের স্তূপ অতিক্রম করিয়ে দিয়েছে। তারপর আরও স্বাভাবিক হয়েছে। গাড়ি গেলেও আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে না। তবে একটু দূরে সরে যায়। দীপা মাসী বলেছে, আকর্ষণ শক্তি দুর্নিবার রেলগাড়ির ষ্টীমেরই হোক আর ইলেকট্রিকেরই হোক। মনে মনে ইচ্ছে আছে, দীপা মাসীকে অস্বীকার করে আরও কাছে গিয়ে দাঁড়াবে সে একদিন। আকর্ষণ শক্তির প্রভাবও তাকে কাটাতে হবে।

ট্রেনটা চলে যেতেই মৃণাল সঙ্গে সঙ্গে পা রাখে লাইনের ওপর। একটু গরম গরম। হাত রাখে। বেশ গরম। গাল পেতে দিলে আরও গরম লাগবে, সে জানে। তবে গালে ফোস্কা পড়বে না নিশ্চয়। যে উত্তাপে গালে ফোস্কা পড়ে সে উত্তাপে বেশীক্ষণ হাত রাখা যায় না। সামনে চাইতে ট্রেনের পেছনের দিকটা নজরে পড়ে।

সন্ধ্যে হয়নি—তবু পেছনের লাল লাইট জ্বলে রয়েছে। আরও সামনে অনেক দূরে ঠিক লাইনের ওপরেই নেমে পড়েছে লাল সূর্য। স্টপ্। ভূ-ভারতের সমস্ত ট্রেনকে থামিয়ে দেবার জন্য বিধাতার সৃষ্টি বিরাটাকার এক রেড-সিগন্যাল। তবু গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে—ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, তারপর কেমন অদ্ভুতভাবে লাইনের ওপরেই মিলিয়ে যায়।

সামনের ওই আকাশ রেল লাইনের ওপর নামিয়ে দিয়েছে রেড সিগন্যাল। সেই সিগন্যালই যেন আস্ত গিলে খেলে অতবড় ট্রেনটিকে। কিংবা পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে অপেক্ষা করছে, আর একটি অমন যদি পাওয়া যায় শেষ বেলায়। সময় বড় কম—আর পাবে না। মৃণাল জানে পনেরো মিনিটের মধ্যে পশ্চিম দিকে যাবার মত আর গাড়ি নেই। পরের গাড়িটা আসবার আগেই ওই অতবড় রক্তবর্ণ পদার্থটি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আকাশ থেকে খসে পড়বে অতলে। শুধু তার গায়ের আলগা আলতা-রঙ মিশে রইবে কিছুক্ষণ আকাশের ঢেউ-এর সঙ্গে। তারপর ধীরে ধীরে ফিকে হতে হতে একেবারে মিলিয়ে যাবে।

ওই ভাবেই হয়ত চেয়ে থাকত মৃণাল পশ্চিম আকাশের দিকে সূর্যের অধঃপতন দেখতে। পেছনে কিসের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাতে হয়। দেখে বেশ কিছুটা দূরে লাইনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে একজন। লোকটা কাটা পড়েনি সে জানে। ট্রেনটিকে ফাঁকা লাইনে আসতে দেখেছে। তাছাড়া, কাটা পড়ার পরে ওভাবে মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ হবার সম্ভাবনা কারও থাকে না বলেই তার ধারণা। আর ডান হাতখানা লাইনের ওপর বুলিয়ে চলেছে কেমন। যেন আদর করছে ইস্পাতের শক্ত আর ঋজু দেহটিকে।

মৃণাল এগিয়ে যায়। লোকটির মাথার কালো চুল সূর্যের আলোয় লাল হ ওঠবার কথা নয়, অথচ একটা রক্তাভা মিশে রয়েছে তাতেও। সর্বাঙ্গ লাল নিজের বাহুর দিকে চেয়ে দেখে মৃণাল—লাল। হাফ-প্যাণ্ট কিছুটা উঁচুর দিে উঠিয়ে উরুর দিকে দৃষ্টি ফেলে। অপূর্ব দেখাচ্ছে। সে জানে, তার রঙ কালো হলেও উরুর মত ফর্সা স্থান দেহের আর কোথাও নেই। মায়ের উরু ঠিক কাগজে মত দেখাচ্ছিল সেদিন। বাবার পা কাটা পড়েনি। বাবার পেট আর বুকের মাঝা মাঝি জায়গায় কিছু একটা হয়েছিল। অদ্ভুত ভাবে তুমড়ে লাইনের ঠিক পাশে প ছিল বাবা।

মৃণাল ক্ষেপা ঘোষকে চিনতে পারে। বলতে গেলে তাদের প্রতিবেশী মিউনিসিপ্যালিটির ছোট-খাটো কর্মচারী। কেউ বলে বেয়ারা—কেউ বলে পিয়ন মৃণাল অতশত তফাৎ বোঝে না। তবে ক্ষেপা ঘোষ যে খাকি পরতে ভালবা

একথা সে জানে। ওটা মিউনিসিপ্যালিটির ইউনিফর্ম নয়। আর ওই খাকির জামার বাঁ দিকের বুক-পকেটের ওপর লাল সুতো দিয়ে লেখাটাও কর্তৃপক্ষের আদেশে ওখানে স্থান পায়নি। ক্ষেপার বউ-এর সুচের কাজ প্রশংসনীয়। তারই সাক্ষ্য ক্ষেপার বুক পকেটে। গরম জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেলে শাল রিপেয়ারিং-এর দোকানে না দিয়ে ক্ষেপা ঘোষের বউ-এর কোলের ওপর ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয় অনেকেই। ও-কোল ফাঁকাই পড়ে থাকে—শিশু নেই।

কাছে গিয়ে ক্ষেপার ভাঙা ভাঙা প্রলাপ চুপ করে শোনে মৃণাল। কতবার শুনেছে এমন।

—নির্ঘাত ভালবাসি তোকে—হ্যাঁ তোকেই রে লাইন। দিনকে দিন চক্‌চক্ বেড়েই চলেছে। আর বউটা? হাতের আঙুলে টুপি পরিয়ে সুচ নিয়ে ভাবে জগৎ মাৎ। ছ্যা—ছ্যা। তোর চেকনাই বাড়ছে তো বাড়ছেই। যত গাড়ি গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে। বুক পেতে তুই-ও তো নিস কত ভার—তুই মা ধরিত্রী। অথচ ওকে দেখগে যা। ইঞ্জিনের ভার আর আমার ভার সমান হল? ইঞ্জিন, তার ওপর বগী—একটা, দুটো, তিনটে—বাযট্টিখানা মালগাড়ির বগী। বুঝে দেখ্। আহা দিনকে দিন চক্‌চক্ চক্‌চক্—সার্থক নারী জন্ম তার।

মৃণালের মুখে ফিকে হাসি ফুটে ওঠে। ক্ষেপা ঘোষ মাতাল হলে এভাবে কথা বলে যায় আপন মনে। গাছ-পালার সঙ্গে কথা বলে। ইট পাথর দেখলে প্রণাম করে জড়িয়ে ধরে।

—ক্ষেপা দা'।

—দেখ্‌লি তো? বলেছি না? কাউকে সোহাগ করতে দেখলেই চর পাঠায়। ঠিক পাঠিয়েছে। তোর গুষ্টির ক্ষেপাদা। না না, ওভাবে পিছলে যাস্ না হাত থেকে। তোকে বলছি না। আমি তোরই। বউ বিয়ের পর একটা চিঠিতে লিখেছিল না? একান্ত তোমারই? ঠিক তেমনি মাইরি। এসব শয়তানের কারসাজি। ক্ষেপাদা, না ঘোড়ার ডিম। ভুলছি না বাবা। ধ্রুব সাধনা করবার সময় সাধনার বারোটা বাজাতে কত চেষ্টাই না হয়েছিল। বুদ্ধদেবের সামনে মার এসে হাঁউ-মাউ-কাঁউ—কত ছেনালীপনাই না দেখালো। পারলো কিছু করতে? পারলো না। উঁহুঁ। এবেলাতেও পারবে না। আমি একান্ত তোরই

ক্ষেপা ঘোষ লাইনটাকে আঁকড়ে ধরে ভাল ভাবে। তার পাশে লাইনের ধারে একটা চটের থলে পড়ে রয়েছে। থলে থেকে চাল বার হয়ে মাটিতে পড়েছে। মৃণাল থলিটাকে তুলে নেয় নিজের হাতে।

—ক্ষেপাদা, ডাউন দিয়েছে।

কথাটা ক্ষেপার কানে পৌঁছবার পরও কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। তারপর তালে তালে মাথা নাড়ে। চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের সন্ন্যাসীকে অমন মাথা নাড়াতে দেখেছে সে। শেষে বেশ একটা উত্তেজনা নিয়ে ক্ষেপা সহসা বলে ওঠে—ডাউন ডাউন ইউনিয়ান জ্যাক। হি হি। মনে আছেরে? কোথায় ছিল বউ তখন? তুই কিন্তু ঠিক ছিলি। চক্‌চক্—চক্‌চক্। সেই কলেজের মাস্টারটা যেমন হাত নাড়িয়ে আবির্ত্তি করেছিল—হে মাতঃ স্বর্গের অপ্সরী উর্বশী—প্রেয়সী গো—তেমনি মাইরি।

ক্ষেপা ঘোষ লাইনকে সশব্দে চুমু খায় আর বলে,—ডাউন ডাউন ইউনিয়ন জ্যাক বুম্—মাথা কেটে গেল। গল্‌গল্ করে রক্ত—শালা পুলিশের লাঠি। মনে আছে? সেদিন ময়না-বউ কোথায় ছিল? তুই কিন্তু ঠিক ছিলি মেনকা।

দূরে ট্রেনের আভাস। সূর্যও ডুবেছে। মৃণাল ক্ষেপার কাঁধ ধরে সজোরে ঝাঁকি দিয়ে বলে—ক্ষেপাদা ট্রেন এসে গেল।

এবারে ক্ষেপা মাথা উঁচু করে। মৃণাল দেখে কপালটা ফুলে কালশিরে পড়েছে।

—কে—কে আসছে? ময়না বউ?

—না, ট্রেন।

—ওঃ, আসছে? উঠতেই হবে। নতুন বেলায় স্যাকারিনের মত মিষ্টি লাগত ওমা, দেখি মিষ্টি এক মুহূর্তেই উধাও। আগুলের মাথায় টুপি পরিয়ে জগৎ উদ্ধার করছে।

—তাড়াতাড়ি সরে এসো।

ক্ষেপা ঘোষ এবারে খানিকটা স্বাভাবিক ভাবে চায় মৃণালের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে লাইনের পাশে বসে ঝিমোতে থাকে। ওয়েস্ট কেবিনের কাছে ট্রেনটি হুইশেল দেয়। তারপর ঢক্‌ঢক্—ঢক্‌ঢক্ শব্দ।

—এই নাও তোমার চাল।

ওঃ, ঠিক। অম্লশূল—ময়নার পেটে। এক বেলাও রুটি সয় না। চারকিলো কিনতে দিয়েছিল।

মৃণাল দেখে, বড় জোর দেড় কিলো রয়েছে। সে প্রশ্ন করে,—কম বলে মনে হচ্ছে না?

—কম?

ক্ষেপা ঘোষ কী যেন ভাবে। তারপর মৃণালের হাত থেকে থলিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করে। টলতে টলতে চলে ক্ষেপা। এইভাবে কিছুদূর যেতেই অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

মৃণাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। সে জানে, বাকী পয়সা ক্ষেপা ঘোষের মেজাজ ফেরাতে খরচা হয়েছে।

সে একবার ভাবে, ক্ষেপা ঘোষকে অনুসরণ করবে। তারপর নিবৃত্ত হয়। মাতলামীর পর প্রকৃতিস্থ হলে ক্ষেপা বড় লজ্জা পায়। সাধারণ অবস্থায় সে অত্যন্ত বিনয়ী। বয়সের মাপকাঠিতে তার বিনয়ের তারতম্য ঘটে না।

ইলেকট্রিক ট্রেনটা ঝড়ের গতিতে চলে গিয়েছে। সূর্য আর বসে নেই পশ্চিমের লাইনের ওপর। ট্রেন গিয়ে পৌছবার আগেই হাঙরের মুখে তার দেহ টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। আকাশের ঢেউ-এ তার রক্ত মিশে রয়েছে। নতুন ঢেউ এসে ওই রক্ত সরিয়ে দেবে ধীরে ধীরে। কাল আবার নতুন সূর্য উঠবে।

ক্ষেপা দূরের রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হবার পর মৃণাল ধীরে ধীরে রেলের সীমানা ছাড়ে। রেলের সীমানা বলতে শুধু লাইন নয়, লাইনের পাশে অনেকটা চওড়া মাঠও বোঝায়। ওই মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলে। হাবলুর ঠাকুর্দা বলত ওটা কোম্পানীর জমি। বুড়ো লোকেরা বলে রেল-কোম্পানী। ওদের আমলে নাকি রেল-কোম্পানী ছিল। কোম্পানীর জমির পাশের বটগাছটা হল সীমানা। বট গাছের নীচে সেকালে খুন হত হামেশা। নাম তাই এখনো খুনে বটগাছ। তখন এদিকে বাড়িঘর ছিল না একটাও। নির্জন প্রান্তর আর ঝোপ-জঙ্গল। এখন টাউন বেড়ে উঠেছে। খুনে বটগাছ আর বিভীষিকার সৃষ্টি করে না। আশেপাশে লোক-চলাচল, দোকানপাট —নিরালা নয় মোটেই।

মৃণাল বট গাছের কাছে গিয়ে দেখে, হাবলু সেখানে বসে একটা বড় আখকে দাঁত দিয়ে বাগে আনবার চেষ্টা করছে। মৃণালের দিকে দৃষ্টি পড়তে একটু চোখ টেপে।

সে হাবলুর পাশে গিয়ে বসে। বিনা বাক্যব্যয়ে, হাবলু হাঁটু দিয়ে আখের খানিকটা অংশ ভেঙে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে,—তোর বাপের বংশ রেলের নীচে পড়ে নির্বংশ হবে।

মৃণাল একটু ভেবে নেয় হাবলুর কথার গূঢ়ার্থ। তারপর আখে কামড় দেয়।

হাবলু বলে,—কথাটা আমি বলিনি। হারু মাস্টার বলেছিল। তোকে নাকি লাইনের ওপর দেখেছে।

—তুই কি করছিলি এখানে?

—তোর জন্যে বসেছিলাম। ক্ষেপা ঘোষ খুব টেনেছে দেখলাম।

—হ্যাঁ, শুয়ে শুয়ে লাইনকে আদর করছিল। আমি না থাকলে ওর বউ বিধবা হত।

—মানুষটা ভাল।

—চ' যাই। দেরি হয়ে গিয়েছে।

—শুনলাম, তোর কাকা বেধড়ক পেটায় তোকে আজকাল ?

মৃণালের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। কাকা কিংবা কাকীমা বরাবরই তাকে মারধোর করে। কিন্তু কেউ কখনো জানতে পারেনি। আজকাল কাকার হাতের সঙ্গে সঙ্গে মুখটাও জোর চলে। তাই এতদিনে গোপন ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

—কে বলল তোকে ?

—যে-ই বলুক না। চেপে যাস্ কেন ? আমি হলে ঢাক পিটিয়ে বেড়াতাম।

—গুরুজনেরা একটু আধটু মেরেই থাকে।

—ঘোড়ার ডিম। আমার গায়ে বাড়ির কেউ-এ পর্যন্ত হাত ছোঁয়ায় নি। ইস্কুলে অবশ্যি, ওই ব্যাটা হারু মাস্টার মাঝে মাঝে হাত চালায়। একদিন দেবো হাতখানা ইট দিয়ে ছেঁচে।

বাড়িতে হাবলুর মার না-খাওয়াটা মৃণালের কাছে কল্পনাতীত। তবু সে জানে কথাটা সত্যি। সে অনেকবার মনে করবার চেষ্টা করেছে, তার বাবা কখনো তাকে মেরেছে কিনা। মনে পড়েনি। মা-ও মারেনি। অধিকাংশ বাবা-মা মেরে থাকে। তার বাবা-মা বেঁচে থাকলে সেও হাবলুর মতই ভাগ্যবান হতে পারত।

—হারু-মাস্টারের দোষ ততটা নেই অবিশ্যি। পড়াশোনায় তো আমি মা ভবানী। তোর মত বুদ্ধি থাকলে কাছে ঘেঁষত না। তোর বুদ্ধি আছে স্বীকার করতেই হবে। বই-পত্তর নেই, অথচ দিব্যি স্ট্যাণ্ড করে যাস। তোর কাকা বই কিনে দেয় না কেন রে ?

মৃণাল জানে, কাকার ইচ্ছে কোন কাজকর্মে তাকে লাগিয়ে দেয়। শুধু পাড়ার কয়েকজন এবং হেড মাস্টারের চাপে পড়ে তাকে ইস্কুলে পাঠায়। কিন্তু হাবলুকে একথা সে বলতে পারে না।

বলে,—অবস্থা খারাপ।

হাবলু আখের ছিব্ড়ে থু থু করে ফেলে দিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে,—অবস্থা খারাপ ? বলিস কিরে ? অত বড় বাড়ি, জমি-জমা—সব-ডিভিসান অফিসে চাকরি করে—অবস্থা খারাপ ? বীজেশ তাহলে অমন সুন্দর জামা-প্যান্ট পরে কি করে ?

মৃণাল চুপ করে থাকে।

হাবলু বলে,—আমি জানতাম, তুই কিছু বলবি না। অথচ তোর সঙ্গে আমার এত ভাব। মা ঠিকই বলে। বলে, বয়সের তুলনায় তুই অনেক বড়। তোর বয়সটুকু ছাড়া আর সবই বিশ-বাইশ বছরের ছেলের মত।

মৃণাল বিচলিত হয় মনে মনে। সে জানে, সবার মত ছোট সত্যিই সে নয়। তার বয়সী ছেলেদের অনেক কিছুই তার কাছে ছেলেমানুষী মনে হয়। তবু সে জানত

না, অন্য কেউ এটা লক্ষ্য করেছে। হাবলুর মায়ের যখন দৃষ্টি এড়ায়নি এ জিনিস, তখন আরও কতজন যে তার সম্বন্ধে এ-ধারণা পোষণ করে তার ঠিক কি?

—মাকে বলিস না মাইরি একথা। মা আমাকে বলেনি। বাবার সঙ্গে রাত্তিরে কথা হচ্ছিল, আমি শুনে ফেলেছি। মা বলে, তোর মুখে এমন কতকগুলো রেখা রয়েছে যা তোর মুখখানাকে কঠিন করে তোলে।

মৃণাল হাসে এবারে। বলে—চল্।

হাবলু উঠে দাঁড়ায়। মৃণালের মুখের দিকে চেয়ে বলে—তোর সঙ্গে আমার ভাব আছে সত্যি, তবু তুই কেমন যেন আলাদা আলাদা। যেমন ধর, অন্য কেউ হলে তার পিঠের জামা তুলে এতক্ষণে দেখে নিতাম, সত্যিই তার কাকা মারে কিনা। তোর বেলায় পারছি না। জানি, অনেক দাগ রয়েছে ওই পিঠে। তোর মুখের ওপর কোন-দিন দেখি কালশিরা, কখনো দেখি আঁচড়। তুই হরদম চেপে যাস। আজেবাজে কারণ দেখিয়ে এড়িয়ে যাস—এটা হয়েছে, ওটা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি না, তবু বলতে পারি না তুই চেপে যাচ্ছিস্।

মৃণালের কপালের ওপর তুটো রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখে হাবলু তাড়াতাড়ি রাস্তার উপর থেয়ে ফেলে দেওয়া একটা ভাবে বল মারবার ভঙ্গীতে মোক্ষম লাথি মেরে বলে, দেবুটার চোখ দিন দিন ট্যারা হয়ে যাচ্ছে।

মৃণাল ভাবছিল, বাড়ি গেলে কাকীমা একচোট নেবে। তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছিল। কাকীমার ছোট মেয়ে পুতলীর জন্মদিন কালকে। কয়েকটা জিনিস কেনবার কথা ছিল। ছয় বছরে পা দেবে পুতলী। ছয় বছর আগে তার বয়স পুতলীর সমান না হলেও, এমন কিছু বড় ছিল না সে। তারপর বাকী ছয় সাত বছরে সে সহসা বিশ-বাইশ বছর ছেলের সমান হয়ে উঠেছে। হাবলুর মাও জেনে ফেলেছে একথা। তবে পুতলীর বয়সে সে পুতলীর মত কাঁদুনে ছিল না কখনই। পুতলী অবিশ্যি মেয়ে। কাঁদুনে হবার তার জন্মগত অধিকার রয়েছে কিছুটা। কিন্তু কাকীমার প্রথম সন্তান বীজেশও কম যায় না। বয়সে সে পুতলীর চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড়, মৃণালের চেয়ে তুই বছরের ছোট। অথচ সে অনেক ব্যাপারেই কাঁদে। তবে মৃণালকে কাকা-কাকামীর সামনে হেয় করবার মত কূট বুদ্ধি তার যথেষ্ট। সেদিক দিয়ে বীজেশের পরের বোন টিটু কিছুটা উন্নত। মেয়ে হলেও, বড় একটা কাঁদতে দেখা যায় না তাকে। কাকীমা তাকে মৃণালের ওপর নজর রাখতে নিয়োগ করেছে, একথা টিটু নিজেই বলে দিয়েছে তাকে এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে মাঝে-মাঝে এটা-ওটা পেলে মৃণালকে কিছুটা স্বস্তিতে থাকতে দিতে তার আপত্তি নেই। যদিও তু-একবার কাকীমার কাছে গিয়ে তার সম্বন্ধে কিছু না বললে, মেয়ের বুদ্ধি সম্বন্ধে মায়ের

মনে সন্দেহ জাগতে পারে বলে বলতে তাকে হবেই। তবে তার গুরুত্ব যাতে কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। মৃণাল রাজী হয়েছে—রাজী হয়েছে টিটু সাফ্ কথা বলে দেবার জন্যে। বীজেশের চেয়েও বুদ্ধিমতী হয়ে, বীজেশের মত কূট নয় বলে টিটুকে সে পছন্দ করে খানিকটা।

—বুঝলি মৃণাল, দেবুটা টেরিফিক ট্যারা হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন।

—হুঁ।

—অথচ দেখ্। দেবুর মা কিংবা বাবা কেউ ট্যারা নয়।

—এমনিতেই অমন হয়ে যায়।

—দেবুটা যাচ্ছেতাই কথা বলে।

—কি কথা?

—মুকুন্দ ঢোলের বড় ছেলের দাড়ি, গোঁফ ওঠেনি বলে বাপের সামনে বলেই উঠেছিল, মুকুন্দস্য পুত্র; মাকুন্দ।

মৃণাল হেসে ফেলে।

পুলিশ লাইনের মাঠের পেটা-ঘন্টায় সাতটা বেজে যায়। সন্ধ্যে ঘোর। কাকীমার কাছে নয়, খোদ ককার কাছেই নির্যাতন সইতে হবে আজ। বাড়ি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে কাকীমার গম্ভীর মুখখানা গন্‌গন্ করবে, টিটুর মুখে উদাসীনতা ভেসে উঠবে। বীজেশ দাঁত বার করে কুৎসিত ভাবে হাসবে। এমন কি পুতলীও কীসের এক প্রতীক্ষায় বাবা বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত জেগে রইবে।

হঠাৎ থেমে পড়ে মৃণাল বলে—তুই বাড়ি যা হাবলু।

—তুই যাবি না?

—না। দীপা মাসীর বাড়ি হয়ে যাব।

হাবলু স্পষ্টতই মনঃক্ষুণ্ণ হয়। অথচ কিছু বলে না। মৃণাল তার হাত ধরে হেসে বলে, তুই খুব ভাল ছেলে। তাই বাড়িতে তোকে কেউ মারে না। শোন কালকে তোকে খেজুরের রস খাওয়াব।

—উঠেছে?

—লাইনের ওপারে হাঁড়ি বেঁধেছে দেখে এসেছি।

—চুরি করবি?

—হ্যাঁ।

—কচু মিশিয়ে রাখে শুনেছি।

—ওরা গুড় তৈরি করে না। রস বেচে। কচু মেশায় না। তোকে অন্ধকার থাকতে ডাকব কিন্তু। এক ডাকে যেন ঘুম ভাঙে।

হাবলু হাসি মুখে, পরিষ্কার মনে বিদায় নেয়। মৃণাল একটা লাইট পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাবলুকে চলে যেতে দেখে। এইমাত্র পোস্টটির কম-জোর আলোটি জ্বলে উঠল। সে আলোয় মাটিতে পড়ে মৃণালের অস্পষ্ট ছায়া।

দীপা মাসীর বাড়িতে গিয়ে এখন লাভ নেই। সনৎবাবু এসময়ে বাড়িতে থাকে। দীপা মাসী সর্বক্ষণ তাকে সনৎবাবুর সামনে বসিয়ে রাখবে। মানুষটিকে মৃণাল একদম পছন্দ করে না। সেও যে মৃণালকে দেখে খুব খুশী হয়, এমন মনে হয় না। তবু দীপা মাসীর মুখের দিকে চেয়ে মৃণাল সুবোধ বালকের মত ঠায় বসে মাসীর কার্যকলাপ দেখে যায়। কার্যকলাপ বলতে স্বামীর প্রতি তাঁর অনাবশ্যক যত্নাধিক্য। লোকটার সঙ্গে মাসীর বয়সের পার্থক্য বড় বেশী—এ বিষয়ে মৃণাল নিঃসন্দেহ। সনৎবাবুর কানের দুপাশের চুলে বেশ পাক ধরেছে। গোঁফ-দাঁড়ি কামানো হলেও কাশফুলের মত দু-এক গাছা শিষ লোকটার অলক্ষ্যে মাঝে-মাঝে এদিকে সেদিকে মাথা খাড়া করে থাকে। এমনকি নাকের ভেতর থেকে দু-একটা সাদা চুলও উঁকি মারতে দেখেছে মৃণাল। সনৎবাবু কখন দাড়ি কামায় কিছুতেই ধরতে পারে না সে। খুব সকালে এসেও মুখখানাকে বেশ পরিপাটি এবং পরিষ্কার দেখেছে। হয়ত শেষ রাতে কিংবা প্রথম রাতে ওসব মিটিয়ে রাখে। কিন্তু যতই মেটাক, বয়স তো আর শুধু দাড়িতে নয়। সনৎবাবুর সর্বাঙ্গে স্থবিরত্বের ছায়া পড়েছে। অপরদিকে দীপা মাসীর চেহারা ঠিক বিপরীত। অনায়াস ভঙ্গী, ছটফটে—ফর্সা মুখখানা লাল দেখায় পুতুলী কাঁদার আগে যেমন দেখতে লাগে। দীপা মাসী যে রীতিমত কম বয়সী এ-বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। আর কম বয়সী বলেই সনৎবাবুকে মৃণাল দেখতে পারে না। এমনকি দীপা মাসীর ওপর তার রাগ হয় মনে মনে। এই রাগ ফেটে পড়তে চায় যখন তাকে সনৎবাবুর সামনে বসিয়ে মাসী কারণে অকারণে লোকটির যত্ন-আত্তি শুরু করে দেয়।

মৃণাল ভাবে, আজ আর সে যাবে না। এখনো একটু জোরে হাঁটলে হাবলুকে ধরে ফেলতে পারে। অমৃত হালুই-এর মিষ্টির দোকানের ওদিকে সে এখনো যায়নি। আসলে হাবলু তাড়াতাড়ি পথ চলতে পারে না। কথায় কথায় দাঁড়ায়—এটা ওটা হাঁ করে দেখে—আবার চলে।

সনৎবাবু নিশ্চয়ই বাড়িতে রয়েছে। ঠাণ্ডা পড়েছে। গলায় মাফলার জড়িয়ে তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে বই পড়ছে। চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় সে। ভীষণ পণ্ডিত নাকি লোকটা। কলেজে ওর মত পণ্ডিত আর নেই। সবাই শ্রদ্ধা করে। শুধু মৃণাল ঘৃণা করে। দীপা মাসী বারবার লোকটার মাফলার ঠিক করে দেবে। কথায় কথায় চা এনে দেবে। মাঝে মাঝে গরম জলের সঙ্গে নুন মিশিয়ে কুলকুচি করতে দেবে। এমনকি পায়ের কাছে বসে পড়ে টেবিলের নীচে থেকে চটি জোড়া

টেনে এনে পাশে রেখে দেবে। অথচ ইচ্ছে করলে অতি সহজেই চটি জোড়ার নাগাল পেতে পারে লোকটা। সর্বক্ষণ স্বামীর খুঁটিনাটির দিকে এত নজর দীপা মাসীর যে, সে যে একজন মানুষ মিনিটের পর মিনিট বোবা হয়ে বসে রয়েছে, সেদিকে চোখই পড়ে না। অনেকক্ষণ পর পর হয়ত এক আধটা দায়-সারা প্রশ্ন করে। উত্তর দিতে গা জ্বালা করে মৃণালের। খেতেও দেয় না কিছু। বড় জোর স্বামীকে আদা ছেঁচে চা করে দেবার সময় একবার বলবে, খাবি নাকিরে? পরক্ষণেই আবার নিজেই বলে উঠবে, নাঃ, এ বয়সে অত চা খাওয়া ভাল নয়। যেন সে প্রতিদিন কাপের পর কাপ চা ধ্বংস করার জন্যেই আসে।

সনৎবাবু না থাকলে দীপা মাসীর আবার অন্যরূপ। তখন মৃণালকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না। এটা ওটা খেতে দেয়। ভুল করে একবারের জায়গায় দুবার চা করে দেয়। তারপর বলে,—যা, এক-আধদিন বেশী খেলে কিছু হয় না। সনৎ পোদ্দার নামে যে কোন ভদ্রলোকের অস্তিত্ব পৃথিবীতে রয়েছে মাসীর হাবভাব লক্ষ্য করলে সে বিষয়েও সন্দেহ জাগে।

কেন এমন হয় ভেবে পায় না মৃণাল।

মাসীর এই দুটি বিপরীত রূপের কারণ অনেক মাথা ঘামিয়েও সে আবিষ্কার করতে পারেনি। হয়ত কোন রহস্য রয়েছে। কিংবা বোধহয় সব মানুষেরই এই রকমের দুই রূপ। যেমন তার নিজের। কাকীমার কাছে সে চোর অথচ অনাত্মীয় মাসীর কাছে দাপট। আবার সনৎবাবু থাকলে সে বোবা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত দীপা মাসীর বাড়ির দিকে চলতে শুরু করে মৃণাল তারপর এক সময় দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার মুখ খুশীতে ভরে ওঠে। সনৎবাবু পড়ার ঘরে আলো জ্বলছে না। দীপা মাসীর ঘরে আলো ছিল। মৃণাল সেখানে যায়। বিছানায় বসে উল বুনছিল মাসী। রঙীন উল। নিজের জন্যে কিংবা অন্য কারও জন্যে তৈরি করছে। সনৎবাবু রঙীন জিনিস পরে না।

মাসী উলের কাঁটা ফেলে রেখে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। মৃণাল লক্ষ্য করে দীপা মাসী অন্য দিনের মত তাকে দেখে হেসে গলে পড়ল না। তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে কী যেন দেখতে থাকে।

ফিস্‌ফিস্ করে বলে মাসী,—পালিয়ে এলি মৃণাল?

—না তো? কেন? পালাবো কেন?

—আমি সব শুনতে পাই। তুই আমায় কিছু বলিস না বলে, চুপ করে থাকি।

—লোকে কত কথা বলে মাসী। কান আছে বলে, শোনে সবাই। মনে রাখলে চলে না।

—তার মানে, যা শুনি সব সত্যি ?
—তুমি কি শুনেছ, আমি কেমন করে বলব ?
—না বুঝলে, ওভাবে বলতিস না। তোর খুব কষ্ট, তাই নারে ?
—কোন্ কষ্টের কথা বলছ ?
—সব কিছুর। খাওয়া-পরা-থাকা—সব কিছুই।
—আমি পেট ভরে খাই।
—হয়ত খাস্।
মাসী তার কথা বিশ্বাস করেনি, এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট। এখানে এ পর্যন্ত কখনো সে খাওয়ায় অনিচ্ছা প্রকাশ করেনি। বরং যথার্থ ক্ষুধার্ত বলে, মাসীর হাতের খাবার অতি আগ্রহে খেয়েছে প্রতিবারই। হয়ত তার আগ্রহের মধ্যে খুব বেশী রকম ক্ষুধার্তের কদর্য ভঙ্গী ফুটে ওঠে।
তাই ধীরে ধীরে বলে,—তবে ক্ষিদে না থাকলেও তোমার হাতের খাবারে আমার সব সময় লোভ।
মাসী হাসে। কিন্তু সে হাসিতে রোজকার মত আনন্দ ঝরে পড়ে না অতটা। বলে,—খুব চালাক হয়েছিস।
কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় মৃণাল বলে, তাকে দেখছি না তো ?
—কাকে ?
—এ সময়ে তো কোথাও যেতে দেখিনি কখনো।
—চল্, খাবি চল্।
—ওর গলায় ঠাণ্ডা লাগবে না ?
—ডেঁপো হয়েছিস খুব—তাই না ?
—না মাসী, সত্যি কথা বলছি। এমনিতেই তোমার পরিশ্রমের অন্ত নেই। ওর ঠাণ্ডা লাগলে কি এক মুহূর্ত অবসর পাবে ?
—আমার অফুরন্ত অবসর। দেখতে পাস্ না ?
—হ্যাঁ। তবু মনে হয়, তুমি অনর্থক খুব পরিশ্রম কর ওটার জন্যে।
—এ আবার কেমন কথার ধরন ? দু-চোখের বিষ হলেও বয়সে যে বড় তার প্রতি সম্মানটা কথায় অন্ততঃ প্রকাশ করা ভাল। মেশো বলতে আপত্তি কি ?
—ভাল লাগে না।
—বেশ বলিস না। অমন পাকা পাকা কথাও আর বলতে হবে না।
—আমিও ওই ঘরে অমন কাঠের পুতুলের মত বসে থাকতে পারব না ওই মাফ্লার জড়ানোটার সামনে। আর তোমার এখানে একবার কিংবা দুবার চা খেলে আমার

শরীর খারাপ হবে না।

—বেশ। রাজী। এবারে বল্, এ সময়ে কেন এসেছিস্? কখনো তো আসিস না।

—এমনিতে। আসতে নেই?

—আসবি বৈকি। হাজার বার আসবি। কিন্তু কেন এসেছিস্? পালিয়ে?

—না। পালাবো কেন?

মাসী মৃণালকে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ডবল ডিমের অমলেট করতে বসে। মৃণাল বুঝতে পারে, তার পেটের খিধে মুখের রেখার মধ্যে অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে। তাকে যখন খুশী আসতে বলার মধ্যে একটি উদ্দেশ্যই রয়েছে মাসীর। রোজ তাকে খেতে দিলে খিধের সময় সে আসবেই। তখন মাসী তার ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করবে। হাবলুর মা বলেছে সে নাকি বিশ-বাইশ বছরের যুবকের মত পরিণত। আসলে সে তেরো কি চোদ্দ। হাবলুর মা যতটা ভাবে, ততটা পরিণত হলে দীপামাসী তাকে ছোট্টটি ভাবত না, এবং তার শুক্‌নো মুখে খালি পেটের ছাপ লেগে থাকতে দেখে এই মেয়েলী কৌশলের আশ্রয় নিতে সাহস পেত না। বড্ড ছোট মনে হয় নিজেকে—অথচ তেরো গিয়ে চোদ্দয় পা দেবে আসছে ফাল্গুনে। নিজের ওপর রাগ হয়। খিদের সময় একটা আয়না মুখের সামনে তুলে ধরে পেটের জ্বালার চিহ্নটুকু যাতে না ফুটতে পারে সেই অভ্যাস করবার জন্যে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

মাসীর অমলেটের গন্ধে মুখে জল আসে। সেই জলের টক-টক স্বাদ। হাবলুর আখের মিষ্টত্ব এই সময়টুকুর মধ্যেই অম্ল হয়ে উঠেছে। মাসী একবার আড় চোখে চায়। হয়ত প্রতিদিনই এভাবে চেয়ে দেখেছে। আজ ধরা পড়ল। মৃণাল গম্ভীর এবং নিরাসক্ত ভাবে বসে থাকে।

—কি ভাবছিস রে অত?

মৃণালেরও ইচ্ছে হচ্ছিল মাসীকে সেকথা প্রশ্ন করা। স্টোভের আলোয় মাসীর মুখে চিন্তার নানা তরংগ ঢেউ তুলছিল। মুখখানা আরও লাল আরও কম বয়সী মনে হচ্ছিল।

—কিছু না।

—অন্যদিন কথা বলিস। অথচ আজ গম্ভীর!

—ও কখন ফিরবে?

মাসী বিরক্ত হয় যেন। একটা ডিসের ওপর অমলেট রেখে এগিয়ে দিয়ে বলে,—জানিনে। দেখ তো নুন হয়েছে কিনা?

—ঠাণ্ডা হতে দাও।

মাসী মৃণালের হাব-ভাব লক্ষ্য করে কিছুক্ষণ। তারপর বলে,—চোখ বন্ধ করে

ার কথা শুনলে মনে হয় তুই যেন আমার সমবয়সী।
-তাকিও না তবে।
সী হাসে। বলে,—তোর মুখখানাও দিন দিন কঠোর আর রুক্ষ হয়ে উঠছে। ক যেন পুরুষ মানুষ। মুখে অত কাটাকুটি কেন রে? সামলাতে পারিস না?
াল চামচ দিয়ে আমলেট খেতে শুরু করে। কোন রকম আগ্রহ না দেখিয়ে রে ধীরে খায়। যদিও তার মনে হচ্ছিল চার জোড়া ডিম ভেঙে অমলেট বানিয়ে লেও তার পেট ভরবে না
াওয়া শেষ করে চামচটা ডিসের ওপর রাখবার সঙ্গে সঙ্গে মাসী হঠাৎ তার পেছন কে সরে এসে পিঠের জামা তুলে ধরে
-উঃ একী!
াং-এর মত লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়ায় মৃণাল। সারা দেহ শক্ত লোহা হয়ে ওঠে। াখ জ্বলতে থাকে ধক্ ধক্। পিঠের নতুন-পুরোনো অসংখ্য ক্ষত আর ক্ষতচিহ্ন াকে যেন এতদিনের সয়ে থাকা বোবা-বেদনা আর্তনাদ করে ফুটে বার হয়। মাসীকে ক ধাক্কায় দূরে সরিয়ে দিয়ে সে চাপা গলায় বলে ওঠে,—তুমি অমানুষ।
াপা মাসী আকুলভাবে দুহাত বাড়িয়ে বলে,—মৃণাল, শোন—
-না। তোমার সমবয়সী না হতে পারি। তাই বলে ভেবো না আমি ছেলেমানুষ। াবারের লোভ দেখিয়ে কিনতে পারবে না।
-মৃণাল।
াল ছুটতে থাকে। দীপা মাসীর বাড়িতে শেষবারের মত আসা তার হয়ে গেল। র পর আর কোথাও যাওয়ার জায়গা রইল না। পেছনে তখনো মাসীর ভগ্ন কণ্ঠের াক ভেসে আসছে। তাকে বোকা ভাবত মাসী। ভেবেছিল, তার চোখ দিয়ে জল ার করে নিয়ে, তারপর আদর করবে। অত সস্তা নয়। লাইনের ধারে স্লিপারে হাঁচট খেয়েও চোখে জল আসেনি বলে বাবা তাকে কোলে তুলে নিয়েছিল। সাত ছরের ছেলেকে আদর করেছিল। এরা চোখের জল দেখতে চায়। তারপর জল ার হলে, সখ করে সে-জল মুছিয়ে দিতে চায়। অপরের চোখে জল দেখে নিজের নে দুঃখ জাগানো এদের বিলাস। এই বিলাসের উপকরণ সে হবে না। অত ছোট য়। সত্যিই সে হাবলুদের বয়সী হয়েও অনেক বড়।
াল দৌড় থামিয়ে হাঁটতে শুরু করে। এর মধ্যেই তাকে দৌড়তে দেখে অনেকে াকিয়েছে। তার বয়সে দৌড়টা এমন কিছু ছন্নছাড়া জিনিস নয়। তবু অসময়ে দৌড়লে অনেকে অনেক কিছু ভাবতে পারে।
াটতে হাঁটতে অমৃত হালুই-এর মিষ্টির দোকানের সামনে আসে সে। দোকানের

বিপরীত দিকে নর্দমার কালভার্টের ওপর বসে "জয় মা কালী সাইকেল স্টোর্সের" জীব
আর ভেলু বিড়ি ফুঁকছিল। কিছুদিন আগে ওরা একই দিনে, একলগ্নে নতুন
প্রাণনাথ গোঁসাই-এর দুই মেয়েকে বিয়ে করেছে। প্রাণনাথ বলে বেড়ায়,—বিয়ে বে
করেনি, উদ্ধার করেছে। মেয়ে দুটোর জন্যে শান্তি ছিল না মানুষটার। কত ক
অকথা আর কুকথা যে লোকে বলে ধুমসী মেয়ে ঘরে থাকলে। কান না পাতলে
আপনা থেকে কানে এসে ঢোকে। প্রাণনাথ গোঁসাই সে সবের কতটা বিশ্বাস কর
কেউ বলতে পারে না। ষোল আনা বিশ্বাস করলেও নির্বিকার থাকত। কারণ গা
স্কুলের ক্লার্ক হয়ে আর পুরুতগিরি করে দু-দুটো মাংসল আইবুড়ো মেয়েকে সামলাব
হিম্মং এ যুগে কারও নেই। কখনো কারও তেমন হিম্মতের খবর পাওয়া গে
রূপকথার মত শোনায়।

জীবন আর ভেলুর সদ্য-বিবাহের চাকচিক্য এখনো একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি
সেই চাকচিক্য তাদের তেল-কালি-মাখা সোনার আংটিতে আর পায়ের সাদা রং
পাম্‌সুতে।

মৃণাল তাদের দিকে এগিয়ে যায়।

—কী মৃণাল ধন, কী মনে করে?

—একটা বিড়ি দেখি?

—কেন?

—খাব।

ভেলু কালভার্ট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—সত্যি বলছিস্?

—হ্যাঁ। দেবে তো দাও।

—কবে থেকে এসব চলছে যাদু?

—তোমরাই হাতে খড়ি দেবে।

—যদি তোর কাকা শোনে? যদি হেডমাস্টারের কানে যায়?

—তোমরা বলে দেবে?

—না, আমরা বলতে যাব কোন্ দুঃখে? কারও বাড়ির ছেলে জাহান্নামে গে
আমাদের ভারি বয়ে গেল।

মৃণাল কালভার্টের ওপর বসে বলে,—ব্যস্, তাহলে দাও একটা।

ভেলু পকেট থেকে বিড়ি বার করে মৃণালের হাতে দেয়। মৃণাল সেটা ঠোঁটে দ
ধরলে, ভেলু নিজের জলন্ত বিড়ি সেটার মাথায় ছোঁয়ায়। মৃণাল কেসে ওঠে।
জীবন এবারে তার পান খাওয়া দাঁত বার করে বলে,—উহুঁ, ওভাবে নয়। প্রথ
গলায় নিস না। মুখে নিয়ে ছাড়। একটু একটু করে গলায় ছোঁয়াবি। ঠিক দ

প্রথম আদর করে—তাই নারে—ভেলু ?

—হ্যাঁ, মাইরি।

মৃণাল দুই আঙুলে বিড়ি ধরে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবে, এবারে সে আরও একটু বড় হল। তার চোখে জল এসেছে, তবে এ জল ধোঁয়া-লাগা জল। এই ভাবে তাড়াতাড়ি বড় হলে একদিন কাকা মারতে গেলেই সে রুখে উঠবে।

মুখের ভেতরটা তেতো লাগে। এ্যাঃ এর নাম বিড়ি! এতেই লোকে দেয় এত সুখ টান ? যেন কচি ভাবে মুখ লাগিয়ে চোঁ চোঁ করে জল টানা। দীপা মাসীর অমলেটের স্বাদ অন্তর্হিত হয় একেবারে। মাথা ঘুরতে থাকে।

ভেলু বলে,—রাস্তার দিকে নজর রাখ্। তোকে পাকিয়ে দিচ্ছি বলে, আমাদের বদনাম না হয়।

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—দোকানের ভেতর থেকে সাইকেলের বেলের একটানা শব্দ ভেলু আর জীবন উঠে দাঁড়ায়। জয়-মা-কালী সাইকেল স্টোর্সের মালিক তাদের ওইভাবে ডাকে। কোন নতুন কাজে হাত দিতে হবে কিংবা নতুন কোন ফরমায়েশ। মুখ বিকৃত করে দুই ভায়রা দোকানের দিকে যায়। মৃণাল লক্ষ্য করে ওদের সাদা পাম্‌সুর অনেক জায়গাতেই কালি লেগেছে। বিয়ের পরে নতুন রঙ করবার আর অবকাশ হয় নি।

হাতের বিড়ি নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে মৃণাল। ভাবে, বিড়ি জিনিসটা খেতে এত খারাপ, অথচ কাউকে সুখে টানতে দেখলে মনে হয় কত না আনন্দ রয়েছে ওতে।

রাত হয়েছে। তার ক্লাসের সবাই এতক্ষণ পড়তে বসেছে। কিছুদিন পরেই বাৎসরিক পরীক্ষা। সে পড়ছে না বলে কাকা তাকে মারবে না। কিন্তু এতটা দেরী হবার জন্যে কেউ ক্ষমা করবে না। দীপা মাসী ভেবেছিল, সে পালিয়ে এসেছে। হয়ত একদিন তাকে সত্যি সত্যিই পালাতে হবে। তবে দীপা মাসীর কাছে নয়। অনেক দূরে—দুচোখ যেদিকে যায়। এই ছোট্ট শহরকে সে ভালবাসে। বড় হলে, এই শহরে সে তার দাবী প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু তার আগে এমন জায়গায় যাবে যেখানে কাকা কাকীমা এবং তাদের ছেলে-মেয়েদের নামও কেউ জানবে না। তারা এই জগতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে বলে কেউ যেখানে জানবে না তেমনি জায়গায় চলে যাবে। বলা যায় না, কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের মত সমুদ্র পার হয়ে বহুদূর দেশেও চলে যেতে পারে। হয়ত সেখানকার বাতাসে পরিচিত ফুল ফল আর আগাছার গন্ধ থাকবে না বলে মন খারাপ হয়ে যাবে প্রথম প্রথম। হাবলু, দেবু, টোনা, ঘুঁটে আর বেচুর মত ছেলেদের দেখাও

সেখানে মিলবে না। তবু সে সহ্য করবে। সহ্য করতে করতে এক সময়ে ওদেশকেও ভাল লাগতে শুরু করবে হয়ত। ওদেশের নতুন ধরনের গাছ-গাছড়া আর ফুল ফলের গন্ধ নাকে এলে মনে হবে বুঝি শৈশব থেকেই ও-গন্ধ তার পরিচিত। শুধু ওসব দেশে রেল লাইনের ধারে অব্যবহার্য স্লিপারের স্তূপ পড়ে থাকে কিনা সে জানে না। সেই লাইনের ধারে নীলচে রঙ-এর বুনো ফুলও হয়ত ফোটে না। শিমুল গাছ আছে বলেও তার ধারণা নেই। থাকলে বড় ভাল হবে। বিকেলের লাল সূর্য ট্রেনগুলোকে গ্রাস করবার জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকলে সে ওদেশকেও এদেশ বলে ভাবতে পারবে। হ্যাঁ, রক্তাক্ত সূর্য। ওই সূর্য কি শুধু নিষ্প্রাণ রেলগাড়িকেই ডাকে—আর কাউকে নয়? বলা যায় না। তার মত নিঃসঙ্গ কিশোরকেও হয়ত ডাকে।
মৃণাল কালভার্ট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই টিটু অদৃশ্য কোণ থেকে সামনে এসে বলে,—সাবধান।
—কাকা এসেছে?
—অনেকক্ষণ। আজকে বাড়িতে না এলে তুমি ভাল করতে।
মৃণাল দু-মুঠো শক্ত করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। টিটু আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। টিটুকে আজই সকালে সে বড় বড় দুটো পেয়ারা দিয়েছে। সে নেমকহারাম নয়। আজকের রাতটা পার হলে কালকে সে আরও বেশী কিছু দাবী করবে।
এক পা এক পা করে দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে প্রথমে কাকারই চোখে পড়ে যায়। মুখ হিংস্র হয়ে ওঠে কাকার। বন্য পশুর মত উৎকট একটা শব্দ করে ছুটে এসে তার পেটে লাথি মারে। মৃণাল পেটে হাত দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। মনে হল, তার শরীরের নিম্নাঙ্গ ছিঁড়ে গেল ওপরের অংশ থেকে। তার মাথা ঘুরতে থাকে। দুবছর আগেও ষ্টীম ইঞ্জিনের হুইশেলের শব্দ শুনে চোখের সামনেটা যেভাবে অন্ধকার হয়ে আসতে চাইত, তেমনি অন্ধকার হয়ে গেল সবটা। কিন্তু এবারে আর অন্ধকার সরে গেল না তার আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও। দুপায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সে দরজার চৌকাঠের সামনে পড়ে যায় এবং কয়েক মুহূর্তের জন্যে শরীরের সমস্ত ব্যথা অন্তর্হিত হয়ে প্রশান্ত নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।
কিন্তু কয়েক মুহূর্ত শুধু অমন হল। তারপর আবার তার পেটের অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হতে থাকে। মাথার ভিতরটা ঝিম্‌ঝিম্ করে। সে বুঝতে পারে এবারে চোখ খুললে সে আর অন্ধকার দেখবে না। এবারে চেষ্টা করলে অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যেও সে উঠে বসতে পারবে। তারপর আরও একটু চেষ্টা করলে দুপায়ের ওপর দাঁড়াতেও পারবে।

কাকীমার কণ্ঠস্বর কানে এল। সে কণ্ঠস্বরে ভীতি। কাকীমা বলে,—এখন কী উপায় হবে? ও কি বেঁচে আছে?

—ওসব তোমার ভাবতে হবে না। ঠিক বেঁচে আছে। এরা অত সহজে মরে না। সবাইকে খেয়ে মরে। এখনি উঠে বসবে দেখো।

—না না, আমার ভাল মনে হচ্ছে না। তুমি তো জান, ও কখনো অমন ভাবে পড়ে থাকে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খায়। যারা শুধু দাঁড়িয়ে থাকে, তারা একবার পড়ে গেলে আর ওঠে না। নকুল ডাক্তারের ঘোড়াকে কেউ আর ওঠাতে পারল?

—আরে চুপ কর। তোমার দেখছি মাথা খারাপ হল। এরা ঘোড়ার জাত নয়, চোরের জাত। চোর মার খায়, আবার সুবিধে মত অমন ভিড়মি খেয়ে পড়ে থাকে। কোতোয়ালী থানার ছোটবাবু আমার বন্ধু। অমন অনেক দেখেছি। এর ওপরেই আবার পা চালাতে হয়। বিশ্বাস না হয়, দেখবে?

—না না, শেষে খুনের দায়ে ধরা পড়বে? ওই ছোটবাবুই তখন তোমার কোমরে দড়ি বেঁধে বাড়িসুদ্ধ লোকের সামনে দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে। বন্ধু বলে ছেড়ে দেবে না। না বাপু যথেষ্ট হয়েছে।

বীজেশ ডেকে ওঠে পাশ থেকে,—মা।

—কি রে?

—চোখ পিট্ পিট্ করছে। তাই নারে পুতলী?

—হ্যাঁ গো। আমিও দেখলাম। তাই নারে দাদা?

—কই? দেখি—দেখি—

কাকীমা মৃণালের মাথার পাশে বসে পড়ে। নাকের সামনে মুখ এনেই "উঁ" শব্দ করে সরে যায়।

কাকা প্রশ্ন করে, কি হল আবার?

—বিড়ির গন্ধ মুখে।

—কী? তুমি ঠিক বলছ?

—তবে কি মিছে কথা বলছি? তোমার মুখে নিত্যি ওই বিদ্ঘুটে গন্ধ পাই না? আমার ভুল হবে?

—মেরেই ফেলব ব্যাটাকে।

কাকার পায়ের লাথি মৃণালের গায়ে, উরুতে, পাঁজরে অবিরত পড়তে থাকে।

কাকীমা আর্তনাদ করে ওঠে,—না গো, এখন আর নয়। মরে যাবে। মরে গেলে যে আমার সব্বোনাশ হবে।

পুতলী কেঁদে ওঠে মায়ের চিৎকারে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। আর সেই কান্না মৃণালের কানে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে শেষে একসময় মিলিয়ে যায়।

তার নিথর দেহের পানে চেয়ে কাকীমা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বলে,—এ তুমি কী করলে গো—আমার কি উপায় হবে।

বীজেশ মৃণালের স্থির দেহের পানে চেয়ে মায়ের কথাই বিশ্বাস করে নিল। সত্যিই মরে গিয়েছে মৃণালদা-টা। খড়ির ঘরের পাশে ওর ছোট ঘরখানাকে এবারে পড়ার ঘর করা যাবে। কিন্তু মৃণালদা বেঁচে থাকবার সময় একটা উত্তেজনা ছিল। বাবার কাণ্ডজ্ঞান থাকলে বহুদিন এভাবে মারধোর করতে পারত। দেখেও সুখ। ওর মনে পড়ে, মৃণালদাকে এককালে 'বড়দা' বলে ডাকত। মা নিষেধ করে দিয়েছিল 'বড়দা' বলে ডাকতে।

কাকার হুঁশ হয় এতক্ষণে। ভয় চেপে বসে তার মনের ওপর। মৃণালের নাকের সামনে হাত রেখে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনরকম লক্ষণ দেখতে পায় না। নিজের সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তারপর থরথর করে কাঁপতে থাকে। আকুল দৃষ্টিতে কাকীমার দিকে চায় একবার। শেষে কী মনে করে তাড়াতাড়ি মৃণালের বুকে হাত দেয়। চিৎকার করে ওঠে— না না, বেঁচে আছে। মরেনি। শিগ্‌গির মাথায় জল দাও। জল ঢালা হয়। বীজেশের মনটা খারাপ হয়ে যায়। নাঃ পড়ার ঘরটা হল না। টিটুর কিন্তু আনন্দ হয়। কত জিনিস পাওয়া যাবে—কামরাঙা, কুল, আমড়া। মরে গেলে মুশকিল হত। তাছাড়া মৃণালকে তার খারাপ লাগে না, সত্যি কথা বলতে। দাদার চেয়ে অনেক ভাল।

শেষে মৃণালকে ধরাধরি করে খড়ির ঘরের পাশে তার নিজস্ব ছোট্ট ঘরখানিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

—হ্যাগা, বাঁচবে তো ?

—হ্যাঁ, ঠিক বেঁচে যাবে।

—যদি না বাঁচে ?

ছেলেমেয়েদের আড়ালে ফিস্‌ফিস্ করে কাকা বলে,—না বাঁচলে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। ও মরলেও আমরা তো আর মরতে পারি না। উঃ, দাদা বউদি ষড়যন্ত্র করে একসঙ্গে মরেছে। গেল তো, ওটাকে সঙ্গে নিয়ে গেল না কেন ? আপদ চুকে যেত।

এত সব কাণ্ড মৃণাল কিছুই জানে না। ব্যথার অনুভূতি ছিল না তার। ভাঙা ভাঙা স্বপ্ন দেখে চলেছিল সে। এক সময় দেখল, মায়ের ছিন্ন পা খানা তার সামনে

নটরাজের মত নাচতে শুরু করেছে। আর সেই পা বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। কত রক্ত! ঝরছে তো ঝরছেই। নাচছে তো নাচছেই। সে অস্থির হয়ে বলতে চাইল,—নাচ থামাও। ও নাচ আমি দেখব না। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ফুটল না। কে যেন দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দিয়ে তার কণ্ঠরোধ করে রেখেছে। তারপর সেই দৃশ্য অদৃশ্য হতে না হতে বাবা এসে দাঁড়াল সামনে। বাবার দেহের মাঝখানটায় কী যেন হয়ে গিয়েছে, যার ফলে মুণ্ডুটা বিশ্রীভাবে ঘুরে রয়েছে পিঠের দিকে। সেই অবস্থায় বাবা তাকে বলল,—এই তো চাই। ভাঙবি, তবু মচকাবি না। কখনো নয়।

মৃণাল চিৎকার করে বলে উঠতে চাইল—আমি জানি সেকথা। তুমি ওভাবে সামনে এসো না। তুমি চলে যাও—চলে যাও। এবারও শুধু সাঁইসাঁই আওয়াজ বার হয়। আর সে দেখল, বাবা এগিয়ে আসছে—আরও এগিয়ে আসছে—এসে তার গায়ে হাত রাখল। কী ঠাণ্ডা সে হাত। সর্বাঙ্গ শীতে শিউরে উঠল তার। ইচ্ছে হল, চিৎকার করে ওঠে,—ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না আমায়। পারল না। বাবা তার হাতখানা দিয়ে আদর করে পেছন দিকটা জড়িয়ে ধরে বলে,—আমি তোর বাবা। তোর মধ্যে আমার ভবিষ্যতের আশা লুকিয়ে রয়েছে খোকা। তোর এই মুখের প্রতিটি রেখার সংকোচন আর প্রসারণের বৈচিত্র্যের মধ্যে এখনো আমার হৃদ্‌পিণ্ডের উত্থান পতন হয়। ওই চোখের তারায় যে আলো ফুটে ওঠে, সেই আলোয় আমার ভবিষ্যতের স্বপ্নের পথ আলোকিত হয়ে ওঠে। আমায় এমন রূঢ়ভাবে চলে যেতে বলিস না।

মৃণাল অসহায় অবস্থায় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। তারপর সহসা দেখল বাবা অন্তর্হিত হয়েছে আর পরিবর্তে জায়গাটি অধিকার করেছে একটি ফ্রক-পরা মেয়ে। মেয়েটি দাঁড়িয়ে হাসছে। বাবা পিঠের যেখানে হাত রেখেছিল, ঠিক সেইখানে রেখেছে সে তার কোমল হাতখানা। এ হাতের স্পর্শ উষ্ণ। মৃণাল বিস্মিত হয়ে বলে,—তুমি দীপা মাসী? এত ছোট? দীপা মাসীর হাসিতে যেন অশ্রু ঝরে। খুব ধীরে ধীরে বলে,—হ্যাঁ, আমিই। বলেছিলাম না, আমি তোর সমবয়সী? বিশ্বাস হলো তো? তোর কোথায় ব্যথারে মৃণাল, আমি হাত বুলিয়ে দেব। মৃণাল অতি কষ্টে বলে,—সর্বাঙ্গে ব্যথা। কোথায় হাত বোলাবে মাসী? দীপা মাসী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে,—না না, মাসী নয়, শুধু দীপা। আমি যে তোর একই বয়সী। সর্বাঙ্গে আমি হাত বুলিয়ে দেব। কোন যন্ত্রণা যখন আর থাকবে না, তখন উঠব। এবারে বিশ্বাস হল তো, চোখের জল আমি দেখতে চাইনি? আমি চাই তোকে একটু আনন্দ দিয়ে নিজে আনন্দ পেতে। তোর কষ্ট দূর করবার জন্য প্রাণ আনচান করে। তোর দুঃখ যে আমারও দুঃখ বুঝিস না কেন? মৃণাল অনুতপ্তের স্বরে বলে,—বুঝেছি।

আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে? বড্ড ব্যথা। পেটেও ব্যথা। সব জায়গায় ব্যথা।

শেষে এক সময় সব কিছু মিলিয়ে যায়। একটা ভোঁতা যন্ত্রণা মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করে। ধীরে ধীরে চোখ খোলে মৃণাল। দেয়ালের উল্টো দিকে একটা নোংরা পনেরো ওয়াটের বাল্ব জ্বলছিল—সেদিকে দৃষ্টি পড়ে। তারপরই দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে বীজেশ হাসছে দাঁত বার করে। অল্প আলোয় তার কালো মুখের দন্তশ্রেণী দেখাচ্ছে অতিরিক্ত শ্বেতবর্ণের।

ওঠবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় সে। প্রথমটা কিছুই মনে করতে পারে না।

বীজেশ চোরের মত দু পা এগিয়ে এসে ফিস্ফিস্ করে বলে,—তুই বিড়ি খাস্?

মৃণাল একটু চমকে ওঠে। ধরা পড়ে গিয়েছে সে, যেভাবেই হোক। বীজেশের কথায় উত্তর দেয় না।

—মা তোর মুখে গন্ধ পেয়েছে।

এবারে একে একে সব মনে পড়ে যায়। সে বুঝতে পারে না, তার ছোট ঘরখানার মধ্যে কী করে এল সে। বীজেশের কাছ থেকে জানতে ইচ্ছে হলেও কোন প্রশ্ন করে না।

—বল্ না, বিড়ি খাস্?

—খেয়েছি একটা!

বীজেশ তার পিঠটা বিশ্রীভাবে কুঁজো করে হেসে চলে যায় দৌড়ে।

একটু পরেই কাকা আর কাকীমা আসে। কেউ কোন কথা বলে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। দুজনা দুজনার মুখের দিকে পলকের জন্যে চায়। কাকীমার মুখখানা বিদ্রূপ আর রাগে কেমন যেন হয়ে ওঠে।

কাকা চলে যেতে যেতে বলে,—লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে এসো। শুধু শুধু পয়সা খরচা।

মৃণাল অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গিয়ে শান্তি পায়। কেউ আর তাকে দেখতে পাবে না। মাথার ভেতরে দপ্‌দপানি থামে না। পেটের ভেতরেও ব্যথা। অতি কষ্টে পাশ ফিরে শোয় সে। ভাবতে চেষ্টা করে আগামী কাল ইস্কুল খোলা আছে কিনা। আজ ইস্কুল খোলা ছিল বটে। কিন্তু আজ কি শনিবার ছিল না? শনিবার যদি না হয় কালকে হয়ত ইস্কুল যাওয়া হবে না। এ-ব্যথা কি একরাতে সেরে যাবে?

পুত্‌লীর বেড়াল 'খোকা' পায়ের কাছে এসে যথারীতি শুয়েছে। পুত্‌লীর আদরের বেড়ালের পুত্‌লীর শয্যায় স্থান নেই কাকীমার আদেশে। তাই মৃণালের কাছে এসে শোয়। শুয়ে গর্‌র্ গর্‌র্ করে আরামসূচক শব্দ বার করে।

ঘুম আসে না। তবু একটা আচ্ছন্নতা ঘিরে ধরে মৃণালকে। সারা শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকায় এক ধরনের সুখ আছে। এই সুখের খবর তার অজানা নয়। কত রাতে নিজের এই ছোট্ট ঘরের দরজা বন্ধ করে সে ব্যথার সুখ অনুভব করেছে। কিন্তু আজ সব ব্যথার অনুভূতি বড় বেশী চাপ দিচ্ছে মস্তিষ্ককে। সেই চাপে, জেগে থাকবার ইচ্ছে হলেও, থাকতে পারছে না সে। কে যেন তাকে তলিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সে হয়ত রুখে উঠতে পারে। রুখে উঠলে কাজও হবে। তবু আজকের রাতটুকু অন্ততঃ সে তা চায় না। সে আত্মসমর্পণ করে।

—এই

মৃণালের গায়ে হাতের স্পর্শ লাগে।

অস্ফুটস্বরে সে বলে,—দীপা মাসী ?

—ইস্, গা যে গরম। এই, কী বলছিস্ সব ?

অন্ধকারের মধ্যে টিটুর গলা শোনে মৃণাল।

— না, কিছু না।

—জেগে আছিস তো ?

মৃণাল আরও খানিকটা সজাগ হয়। আবার পাশ ফিরে শোয় ধীরে ধীরে। টিটুকে সে ভাল না বাসুক, বিশ্বাস করে।

টিটু গলা নামিয়ে বলে,—ছাখ, কাল তোকে কিছু দিতে হবে না। আজই তো পেয়ারা দিয়েছিস। আচ্ছা, ঠিক আছে, পাঁচদিন কিছু না দিলেও চলবে।

—আচ্ছা।

—আর ছাখ, তুই বিড়ি খাস্ ?

—খেয়েছিলাম একটা।

—ওঃ, মাত্র একটা ? দাদা তো প্রায়ই খায়।

এবারে মৃণাল উত্তেজনা অনুভব করে। বীজেশ বিড়ি খায়! কাকার ছেলে বীজেশ। আশ্চর্য সংবাদ। তবে টিটু এ সব ব্যাপারে মিথ্যে বলে না। তার কথা ষোলআনা বিশ্বাস করা যেতে পারে।

—বীজেশ বিড়ি খেয়ে লেবুর পাতা চিবিয়ে নেয়। তুই-ও তাই করলে পারতিস। ধরা পড়তিস না।

মৃণাল আস্তে আস্তে বলে—তবু মারত।

হ্যাঁ, তা মারত। কিন্তু তোর মুখে মা বিড়ির গন্ধ পেল বলেই আর এক চোট লাগালো। প্রথমে তো তুই সামলে নিয়েছিলি।

—বীজেশ বিড়ি খায় ?

—হ্যাঁ। তোর গা খুব গরম।
—জ্বর হয়েছে?
—হুঁ।
—কাল কি বার রে? রবিবার না?
—হ্যাঁ, কেন?
—নইলে ইস্কুল কামাই হত।
অন্ধকারের মধ্যে টিটুকে ভাল দেখা যায় না। তবু তার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে কোন অসুবিধা হয় না মৃণালের। কোথা থেকে যেন এক টুকরো আলো ঠিকরে এসে টিটুর চোখে পড়েছিল। হীরে থেকেও নাকি অমাবস্যার অন্ধকারেও এমনিভাবে কোথা থেকে আলো এসে প্রতিবিম্বিত হয়। মৃণালের দৃঢ় বিশ্বাস আকাশের অসংখ্য তারার আলো সেটি।
—এই, একটা কথা জানিস? টিটু শুধোয়।
—কী?
—ওরা কেউ জানে না। মা-বাবাও না। বলব?
—বল্ না।
—মার খেয়ে তুই পেচ্ছাব করে ফেলেছিলি।
—যাঃ!
লজ্জায় সঙ্কোচে শরীরের সব জ্বালা যন্ত্রণার কথা মুহূর্তের জন্যে ভুলে যায় মৃণাল। এতক্ষণে যেন এক ঝলক রক্তের ধাক্কা খেয়ে মাথার শিরা উপশিরাগুলো ভালভাবে কাজ করতে শুরু করে।
—আমি বাজে কথা বলি না।
—রক্ত না তো?
—না।
—জল?
—মোটেই না।
মৃণাল কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না।
টিটু বলে,—আমি চলে যাচ্ছি।
—কাউকে বলবি একথা?
—না। পাঁচদিন পরে হাবলুদের গাছের ছ'টা বিলিতি আমড়া চাই।
—ঠিক আছে।
—গুনে ছ'টা। একটাও কম নয়।

-ঠিক আছে।

-বেশীও চাই না। তবে না পেলে রাজ্যি সুদ্ধ সবাই জেনে যাবে।

টু দৃঢ় পদক্ষেপে বার হয়ে যায়। ওর কাঁধ অবধি চুলের ঝাঁকানি অন্ধকারকে নড়িয়ে ড়িয়ে দিয়ে যায় যেন।

কছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকে মৃণাল। তারপর ধীরে ধীরে ওঠার চেষ্টা করে। প্রাণপণ চষ্টায় উঠে বসে। চৌকি থেকে সন্তর্পণে মাটিতে পা রাখে। তারপর দরজা আর রের ছোট্ট জানলাটি বন্ধ করে লাইট জ্বালায়। প্রথমে সার্ট তুলে পেটের আঘাত খে। বাইরে থেকে ফুলে লাল হয়ে রয়েছে। পেটের ভেতরটাও জ্বালা করছে। াড়িভুঁড়িগুলো ছিঁড়ে-টিড়ে যেতে পারে। নাড়িভুঁড়ি ছাড়াও রয়েছে যকৃৎ, প্লীহা ার পাকস্থলী। এদের কোন একটা ফেটেফুটে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

দ আর বাঁচবে না। সে না বাঁচলে কাকা কাকীমার খুব আনন্দ হবে। বীজেশেরও বে। শুধু টিটুর ততটা আনন্দ নাও হতে পারে। এটা ওটা পাওয়া চিরকালের মত ন্ধ হয়ে যাবে তার।

রনের প্যাণ্ট খুলে ফেলে মৃণাল। সেটিকে উল্টে নেয়। হাত দিয়ে ভাল করে দেখে। টু সত্যি কথাই বলেছে। একটু ভিজে ভিজে মনে হয়। তাড়াতাড়ি আবার পরে ফলে প্যাণ্ট। রক্ত নয়।

াইট নিভিয়ে দরজা আর জানলাটা খুলে দিয়ে চৌকিতে এসে শুয়ে পড়ে। সে াতে আজ আর তাকে খেতে দেবে না ওরা। খাবার ইচ্ছেও নেই। যে সব জিনিস খেতে ভাল লাগে তার, সেই সব জিনিসের কথা মনে করতেই গা বমি রে।

টটুর কথা শুনে আচ্ছন্নতা একেবারে কেটে গিয়েছে মৃণালের। ঘুমও আসে না। াঁচদিন পরে ছ'টা বিলিতি আমড়া দিতে হবে ওকে। কথাটা মনে রাখতে হবে।

াত আরও গভীর হয়। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। কাকা কাকীমাদের াওয়ার পাট অনেকক্ষণ চুকেছে। দীপা মাসীর দেওয়া অমলেটের অস্তিত্ব পেটের ধ্যে রয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছে হয় মৃণালের। গরু জাবর কাটার াগে পাকস্থলী ও খাদ্যনালী সংকুচিত করে যেভাবে খাবার ওগরায় মৃণালও সেই চষ্টা করে। মুখের ভেতরে তেতো তেতো একটু জল উঠে আসে এবং তাতে ডিমের গন্ধের আভাস। সন্তুষ্ট হয় মৃণাল। পেট পড়ে থাকলেও একেবারে শূন্য নয়। শূন্য হলে ডিমের গন্ধ পেত না। তবে পেটের ভেতরে গিয়ে খাবার সাধারণতঃ টক হয়ে যায় বলে শুনেছে সে। তার বেলায় তেতো হল কেন বুঝতে পারে না। চোট খেয়ে বোধহয় পাকস্থলীর হজমের রসের স্বাদের পরিবর্তন ঘটেছে।

ঘুম ভাঙে মৃণালের যথেষ্ট বেলায়। সারারাত সে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। কখনো এমন হ না। স্বপ্ন সে খুব কম দেখে। কবে দেখেছে মনে নেই।

দরজা জানলা বন্ধ থাকায় বুঝতে পারে না কত বেলা হয়েছে। সে জানে না, ভো না হতেই কাকা কাকীমা একবার এসে তাকে দেখে গিয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে তা বুক-পেট ওটা-নামা করতে দেখে নিশ্চিন্তে ফিরে গিয়েছে দরজা ভেজিয়ে।

গায়ের সেই অসহ্য ব্যথা আর নেই। পেটের ব্যথাও ঠিক অনুভব করতে পারে না অথচ অপরিসীম ক্লান্তি রয়েছে তার। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হয় না মুখের ভেতরটা বিস্বাদ হয়ে রয়েছে—জ্বর হলে যেমন হয়। টিটু বলেছিল, জ হয়েছে। এখন আর আছে কিনা কে জানে।

বাইরে পুতুলীর চীৎকার শুনে চমকে ওঠে। বেলা তবে অনেক হয়েছে। সবার পে পুতুলীর ঘুম ভাঙে রোজ।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খোলে। প্রখর সূর্যের আলো বাইরে অট্টহাসি হেসে ও যেন। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কাকীমা কী ভেবে তাকে এতক্ষণ পড়ে থাকতে দি জানে না। অন্যদিন হলে চিৎকারে পাড়া মাথায় করত। কালকের অত অত্যাচারে পর হয়ত হৃদয়টা একটু আর্দ্র রয়েছে সাময়িকভাবে।

ঘরের বাইরে পা দিতেই মাথা ঘুরে ওঠে মৃণালের। চোখের সামনে অন্ধকার পেছনে দরজা না থাকলে পড়ে যেত। দুপা পেছিয়ে গিয়ে কোন রকমে সেটা ধ বসে পড়ে। পাকস্থলী থেকে তেতো তেতো কী যেন উঠে আসে মুখে। হাত-প ঝিমঝিম করে। এমন কখনো হয় নি। ষ্টীম ইঞ্জিনের সুতীব্র হুইশেলের শব্দ কতবা তার চোখের দৃষ্টিকে আঁধার করে দিতে চেয়েও পারে নি। তাকে বসিয়ে দিে পারে নি এভাবে একবারও। অসীম লজ্জার বোঝা ভারী হয়ে ওঠে ওই অবস্থাতেও সামনে এতক্ষণে কে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক কি? কাকা—কাকীমা—কিংবা তাদে ছেলেমেয়েদের কেউ? ওরা দেখে ফেলেছে সে-ও ক্ষেপা ঘোষের মত যেখানে সেখা বসে পড়ে। চোখের অন্ধকার না কাটতেই প্রবল চেষ্টায় দরজা ধরে উঠে দাঁড়া আবার। ওইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়। দেখে, দুহাত দু দাঁড়িয়ে বীরেশ দাঁত বার করে নিঃশব্দে হেসে চলেছে।

বীরেশের পাশ দিয়ে সে ধীরে ধীরে বাইরে আসে। একটা বিস্কুটের মরচে ধ পুরোনো কৌটোর মধ্যে ঘুঁটের ছাই রয়েছে। খানিকটা তুলে নিয়ে দাঁত মাজে সে বীরেশ যে তাকে অনুসরণ করেছে টের পেয়েও পেছন ফিরে তাকাতে প্রবৃত্তি হয় না পেটের ভেতরটা কেমন করছে, বোধহয় খুব খিদে পেয়েছে।

কাকীমা তাকে খেতে দিল না। একবার শুধু ভ্রূ-কুঁচকে দেখে নাক সিটকালো

াত খেতে দেবে না তাকে আজও। শাস্তি দিচ্ছে। রাত করে বাড়ি ফেরার, কথা । শোনার এবং বিড়ি খাবার শাস্তি। রাত করে বীজেশও বাড়ি ফেরে বহুদিন। । জানে বীজেশ কোন্ দলের সঙ্গে মেশে—যদিও জানত না বিড়ি খাওয়া শিখেছে তিমধ্যে। বেশী রাত করে বাড়ি ফিরলে কোন ভাল ছেলে কিংবা মাস্টার মশায়ের াম করে বলে, পড়া বুঝতে গিয়েছিল। কাকীমার কঠিন মুখখানা মুহূর্তে আনন্দে ালমল করে ওঠে। বীজেশ তার মায়ের মুখাগ্নি দেবার পূর্বে দীর্ঘদিন রাজমাতার সুখ । সম্মান ভোগ করতে দেবে—এই দৃঢ়বিশ্বাস কাকীমা রাখে।

ুত্‌লী একবার সামনে এসে দেখা দিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। সকালে উঠে স্নান রেছে সে এই ঠাণ্ডার মধ্যে। মুখখানা চন্দন দিয়ে সাজানো। আজ তার ন্মদিন। রান্নাঘর থেকে পায়েসের গন্ধ ভেসে আসছে। পুত্‌লী পায়েস খেতে ালবাসে। টিটুকে দেখতে পায় না মৃণাল। দেখতে পেলে জানতে পেত কাকীমা ার সকালে খাবার জন্যে কিছু রেখেছে কিনা

বেলা আরও বেড়ে ওঠে। কাকীমা তার সামনেও আসে না, খাবার কথাও বলে না। পেটের ভেতরে মোচড় দিতে থাকে। সারা শরীর কেমন একটা আনচান ভাব। গা বমি করে। হাঁটতেও কষ্ট হয় যেন।

দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয় বলে নিজের ছোট্ট ঘরখানিতে ঢুকে পড়ে মৃণাল। সে বিছানায় শুয়ে পড়ে। অসময়ে শুয়ে পড়ল বলে কাকীমা চিৎকার শুরু করবে কিনা সে জানে না। কাকা আবার মারতে আসবে কিনা তাও জানে না। হয়ত আজকের দিনে রেহাই দেবে। শত হলেও পুত্‌লীর জন্মদিন।

শান্তি পায় না মৃণাল তবু। বড় জল পিপাসা পায়। আনচান ভাবও কাটে না। টিটুকে দেখা যাচ্ছে না। পালিয়ে বেড়াচ্ছে যেন। ঠিক পাঁচদিন পর চেপে ধরবে আমড়ার জন্যে। কাকারও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কাকীমা সেই একবারই তার সামনে এসেছিল—বিকৃত মুখখানা দেখে মনে হয়েছিল আচমকা এসে পড়েছে। শুধু বীজেশ মাঝে মাঝে দূর থেকে তাকে দেখছে আর পাঁচ আঙুলে মুখ ঢেকে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। একবার দরজার কাছাকাছি আসে বীজেশ। মৃণাল ডাকে তাকে।

পেছন ফিরে চারদিক ভালভাবে দেখে নিয়ে ধাঁ করে ঘরে ঢুকে পড়ে বীজেশ।

মৃণাল প্রশ্ন করে—টিটু কোথায় রে?

—আছে।

—এদিকে আসছে না যে?

—বলব?

—বল্।

—তোর সামনে কেউ আসবে না। পুতলী এসেছিল বলে মা কী ধমকেছে।

—কেন রে ?

—ওর জন্মদিন বলে। এই দিনে তোর মুখ দেখলে সারা বছর খারাপ যাবে। স
বেলা নকুল পাকড়াশীর মুখ দেখলে যেমন হাঁড়ি ফাটে, ঠিক তেমনি।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারে মৃণাল। কাকীমাকে মাঝে মাঝে বলতে শুনে
বটে,—বাপ-মা-খেকো—অলক্ষণে—অপয়া।

—তুই বিড়ি খেতে শিখেছিস নাকিরে মৃণাল ?

শুকনো গলায় ঢোক গেলার চেষ্টা করে মৃণাল বলে,—হ্যাঁ, একটা খেয়েছিলাম।

—ছি ছি, এই বয়সে ? ধেৎ, বিশ্বাসই করি না।

মৃণাল জানে কতকগুলো ব্যাপারে টিটু কখনো মিথ্যা বলে না। বীজেশ নিশ্চয়ই বিি
খায়। তবু সে হাসতে পারে না।

—কেমন খেতে রে ? বীজেশের গলার স্বরে দারুণ আগ্রহ।

—তেতো। মুখ চুলকোয়।

—তবু খাস ?

মৃণালের কথা বলার একটুও ইচ্ছে নেই। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ। সে আবা
উঠে পড়ে। বাইরে যেতেই বীজেশ তাড়াতাড়ি বাড়ির অন্যদিকে চলে যায়। মৃণা
বুঝতে পারে না কি করবে। খাওয়ার জল রয়েছে রান্নাঘরের বারান্দায়। আ
রয়েছে কাকার ঘরের দরজার পাশের কুঁজোতে। যে কোন এক জায়গায় গে
কাকীমা কিংবা কাকা তার মুখ দেখে ফেলবে। কিন্তু জল তাকে খেতে হবে
একটু ভেবে নিয়ে কাকার ঘরের দিকেই যায় সে। ও ঘরে তার বাবা থাকত
এখনো অস্পষ্ট মনে আছে বাবার খাট কোন্‌দিকে পাতা ছিল। সেই খাট এখন খু
রাখা হয়েছে বাইরের ঘরে। কতদিন সেখানে গিয়ে সে ছুঁয়ে দেখেছে ওই খাট
অনেক ধুলো জমেছে। আগে ঝক্‌ঝক্ করত—এখন করে না। মায়ের তক্তাপো
ছিল ঘরের অন্য দিকে—যেদিকটা এখন কুঁজো থাকে। সে মায়ের সঙ্গে শুতো মা
আছে। মাঝে মাঝে বাবাও এসে শুয়ে পড়ত তাদের পাশে। গল্প করত। সা
মার-পালোয়ানের গল্প। মনে আছে—আজও স্পষ্ট মনে আছে। রোগা লিকলিে
দরজীর সাহসের কথা সে ভুলতে পারে নি।

কাকার ঘরের কাছে এসে মাথা নীচু করে মৃণাল। পুত্‌লীর জন্মদিন আজ।
শুধু কাকাকে মুখ দেখিয়ে মেজাজ খারাপ করে দিয়ে লাভ নেই। কোন রক
জল খেয়ে আবার গিয়ে শুয়ে পড়বে। কিন্তু তাড়াতাড়ি জল খেতে গিয়ে গল

আটকে যায়। চিরে যায় গলা। ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকে কুঁজোর পাশে। শুকনো গলা একটু ভিজিয়ে না নিয়ে খেতে গিয়ে এই দুর্দশা। তবু জল তাকে খেতেই হবে। প্রথমে এক ঢোক খায়—তারপর আর এক ঢোক। শেষে পুরো এক গেলাস জল খেয়ে নেয় সে। গলার ব্যথা কমে না, তবে জলটুকু নীচে নেমে যায়। এবারে পেটের ভেতরে কোথায় যেন আটকে যায়। গলার ব্যথা পেটে গিয়ে নামল। দাঁড়াতে পারে না। তাড়াতাড়ি ছুটে চলে যায় নিজের ঘরে। বিছানায় শুয়ে পড়ে দুহাতে পেট চেপে ধরে ছট্‌ফট্‌ করে।

হাবুলের পেটে একবার ফুটবল লেগেছিল। প্রথমে দম আটকে সে পড়ে ছিল কয়েক মুহূর্ত। তারপরই দুহাত দিয়ে পেট চেপে ধরে কাঁদতে শুরু করেছিল—মা—মাগো—বাবা—বলে। মৃণালের ইচ্ছে হয় হাবুলের মত সেও 'বাবা-মা' বলে কাঁদে। কাঁদলে আরাম পেত, তবু পারে না। দাঁতে দাঁত চেপে ছট্‌ফট্‌ ছট্‌ফট্‌ করে। কিছুক্ষণ পরে ব্যথা কমে আসে। শুধু ব্যথার রেশটুকু থেকে যায়। তখন সে চাপা গলায় 'মা' বলতে চেষ্টা করে—খুব আস্তে। বাইরে বীরেশ টিটুদের কারও পক্ষে কান খাড়া করে থাকা আদৌ বিচিত্র নয়। সে বলে,—'মা'। নাঃ, হলো না ঠিকমত ডাকা। এবার বলে,—'বাবা'। উঁহু, বিশ্রী শোনায়। সে ডাকতে পারবে না। মা-বাবা বেঁচে থাকলে কী যে ভাবত। অন্য সব ছেলেমেয়েরা কত সুন্দরভাবে ডাকে—শুনতে কত মিষ্টি লাগে। অথচ সে পারে না। বেঁচে থাকলে দুজনারই খুব কষ্ট হত তার ডাক শুনে। তবে যদি ওরও পুত্‌লীর মত একটা বোন হত—আরও সুন্দর—তবে তার ডাক কত মিষ্টি হত। ঠিক মায়ের কণ্ঠস্বরের মত মিষ্টি। এখনো মনে পড়ে তার, মায়ের মিষ্টি গলার কথা। কিংবা হয়ত তার কিছুই মনে নেই। পাড়ার বৌ-ঝিদের কাছে মায়ের মধুর স্বরের সুখ্যাতি শুনে শুনে তারও ধারণা হয়েছে মায়ের কণ্ঠস্বর তার মনে আছে।

আরও অনেক বেলায় কে যেন তাকে ডাকে। মৃণাল বুঝতে পারে নি যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ মেলে দেখে টিটু দাঁড়িয়ে। তার হাতে বাটি।

—মড়ার মত ঘুমোচ্ছো কেন এই অবেলায়?

জবাব দেয় না মৃণাল। সে ভাবে টিটুর হাতের বাটিতে নিশ্চয়ই পায়েস রয়েছে। কাকীমা তাকে শাস্তি দিলেও পুত্‌লীর জন্মদিনের পায়েস না পাঠিয়ে পারে নি। কথায় বলে, কাক-পক্ষীকেও এসব দিনে কিছু দিতে হয়। কিন্তু টিটু লুকিয়ে নিয়ে আসে নি তো?

—কি হল? উঠে বসছ না কেন? শুয়ে থাকতে খুব আরাম। তাই না।

—তুই এসেছিস, কাকীমা জানে তো ?
—হ্যা হ্যা, তাড়াতাড়ি ধর তো ? হাত ব্যথা হয়ে গেল। রাখার একটা জায়গা থাকলে রেখে চলে যেতাম।
মৃণাল তাড়াতাড়ি উঠে বসে। মাথা টলকায়। একটু স্থির হয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে বাটিটা ধরে।
—এমন রঙ হয়েছে কেন রে ? নলেন গুড়ের নয় ?
—কেমন রঙ হবে ?
—নলেন গুড়ের পায়েস তো বেশ লাল হয় ?
—পায়েস ? পায়েস হতে যাবে কোন্ দুঃখে। বার্লি। জ্বর হয়েছে না ? ভুলে গেলে ?
হাত থেকে বাটিটা ফস্‌কে যেতে পারত মৃণালের। সে আঁকড়ে ধরে।
—হাবুল ঘুর্‌ঘুর্ করছিল বাইরে। ভোর বেলায় কোথায় নাকি যাবার কথা ছিল তোমাদের ?
মৃণাল মনে করতে পারে না—মনে করার ইচ্ছাও জাগে না মনে। বার্লির বাটিটা বিছানার ওপর নামিয়ে রাখে।
টিটু মন্তব্য করে—আমি জানি। খেজুরের রস।
মনে পড়ে মৃণালের। সে বাটিটা উঠিয়ে নিয়ে চুমুক দেয়। খেতে বেশ ভালই লাগে। খুব ভাল লাগে। আস্তে আস্তে খায় সে। তাড়াতাড়ি খেলে ফুরিয়ে যাবে! খেতে খেতে লক্ষ্য করে টিটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে।
বাটিটা নামিয়ে রেখে মৃণাল বলে,—আমার কিন্তু জ্বর নেই। ছাখ্।
—দরকার নেই দেখে। মাকে দেখাওগে ইচ্ছে হলে।
টিটু চলে যায়। মৃণাল চুপ করে বসে থাকে।
দীপা মাসীর বাড়ীতে গেলে খেতে পাওয়া যেত। কিন্তু যাবে না সে। দীপা মাসী তাকে কাঁদিয়ে আদর করতে চায়। ও-মুখো সে হবে না। বরং এর মধ্যে একদিন সে আর একটি জায়গায় যাবে। লাইনের ওপারে—যেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে মা-বাবা ট্রেনে কাটা পড়েছিল। মায়ের সই-এর বাড়ি। একদিন তাকে রাস্তায় দেখেছিল মায়ের সই। পিঠে হাত বুলিয়ে ছল্‌ছল্ চোখে আদর করেছিল। মাকে নিশ্চয়ই এখনো ভালবাসে, তাই ভুলতে পারে নি। দীপা মাসীর অভাব তাকে পীড়িত করবে সে জানে। মায়ের সই সেই অভাব কিছুটা পূর্ণ করলেও করতে পারে। হয়ত সেখানে আরও ভাল লাগেবে তার। দীপা মাসী তাকে মাত্র এক বছর ধরে চেনে। কিন্তু সই তাকে চেনে জন্ম থেকে। এতদিন সেখানে না যাওয়া ভুল হয়েছে।

ুর গড়িয়ে যায়। একটু সতেজ হয়ে ওঠে সে যেন বার্লি খেয়ে। ঝিমুনি ভাব ্টে যায়। বাড়িটা নিস্তব্ধ। কাকীমা আর কাকা দিবানিদ্রায় মগ্ন। বীজেশ ্চয়ই বাড়িতে নেই। টিটু থাকলেও থাকতে পারে। পুতলী বাড়ির কোথাও ্তুল নিয়ে ব্যস্ত। কিংবা তার বেড়ালকে কোলে বসিয়ে আদর করছে।

ুর গড়ানো রোদ বাড়ির সীমানার বাইরে আমবাগানের গাছের পাতায়। ক্ঝকে রোদ। পাতাগুলো চক্চক্ করছে। মল্লিকদের বাগান ওটা। উনচল্লিশটা মের গাছ রয়েছে। আমের সময় পাহারাওলা থাকে ছোট্ট একটি টিনের চালাঘর নিয়ে। তবু মৃণালের ওপর সব সময় নজর রাখতে ব্যর্থ হয়। পাহারাওলার ্রকে ফাঁকি দিয়ে মৃণাল এ পর্যন্ত অনেক আমের সদ্ব্যবহার করেছে।

ামবাগানের মাটিতে ঘাসের চিহ্ন নেই। আলোর অভাবে এমন হয়। শুধু অসংখ্য ্রা পাতার আস্তরণ। অধিকাংশ পচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। সেই পাতা ্রা ভিজে মাটির ওপর দিয়েও পায়ে-চলার পথ চলে গিয়েছে এদিকে ওদিকে। কটা গিয়েছে হারু মাস্টারের বাড়ির পাশ দিয়ে বড় রাস্তায়। আর একটা সোজা ্য়ে উঠেছে ক্ষ্যাপা ঘোষের উঠোনে।

ছানা ছেড়ে উঠে মৃণাল বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে আমবাগানে এসে দাঁড়ায়। ্রু মাস্টারের বাড়িতে গেলে মন্দ হয় না। মাস্টার নাকি বলেছে বাবা-মায়ের ্ত তাকেও রেলের চাকা টানছে। এ তো সামান্য কথা, এর চেয়ে অনেক বেশী ড়া কথাও মাস্টারের মুখে আটকায় না। তবু, বাড়িতে গেলে পড়া দেখিয়ে দিতে ই হারু মাস্টার। অন্য মাস্টারেরা বলে, তাদের কোচিং ক্লাসে ভর্তি হতে। হারু স্টারের কোচিং ক্লাস নেই।

স্টারের মূক ও বধির মেয়ে লক্ষ্মী খুদ ছড়িয়ে দিচ্ছিল উঠোনে। টিনের চালের ওপর কে বুনো পায়রার ঝাঁক একে একে পত্‌ পত্‌ করে ডানার আওয়াজ তুলে এসে ্ছিল ছড়িয়ে থাকা খুদের ওপর। লক্ষ্মীদির মুখের রেখায় পরিতৃপ্তির সুস্পষ্ট ছাপ। ্াল দেখল, লক্ষ্মীদি পায়রা নিয়ে বিভোর। সে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। লক্ষ্মীদির ্থর হাসি ফুটে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে যায়। কাছে এসে ইশারায় উৎকণ্ঠা কাশ করে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। শহরে মাত্র এই একজনের কাছে ্সে কেমন যেন নরম হয়ে পড়ে মৃণাল। পৃথিবীতে এই একজনের সস্নেহ সান্নিধ্যে করলে হয়ত সে কাঁদতেও পারে। এর সামনে এলে নিজের সব কিছু ঔদ্ধত্য, ্য ও গোপনীয়তাকে মিথ্যা বলে মনে হয়। লক্ষ্মীদি দেখতে শুধু অপরূপা নয়, সমস্ত ্যব ও মুখশ্রীর ভেতরে একটা নিঃসংশয় পবিত্রতা সন্ধ্যার প্রদীপ শিখার মত টল্‌টল্‌ ্রে। পবিত্রতার সংস্পর্শে এসে নিজের অন্তরের সব কিছুকে উদ্‌ঘাটিত করেই যেন

অপার শান্তি।

মৃণাল লক্ষ্মীর হাতখানা নিজের মাথার ওপর চেপে ধরে ভাবে-ভঙ্গিতে বলে,—শ
খারাপ।

লক্ষ্মীদির চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। সে জানে, নিজে সে কত অসহায়। ে
অসহায়তা তাকে অতি অল্প কারণেই বড় ব্যথা দেয়।

মৃণাল মুখে হাসি এনে বলে,—ভাল হয়ে গিয়েছি।

লক্ষ্মীদি বুঝতে না পেরে ভ্রু উঁচিয়ে আবার জানতে চায়। এবার মৃণাল সাধ্য
বুঝিয়ে নিশ্চিন্ত করে লক্ষ্মীকে।

ঘরের ভিতরে হারু মাস্টারের ছোট ছেলেটা কেঁদে ওঠে। বুড়ো বয়সের ছে
লক্ষ্মীর জন্মের ষোল বছর পরে জন্মেছে ছেলেটা। হারু মাস্টারের বংশধারা বাঁ
রাখবার একমাত্র অস্ত্র। মায়ের আশার আলো। তবে মাস্টার স্বভাব-সু
নির্বিকার।

লক্ষ্মীর নয়নের মণি এই ছোট্ট ভাইটি। মৃণাল জানে শিশুর চিৎকার লক্ষ্মী শু
পায় নি। কোন চিৎকারই শুনতে পায় না। শুনতে পেলে ছুটে যেত। পৃি
শব্দ তার কানে গেলে অমন সুন্দর মুখের মিষ্টি কথাও শোনা যেত। মৃণালের ধ
লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর তার মায়ের মতই মিষ্টি হত। কারণ আরও দু-একজন বোবা ে
কিংবা মেয়ে যাদের দেখেছে সে, তারা যখন অর্থহীন শব্দ বার করে কিছু বোঝ
চেষ্টা করে তখন বড্ড কর্কশ শোনায়। লক্ষ্মী খুব বেশী উত্তেজিত অথবা আন
না হলে মুখ দিয়ে শব্দ বার করে না। কিন্তু কদাচিৎ কখনো যা শোনা গিয়েছে
মুখে, তা কর্কশ তো নয়ই বরং মিষ্টি।

শিশু আরও জোরে কেঁদে ওঠে। মাস্টারের স্ত্রী যথাসাধ্য থামাবার চেষ্টা করে
হয়। শেষে হারু মাস্টার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে,—থাম্ ব্যাটা, জ্বালাত
একশেষ। ছুটির দিনেও একটু ঘুমোতে দেবে না।

শিশু একবার থেমে, পরমুহূর্তেই পরিত্রাহি চিৎকার করে।

এবারে শিশুর মায়ের প্রতিবাদ কানে ভেসে আসে,—অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ ে
একরত্তি ছেলেকে এভাবে ধমকায় কেউ ?

—না, আদর করে।

—এমনিতে শখ করে তো কাঁদছে না। শরীরে গ্লানি না থাকলে এরা কাঁদে
বললাম ছাগলের দুধের ব্যবস্থা কর, সে বেলায় তো চুপচাপ।

—না জেনে বক্‌বক্ করো না। ক্ষেপা ঘোষের বউকে বলে এসেছি। ছেলেটা
ফেঁপে মরে গেলে আমার এমন কিছু সুখ হবে না।

—থামো থামো, মুখে কিছু আটকায় না।

মৃণাল শিশুর চিৎকার শোনে, স্বামী-স্ত্রীর কলহ শোনে, পায়রার ঝটপটানি শোনে, পেছনের আমবাগান থেকে ভেসে আসা একটানা ঘুঘু পাখীর ডাক শোনে—তবু কত সব কারণের জন্য একটা বিষাদের দলা, স্বাধীন স্বচ্ছ সুখের স্রোতকে কোথায় যেন আটকে রেখেছে। অথচ এই তো লক্ষ্মীদি—শ্রবণেন্দ্রিয় বলতে যার কিছু নেই—কিছুই যে শুনতে পাচ্ছে না, শুধু পায়রার ঝাঁকের ভঙ্গি দেখে তাদের ব্যস্ততা আর ব্যাকুলতা-ভরা মনের আঁচ করে নিয়ে দরদ-সহানুভূতির এক অপূর্ব শান্তির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে। এমন যখন সম্ভব, তখন পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে অতিমাত্রায় সক্রিয় না রেখে তারও একটিকে জন্মাবধি অচল করে রাখতে পারত কোন অজানা শক্তি—সেও তবে লক্ষ্মীদির মত শান্তি পেতে পারত। বাজারের রাস্তার ধারে বসে থাকে সে অন্ধ লোকটি, তার মত অনাবিল হাসিমাখা মুখ নিয়ে পৃথিবীর কোন কিছু দেখতে না পেয়েও সামান্য শব্দের মধ্যে সুরের কলতান শুনে তন্ময় হয়ে থাকতে পারত। কিছুদিন আগেও মৃণালের মধ্যে এই বোধ জন্মেনি, তাই লোকটির কথা শুনে বন্ধুদের হাসিতে সে ও যোগ দিয়েছিল। আজ তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, লোকটি শব্দের মূর্ছনায় নিয়ত তন্ময়। নইলে ওভাবে বলল কেন—"সব কিছুতে গান। তোমার কথায় গান, ধমকে গান, ঝগড়া-ঝাঁটিতে বিলকুল গান। গাছের পাতা নড়ায় গানের শব্দ—গরুর গাড়ির চাকায় গান। হ্যাগো সত্যি। বিশ্বাস না হয় কান পেতে শোন।" কথার শেষে অন্ধ নিজেই কান পেতে দিয়েছিল। তাই দেখে দলের সবার মত মৃণালও হেসেছিল।

মৃণালের ধারণা ছিল, অন্ধ, কালা হুলো, বোবা—সবাই যেন পাগল ঘেঁষা। সাধারণ মানুষের মত নয় বলেই তারা পাগল। কিন্তু তা তো নয়। এই তো লক্ষ্মীদি, যাকে লক্ষ্মীর প্রতিমা বলে সবাই, এই লক্ষ্মীদি ছাড়া ভূ-ভারতের আর সবাইকে পাগল বলে মনে হয় তার এই মুহূর্তে।

পায়রাগুলো দল বেঁধে যাচ্ছে, ঝগড়া করছে গলা ফুলিয়ে। মাঝে মাঝে এ-ওকে তেড়ে যাচ্ছে, ঠুকরে দিচ্ছে। লক্ষ্মীর মুখে নির্মল হাসি অম্লান। মৃণালের কথা বোধহয় তার মনে নেই। নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়েছে। আত্মা বলে কোন পদার্থ সত্যি থেকে থাকলে, লক্ষ্মী হয়ে গিয়েছে পায়রাদের আত্মার সঙ্গে।

—কিরে, তুই কি করতে এসেছিস?

হারু মাস্টার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। চুল উস্কো-খুস্কো। দিবানিদ্রায় মুখ ফুলো-ফুলো।

মৃণাল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলে,—আজ্ঞে স্যার, আপনার কাছে—

—আজ্ঞে, সে তো দেখেই বুঝেছি। চেহারাখানা এমন হল কি করে? অসুখ হয়েছে?

মৃণাল বলে ফেলে,—হ্যাঁ।

—তা বেশ হয়েছে। পরীক্ষার আগে অসুখ না করলে চলবে কেন?

—পরীক্ষার জন্যেই এসেছি স্যার।

—বিনে পয়সার কোচিং তো—

মৃণাল প্রথমটা কিছু বলতে পারে না। সে হারু মাস্টারের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ওই মুখে রয়েছে দারিদ্র্য, বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা। ওই মুখে রয়েছে অভুক্তের শীর্ণতা ও রক্তাল্পতা। ওই মুখে আরও কত কি রয়েছে যার সঙ্গে সে খুবই পরিচিত, অথচ যাকে সে ভাষায় বর্ণনা করতে পারে না। সে জানে, ওই মুখের অনেক কিছু তার মুখেও ছাপ ফেলতে শুরু করেছে এই বয়সেই। সেই ছাপ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

—আমি না পারলে, একটু আধটু জিজ্ঞাসা করব স্যার। পড়ব না এখানে। সব বই তো নেই আমার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নামতে নামতে হারু মাস্টার বলে,—তা থাকবে কেন? বই না-থাকাটা যে ফ্যাসান। পাশ করলে বুক চিতিয়ে বলে বেড়ানো যায়।

মৃণাল কোন কথা বলতে পারে না। একটা শুধু আমবাগানের ব্যবধান তাদের আর হারু মাস্টারের বাড়ির মধ্যে। ও-বাড়ির হালচাল এ-বাড়িতে না জানবার কথা নয়। তবু এ-জাতীয় কথা হারু মাস্টার আরও বলেছে। মাস্টার নাকি খবর রাখে তার বাবার নামে যৎসামান্য জমি থাকলেও সেগুলো কাকা এখনো বেদখল করতে পারে নি। আর সেই জমির ফসল বেচে না হোক, জমি বেচে সে কলেজ অবধি ভাল-ভাবে পড়াশোনা চালাতে পারে।

—অমন হাঁ করে রয়েছিস কেন? আসিস। বই নিয়ে আসিস, যেখান থেকে পারিস। আমি 'প্রেজেনটেশান কপির' কারবার করি না।

কথাটা মৃণাল ঠিক বুঝতে পারে না। তবে সে অন্যান্য মাস্টারের হাতে বই দেখেছে বটে, যাতে ইংরেজীতে ওই কথাটা ছাপ দেওয়া রয়েছে। সেই বই কম দামে অনেক ছাত্রের কাছে বেচে দেয় শিক্ষকেরা।

মৃণাল আর কিছু বলতে পারে না। পায়রার ঝাঁক খাওয়া শেষ করে টিনের চালে গিয়ে বসেছে। লক্ষ্মীদি পিতার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে কোন ফরমাইসের অপেক্ষায়। হারু মাস্টার হাত উঁচিয়ে মুখের সামনে ধরতেই লক্ষ্মীদি ছুটে গিয়ে এক গ্লাস জল এনে বাবার হাতে দেয়। ঢক্‌ঢক্ করে সেই জল খেয়ে নিয়ে মাস্টার হাতের

উল্টোদিক দিয়ে ঠোঁট মুছে বলে,—পড়ে শুনেই বা কি হবে তোর। যাবি তো রেলের চাকার তলায়।

—আমি লাইনের ওপর দাঁড়াই না।

—একদিন ঠিক দাঁড়াবি। আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে তবে তো যাবি। এখন কিছুদিন লাইনের ধারে ঘোরাফেরা করে অভ্যস্ত হতে হবে তো।

—না।

চারু মাস্টার সহসা রেগে গিয়ে বলে—চুপ্ কর্। খালি তর্ক। তোর বাবার চেয়েও আমার বয়স বেশী জানিস? আমি মিথ্যে কথা বলছি?

লক্ষ্মীদি মাস্টারের মুখ দেখে মৃণালের হাত ধরে কাছে টেনে নেয়।

—আর কখনো যেন লাইনের ধারে না যেতে দেখি—বুঝলি?

মৃণাল জানে, সে আরও যাবে। কতবার যাবে ঠিক নেই। তাই হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বলতে পারে না।

ঘরে শিশুটি আবার কাঁদতে শুরু করে। পিতার উচ্চ কণ্ঠ আবার তার কর্ণকুহরে প্রবেশের ফলেই হয়ত।

লক্ষ্মীদি একবার পিতার দিকে, একবার মৃণালের দিকে চায়। তার চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। তারপর সেই উৎকণ্ঠা প্রশমিত হয় ধীরে ধীরে। সে দেখতে পায়, পিতার মুখভঙ্গি শান্ত হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। মৃণালের মুখেও নেই কোন ভয় বিহ্বলতা! তাই ষ্ট হাসে সে।

চারু মাস্টার সেই হাসি দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কন্যাকে কাছে টেনে এনে মৃণালকে প্রশ্ন করে,—একে তুই ভালবাসিস?

—হ্যাঁ, মাস্টার মশায়।

—কতখানি ভালবাসিস?

এমন প্রশ্ন মৃণাল কখনো শোনে নি। তার বুক দুরু দুরু করে। শেষে অনেক কষ্টে কোন মতে বলে,—আমি ঠিক বলতে পারব না স্যার।

—ধর, আমার মেয়ে কোন বিপদে পড়ল। প্রাণ দিতে পারবি?

মৃণাল ভাবতে থাকে। সে এতই অন্যমনস্ক হয়ে যায় যে তার প্রতি লক্ষ্মীর দৃষ্টি সে দেখতে পায় না। সেই দৃষ্টি এতই করুণ, যে মনে হচ্ছে যেন, মৃণালের জবাবের ওপর তার সব কিছু নির্ভর করছে। অথচ পিতার প্রশ্ন শুনতে পায় নি লক্ষ্মী। হয়ত অনুভব করেছে।

মৃণাল অবশেষে প্রশ্ন করে,—প্রাণ দেওয়াটা কি খুব কঠিন স্যার?

—কঠিন নয়? নিজের চাইতে মানুষ কাকে আর বেশী ভালবাসে।

তবু বুঝতে পারে না মৃণাল। নিজের প্রাণ দেওয়াটা এমন কিছু কঠিন বলে মনে না তার কাছে। হয়ত ভবিষ্যতের স্বপ্ন সেও দেখে—কিন্তু এই মুহূর্তে তার মৃত্যু হে কাকা আর তার ওপর নির্যাতন চালাতে পারবে না। বীরেশের দাঁত-বার-করা হা দেখতে হবে না। কাকীমার মনের জ্বালা মুখের ওপর ভেসে উঠতে দেখবে না মৃত্যুকে একটা নিষ্কৃতি বলে, কতবার মনে হয়েছে তার।

মাস্টারের দু'চোখের দিকে সোজা চেয়ে সে বলে,—এর চাইতে অনেক সহজ ব্যাপারে আমি প্রাণ দিতে পারব বলে মনে হয়।

হারু মাস্টার হাসে। ভাবে, কিশোরের উচ্ছ্বাস। বছর যত পার হবে, প্রাণটা তত নিজের প্রিয় হয়ে উঠবে কিশোরের কাছে। শেষে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই বুঝ না। পৃথিবীতে কে-ই বা বোঝে? নিজের সুখ আর সম্ভোগের জন্য স্ত্রীর স ভালোবাসা-বাসি খেলা, নিজের বাৎসল্য-রসকে খুঁচিয়ে দেবার জন্ত ছেলেমেয়ে ওপর টান। সব কিছুর মূলে নিজে। অহং এর চেয়ে বড় জিনিস পৃথিবীতে আর f আছে?

হারু মাস্টারের মুখের হাসি লেগেই থাকে।

অন্ত ছেলে হলে এই হাসিতে লজ্জিত হত। কিন্তু মৃণাল বিচলিত হয় না। হাসি যেন তার কোন গর্বকে চূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছে।

লক্ষ্মীর একটা হাত চেপে ধরে সে গম্ভীর হয়ে বলে,—লক্ষ্মীদি বিপদে পড়লে আপ বুঝতে পারবেন আমি না ভেবে কোন কথা বলি না।

হারু মাস্টার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মৃণালের দিকে চেয়ে বলে ওঠে,—আমি জানি, তুই ইচে পাকা। তা না হলে, যেভাবে তুই কথা বলছিস, বলতিস না. যেভাবে চলাফেরা করি করতিস না।

দীপা মাসী ফুলে ফুলে কাঁদছিল। এ-কান্না তার প্রথম নয়। স্বামী কলেজে চ গেলে অনেক দুপুরেই সে চোখের জল ফেলে হাল্কা হয়। কিন্তু হাল্কা হলেও মনে ভার কি লাঘব হয় তাতে? সে নিজে জানে হয় না—বয়সের কোন্ সীমায় এসে ে লাঘব হবে তাও বলতে পারে না। তবে কাঁদলে পরিশ্রান্ত হয় সে—পরিশ্রান্ত হে চোখে আর জল আসে না। তখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ-চোখ ভালভাবে ধুয়ে ফেলে জানে, মনের বোঝা মনেই রইল। আবার অশ্রুজল জমে উঠলে, বাঁধ ভাঙবার আ একদিন দুপুরে একটু উদাস হয়ে অতীতকে মনের ভেতরে আনলেই চলবে নতুন অশ্রুকে সেইভাবে নিঃশেষিত করে দিয়ে আবার কিছুদিনের জন্ত নিশ্চিন্ত হও যাবে।

কাঁদতে কাঁদতে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপা চাবি দিয়ে আলমারী খোলে। ড্রয়ার থেকে গহনার বাক্স বার করে সবগুলো উপুড় করে দেয় বিছানার ওপর। বাক্সের নীচে কাগজ-পাতা। সেই কাগজের নীচ থেকে বার করে ছোট একটি ফটো এবং একখানা চিঠি। ফুটোর রঙই লালচে হয়ে গিয়েছে। দীপা মাসী ফটোটি তুলে ধরে চোখের সামনে। যুবকের চেহারা। গালের এক জায়গায় ছোট্ট সাদা দাগ। এ-দাগ পড়েছে বিয়ের এক বছরের মধ্যে। পোকায় কেটেছে। একটি বছর এই ফটোর দিকে চাইতে তার ভয় হয়েছে—এটিকে গহনার বাক্সের ভেতরে রাখতেও সাহসে কুলোয় নি। তার মধ্যে দাগটি পড়েছে। ওইটুকু দাগের জন্যে অনেক জল ফেলেছে সে। কত ক্ষমা প্রার্থনা করেছে ছবিকে বুকে চেপে ধরে। কিন্তু এই দুর্নিবার আকর্ষণ যেন হ্রাস পেতে বসেছে অধুনা। পৃথিবীর কোন কিছুতেই আকর্ষণ অনুভব করে না আর। সংসারে সে মৃত। যার মধ্যে কোন সম্ভাবনা নেই, যার হৃদয়ে অজানা আশা আর আকাঙ্ক্ষা উঁকি দেয় না, সে মৃত ছাড়া কি? তাই অজয়ের ফটোর দিকে সে অনেকটা আটাত্তর বছরের বৃদ্ধার মত চেয়ে থাকে

চিঠিখানা খোলে দীপা। এইটিই অজয়ের শেষ চিঠি। সবশুদ্ধ চারখানা চিঠি দিয়েছিল সে। প্রথম তিনটি পুড়িয়ে ফেলেছে দীপা। শেষটি যখের ধনের মত আঁকড়ে রেখেছে। আর কতদিন রাখবে কে জানে। এর যতখানি গুরুত্ব ছিল তাতে ভাঁটার টানের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। কথাটা স্বীকার করতে কিছুদিন আগেও সে ভয় পেত এখন পায় না। বেশ বুঝতে পেরেছে, আগের দীপা সে আর নেই। এখন সে অনেকটা পুতুল। অধ্যাপক দাঁত খিঁচিয়ে বলে, রবারের পুতুল। বাইরের রূপ ধুতি-চাদর-পরা অধ্যাপক, অথচ ভেতরে একটা জঘন্য মনোবৃত্তির অশ্লীল বাক্য-বাগীশ আধা-নপুংসক শ্রেণীর পুরুষ। বিষ খাইয়ে না মেরে ফেলে, তবু দীপা সহ্য করে যায়—স্ত্রীর কর্তব্য করে চলে আজও। বাবার কাছে কথা দিয়েছিল সে। বাবা বেঁচে নেই আজ। সুতরাং আজ যদি সে আইনের আশ্রয় নিয়ে সনৎকে ছেড়ে চলে যায়, তাহলে কারও বলার কিছু নেই

অজয়ের ছবিটা চোখের সামনে তুলে ধরে দীপা। এই যুবককে বাবা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। স্বীকৃতি দেবার পরই অজয়ের এই চিঠিখানা। তাই এর ভাষাতে কোন জ্বালা নেই—আছে প্রগাঢ় প্রশান্তি এবং ব্যাকুল প্রতীক্ষা

অজয়কে সে ছেলেবেলা থেকে চিনত। চিনত বলেই মৃণালকে দেখে চমকে উঠেছিল প্রথমদিন। এমন আশ্চর্য রকমের মিলও থাকতে পারে দুটি মানুষের মধ্যে। সে আরও অবাক হয়েছিল মৃণালের স্বভাবের পরিচয় পেয়ে। তেমনি একরোখা, নির্ভয় —সবার সঙ্গে মিশেও নিজেকে স্বতন্ত্র রাখার এক অদ্ভুত ক্ষমতা। পৃথিবীর নারী-

জাতি এই ধরণের পুরুষকে বোধ হয় একান্ত আপন করে পায় না কখনো। কোথা একটা পাতলা ব্যবধানের আবরণ থেকে যায়। মৃণালের যে বয়স সেই বয়সে অজয়কে সে কখনো দেখে নি—কারণ অজয়ের চেয়ে সে বছর পাঁচেকের ছোট তবু সতেরো বছরের অজয়ের কথা তার আজও মনে আছে। সাইকেলের সা বসিয়ে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে বালির ঘর তুলতে তুলতে এক সময়ে ফ্রক-প দীপাকে সস্নেহে চুম্বন করেছিল। সেদিনের কথা শেষদিন পর্যন্ত মনে থাকবে। তা সেদিনের নীচু হয়ে আসা অজয়ের মুখখানাও তার হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে। সেই সঙ্গে তেরো-চোদ্দ বছরের মৃণালের মুখের অবিশ্বাস্য সাদৃশ্য। এই বয়সেই যেন মৃণালে মুখ সতেরো বছরের অজয়ের মুখের মত পরিণত। এই বয়সে অজয়ের ভেতরে নিশ্চয় ছেলেমানুষী ছিল। কিন্তু মৃণালের তা নেই। সতেরো কিংবা তার চেয়েও বে বয়সের মস্তিষ্ক মৃণালের—যার ছাপ আঁকা রয়েছে তার মুখে। অনাদর আর নির্যাত শুধু এমন করতে পারে না মানুষকে। এটা জন্মগত বলেই দীপার বিশ্বাস। সত্যি মৃণালকে এক এক সময় সমবয়সী বলে মনে হয়, অথবা পাঁচ বছরের বড়। মৃণাল বুঝে পারে না। ভাবে, দীপা মাসী রসিকতা করছে। জানে না, রসিকতা করার ম মালমশলা অতি অল্পই অবশিষ্ট রয়েছে তার।

রাগ করেছে মৃণাল। ছেলেমানুষের রাগ নয়। আত্মাভিমানে ঘা পড়লে পুরুষ যে ভাবে ফুঁসে ওঠে ঠিক সেইভাবে ফুঁসে উঠেছিল মৃণাল, তার পিঠের জামা তুলে ধরতেই উঃ কী সাংঘাতিক। অত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যে ছেলে সে কী ধাতুতে গ কল্পনা করা দুঃসাধ্য। আঘাতের অসংখ্য চিহ্ন পৃষ্ঠদেশে—দেখলে শিউরে উঠতে হয় অথচ সে নির্বিকার। এতটুকু সহানুভূতি বা স্নেহ ভালবাসার জন্যে লালায়িত নয় ব কঠিন মন। আর কি সে আসবে নিজে থেকে? ডাকলেও কি আসবে আর?

বাইরে কে যেন মিহি গলায় দীপাকে ডাকে।

হাতের ছবি আর চিঠিখানা গহনার বাক্সের মধ্যে ভরে, সেটি আলমারীতে তুলে রে চাবি বন্ধ করে দীপা। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে ক্ষেপা ঘোষের বউ ময়না দাঁড়ি রয়েছে সনৎ-এর আলোয়ান হাতে নিয়ে। চোখ-মুখে একটু জল দিয়ে নিয়ে আঁচ মুছে ফেলে দীপা।

হাসি মুখে দরজা খুলে ডাকে,—এসো ময়না।

—ঘুমের ব্যাঘাত করলাম।

—ভাল করেছ। গল্প করার লোক পাই না বলে ঘুমোই।

ময়না হেসে বলে,—হ্যাঁ। সংসার তো বাড়লো না আপনার—ছোটই রইল। ক নেই তাই।

ময়নার হাত থেকে আলোয়ানখানা তুলে নিয়ে তাকে সঙ্গে করে ভেতরে আসতে আসতে দীপা বলে,—এই ভাল।

—না না, আপনার মুখে একথা সাজে না। কী সুন্দর স্বাস্থ্য—শত পুত্রের জননী হতে পারেন। ও কথা বরং আমি বলতে পারি। দেহখানা দেখছেন তো—

—ডাক্তার কি বলে?

—এইভাবেই চলবে। তাছাড়া যা করলে কিছুটা আশা থাকে তাও করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

দীপা ময়নার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে থাকে। পেটের যন্ত্রণা অল্প বয়সী মেয়েটির জীবন নষ্ট করে দিল। বয়সে তার চেয়ে দু এক বছরের ছোটই হবে। অথচ এর মধ্যেই হাতের শিরা বার হয়ে পড়েছে। চোখের নীচটা বসে গিয়েছে। সুন্দরী না হলেও রীতিমত সুশ্রী বলা যেতে পারত ময়নাকে।

—আপনার আলোয়ান খুব ভুগিয়েছে। বিশ্রী ভাবে ছিঁড়ে গিয়েছিল। কি করে ছিঁড়লেন উনি?

দীপা জানে না, কী ভাবে ছিঁড়েছে। প্রশ্নও করে নি স্বামীকে। ছেঁড়া দেখে পাঠিয়ে দিয়েছিল ময়নাকে।

—ঠিক জানি না। উনিও জানেন না।

ময়না হাসে। হাসিটুকু এখনো তার সুন্দরই আছে। ছোট ছোট সমান দাঁত আর পাতলা আলতা-রঙের ঠোঁটের জন্যেই বোধহয় সুন্দর লাগে।

—কত বড় পণ্ডিত মানুষ। আলোয়ান কখন ছিঁড়ল কি করেই বা টের পাবেন।

—বস। একটু চা করি।

—চা? না দিদি। সহ্য হয় না।

—তবে একটু সরবৎ?

—শুধু শুধু কেন ওসব করতে যাবেন। তার চাইতে একটু গল্প করে চলে যাই।

দীপা ময়নাকে চেয়ারে বসতে দিয়ে নিজে আর একখানা টেনে নিয়ে বসে। ময়নার সব কিছুই তার জানা। ক্ষেপা ঘোষ যে মাতাল, সবাই জানে। তবু নিজেকে দীপা ময়নার সমপর্যায়ে ফেলতে পারে না। ময়না তার চাইতে অনেক উঁচুতে। ক্ষেপা ঘোষ কলেজের অধ্যাপক নয়—লেখাপড়া খুব বেশী জানা নেই। আদ্দির পাঞ্জাবী আর চাদরের পরিবর্তে সে বুকে লেবেল-আঁটা খাকির জামা পরে ঘুরে বেড়ায়। তবু সে সনৎ নয়। মাতাল অবস্থায় নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে তার অনেক অভিযোগ থাকে—তাকে শোনালেও, সেই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার অভিযোগের মধ্যেও অশ্লীলতা নেই। মাতাল ক্ষেপা ঘোষকে শহরের সবাই ক্ষমার চোখে দেখে! একটা স্নেহের ভাব রয়েছে

লবার তার প্রতি।

—কী ভাবছেন দিদি ?

মুখে হাসি টেনে দীপা বলে,—তেমন কিছু নয়। তোমার আমার কথাই—

—আপনার সঙ্গে আমার তুলনা। কী যে বলেন।

—কেন ময়না ? দুজনাই প্রায় সমবয়সী। তুমি আমার মত কলেজে পড়া মেয়ে না হলেও স্কুল ফাইন্যাল দিয়েছিলে। তুলনা হবে না কেন দুজনার ?

—ওইটুকুতে থামলে তো চলবে না। আরও একটু এগিয়ে দেখতে পাবেন, আমি আপনার চেয়ে শত যোজন দূরে পড়ে আছি। আমার স্বামী অতি সামান্য চাকরি করে আর আপনার উনি হলেন প্রফেসার। আমার স্বামী মদ খেয়ে রাস্তার ধারে পড়ে থাকে আর আপনার স্বামী সন্ধ্যা না হতেই মাথা উঁচু করে সেই যে বাড়িতে আসেন আর বার হন না। ওভাবে তুলনা করবেন না দিদি।

দীপা ভাবতে পারে নি এতটা এগোবে ময়নার মত শান্ত মেয়ে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,

—থাক্ ময়না। ওভাবে জিনিসটাকে মোচড় দিও না।

ময়নার মুখখানা প্রথমে বিকৃত হয়। তারপর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

দীপা চেয়ার ছেড়ে উঠে ময়নার পাশে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বলে,—ছিঃ, ভাই।

—এমন কথা মুখ দিয়ে কখনো উচ্চারণ করিনি দিদি। আজ থাকতে পারলাম না। পোড়া পেটে মোটা চাল সহ্য হয় না বলে লাইনের ওপার থেকে পুরোনো চাল আনতে প্রায়ই ওকে পাঠাই। চালের টাকায় মদ খেয়ে আসে। এক আধদিন দু এক কিলো আনে কি আনে না। তাতে কদিন যায় বলুন ? পর পর তিন দিন মোটা চাল খেয়ে কাল অসহ্য পেটের যন্ত্রণা হয়েছিল। ভগবান থাকুন আর না থাকুন, খুব ডেকেছিলাম তাঁকে। বলেছিলাম, এই যন্ত্রণাই যেন শেষ যন্ত্রণা হয়। হল না। আরও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এই কঙ্কালসার দেহখানা নিয়ে। পূর্বজন্মের পাপের ফল।

—আর কাউকে আনতে বললে পার।

—না দিদি। আমার স্বামী নির্ভরযোগ্য নয়, একথা লোকে জানলেও, তারা তো জানে না, আমি নিজেও সে কথা ভাবি।

বিস্ময়ে মূক হতে হয় দীপাকে। ময়নার কথায় শুধু যে আত্মসম্মানবোধ প্রকাশ পায় তা নয়, স্বামীর প্রতি একটা অদৃশ্য মমত্ববোধ স্পষ্ট ধরা পড়ে।

ময়না বলে, দীপার চেয়ে সে শত যোজন পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। আসলে কে পড়ে রয়েছে, ময়না তার খোঁজ রাখে না। স্বামীর জন্যে ময়নার যে লজ্জা সে-লজ্জা অতি

সাধারণ ধরনের এক স্খলনের দরুন। তাই সে দীপার সামনে কাঁদতে পারল। কিন্তু দীপা কি পারবে ময়নার সামনে চোখের জল ফেলতে? না। তাকে কাঁদতে হবে লোকচক্ষুর আড়ালে—যেমন কাঁদছিল ময়না আসবার আগে। ক্ষেপা ঘোষের চরিত্রের যে স্খলন, সবার চোখে পড়লেও কেউ তাকে দূরে সরিয়ে দেয় না। কিন্তু অধ্যাপকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ছিটেফোঁটাও যদি আঁচ করতে পাপে কেউ তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কী সাংঘাতিক হবে ভাবা যায় না।

—তোমার স্বামীর ওই একটি মাত্র দোষ রয়েছে ময়না। নইলে তার মতন মানুষও তো চোখে পড়ে না। অমন সরল সহজ না হলে লোকের ভালোবাসা পাওয়া যায়?

দীপার পেছনে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়না। সেই আয়নায় ময়না নিজের চেহারা প্রতিবিম্বিত দেখে। বাড়ির ছোট আয়নাতে শুধু মুখটুকুই দেখা যায়। আজ নতুন করে নিজেকে দেখল। দীপার পেছন দিকের অংশবিশেও দেখা যায় ওর মধ্যে। কী সুন্দর! সেই তুলনায় নিজেকে মনে হচ্ছে রুগ্ন—প্রৌঢ়া। ক্ষেপা ঘোষের সহিষ্ণুতা অসীম।

দীপার কথার জবাবে সে বলে,—জানি। আরও জানি ওই একটি মাত্র বদ-অভ্যাসের জন্যে আমি দায়ী। আগে তো খেতো না ওসব ছাই-ভস্ম? এখন কেন খায়?

দীপা চুপ করে থাকে। ময়নার ভেতরের কথাকে সে টেনে বার করতে চায় না। বলে যদি শান্তি পেতে চায় তো নিজেই বলবে।

—আমার জন্যে খায়। কী লজ্জা। কাউকে বলতে পারি না মুখ ফুটে। যদি পারতাম, সবাই বুঝত। নিজের কুবুদ্ধিতে মদ খায় না ও। আমার দোষে খায়। আমার এই স্বাস্থ্য; কিন্তু ওর স্বাস্থ্যখানা দেখছেন তো? অমন স্বাস্থ্য কয়জনার আছে। ওই স্বাস্থ্যের বড় গর্ব ছিল ওর। বিয়ের পর হাত-পায়ের মাস্‌ল্ ফুলিয়ে আমাকে দেখাত। আর দেখাত মাথার কাটা দাগ। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ও ছিল ছেলেমানুষ। বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল পুলিশের সামনে। মাথায় পুলিশের লাঠি এসে পড়েছিল। ও জানত না ওর শক্তি আর স্ফূর্তিকে ধারণ করবার মত উপযুক্ত দেহ আমার নয়। আমি অশক্ত, আমি দুর্বল—ব্যাধিগ্রস্ত। প্রথম প্রথম বিশ্বাস করতে পারত না। তার-পর বুঝল সব। ওর মুখে হতাশা ফুটে উঠল। আমি কাঁদলাম—এখনো কাঁদি। কিন্তু ওকে দোষ দিতে পারি না। এরপর হতাশা পরিণত হল বিরক্তিতে—আর বিরক্তি শেষ পর্যন্ত মদে।

দীপা স্তব্ধ হয়ে শুনে যায়। রিপু করা আলোয়ান ফিরিয়ে দিতে আসাটা অছিলা। আসলে ময়না এই নির্জন দ্বিপ্রহরে এসেছে সবকথা উজাড় করে দিয়ে শান্তি পেতে। হয়ত সে মনে মনে ভেবেছে বেশীদিন বাঁচবে না আর। ভগবান এবারে তার প্রার্থনায়

কর্ণপাত না করলেও পরের বার করতে পারেন।
—তুমি সৌভাগ্যবতী ময়না।
—একথা বললেন কেন?
—তোমার স্বামী শুধু মদকে সম্বল করেছেন বলে।
ময়না মেঝের দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। তারপর দীপার চোখের দিকে চায়। পরস্পরের চোখে কী ফুটে ওঠে উভয়ের কারও বুঝতে অসুবিধে হয় না।
—আজ চলি দিদি।
—আর একটু বসবে না?
—হারু মাস্টারের বাড়িতে যাব একবার। মাস্টারের ছোট ছেলের জন্যে ছাগলের দুধ নেবে বলেছিল। একটা ছাগল পুষেছি।
—হারু মাস্টারের বোবা মেয়েটা কেমন আছে?
—লক্ষ্মী? ভালই আছে। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। অত রূপ নিয়ে কী করবে বলুন তো? রূপই যখন দিলেন ভগবান, তখন বোবা করলেন কেন বুঝি না।
—সতেরো আঠারো বছর বয়স হবে না?
—তা প্রায় হবে বৈকি।
—হারু মাস্টারের মনে বড় অশান্তি তো।
ময়না চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ম্লান হেসে বলে—সংসারে কার অশান্তি নেই দিদি? একটা না একটা অশান্তি আছেই। আপনার মত ভাগ্যবান কয়জনে হয়?
দীপা মনে মনে বলে, দেখাবো? একবার দেখাবো আমার বুকের ভেতরটা? একবার শুনবে আমার সব কথা বোকা মেয়ে? তোমাদের চোখ দিয়ে শুধু বর্ণহীন অশ্রু গড়ায়, আর আমার হৃদয় চুঁইয়ে রক্ত ঝরে। তোমাদের অশান্তি যদি ছুরির আঘাত হয়, আমার অশান্তি এ্যাসিডের জ্বলুনি। আমার ভাগ্যের ধারে কাছে এসো না ময়না।
মুখে দীপা বলে,—কার ভাগ্য কীরকম বাইরে থেকে কী বোঝা যায় ভাই?
—হয়ত যায় না। মানুষ কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। তবে আপনার স্বাস্থ্যকে হিংসা করতে আমার অন্তঃ ক্ষতি নেই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি পরের জন্মে যেন আপনার মত স্বাস্থ্য পাই, আর ওকেই যেন আবার স্বামী হিসাবে পাই। সেবারে ও আর মদের ধারে কাছে যেতে চাইবে না।
দীপা অদ্ভুতভাবে হেসে বলে,—তুমি কথায় কথায় ভগবানকে টেনে আনো দেখছি। খুব বিশ্বাস কর।
—না না, বিশ্বাস করি বলবেন না। ওটা কথার কথা। মা, দিদিমারা ব্যবহার করতেন বলে আমিও করি। অন্যভাবে বলতে পারি না, বলতে জানিও না।

ময়না চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

—তোমার রিপুর জন্যে কত দেব?

—দেবেন যা হয়।

—এখন নেবে না?

—না। জমা থাক। এসব পয়সাতেই চাল কিনি। পেটের ব্যথাই আমার অশান্তির মূল। অথচ এই পেট একটা সন্তান দিতে পারে না। দিতে পারলে, ও ঠিক ভুলে থাকত তাকে নিয়ে।

কথাটা বলেই সংকুচিত হয়ে পড়ে ময়না। ভুল করেছে সে। দীপাও সন্তানহীনা।

দীপা হেসে ওঠে,—লজ্জা কি? আমিও তোমার দলে। আমার কিন্তু দুঃখ নেই কোন।

—বললেই কি বিশ্বাস করি দিদি?

দীপাও তাই চায়। সে চায় না যে কেউ বুঝুক সনৎ-এর সন্তান গর্ভে ধারণ করতে সে ঘৃণা বোধ করে। সনৎ অক্ষমই হোক, আর সে বন্ধ্যাই হোক, ভগবানের কৃপা বলতে হবে।

ময়না চলে গেলে সে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। এই স্বাস্থ্যকে হিংসে করে ময়না। এই স্বাস্থ্য পেলে ক্ষেপাকে সে বশীভূত করে রাখতে পারত। অথচ অধ্যাপকের জন্য এ স্বাস্থ্য রাখার কোন প্রয়োজন নেই। তবু আজ যদি তার নিজের স্বাস্থ্য ময়নাকে উপহার দেবার মত সামর্থ্য থাকত, সে কিছুতেই দিত না। তার নির্বিকারত্ব মাঝে মাঝে আটাত্তর বছরের বৃদ্ধার সঙ্গে তুলনীয় হলেও, এই স্বাস্থ্যের পুঁজি নিয়ে এখনো সে অবিশ্বাস্য সব কল্পনা করতে পারে মাঝে মাঝে। জেগে জেগে কোটি কোটি টাকার স্বপ্ন দেখার মত এই স্বাস্থ্যকে সম্বল করে সে মুখ-লাল-হয়ে ওঠা কত সব অবাস্তর কথা ভাবে। নিজের মুখখানাকে ভালভাবে দেখতে থাকে দীপা। প্রতিদিন দেখে এ মুখ—সেই কবে থেকে। তাই বুঝতে পারে না কোন পরিবর্তন। অথচ নিশ্চয়ই পরিবর্তন হয়েছে। বয়স 'অনুযায়ী' মুখের বয়সও বাড়ছে। এখন তার মুখ দেখে কেউ দশ-বারো বছরের খুকী বলে ভাবে না। স্বাস্থ্যের মত মুখের বয়সও যদি সে বেঁধে রাখতে পারত, বড় ভাল হতো।

দূর থেকে দীপা মাসীর বাড়ির দরজায় মাসিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধাঁ করে বাঁদিকের রাস্তায় ঘুরে যায় মৃণাল। সে যাবে না ওখানে। যেখানে যাচ্ছে এখন সেখানেই সোজা যাবে। রেল লাইনের ওপারে মায়ের সই-এর বাড়ি, সই-এর চোখের ছলছলানি সে স্পষ্ট দেখেছিল সেদিন রাস্তায়। সেদিন সই-এর একখানি হাত তার পিঠের ওপর

এক অনাস্বাদিত সান্ত্বনার উষ্ণতা সৃষ্টি করেছিল।

দীপা মাসীর দাঁড়াবার ভঙ্গিটা খুবই বিষাদক্লান্ত মনে হয়েছিল। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে মাসী, পিঠের জামা তুলে সে ঘোরতর অন্যায় করেছে। বুঝে, দুঃখ পেয়েছে। পাওয়াই উচিত। প্রতিটি অন্যায়ের ফল এভাবে যদি সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভোগ করত, তাহলে অহেতুক অত্যাচার আর অবিচারের হাত থেকে বহু মানুষ রেহাই পেত। কিন্তু যা হবার নয় সেকথা ভেবে লাভ নেই। যদি হত, তাহলে সেই প্রস্তর যুগের আমল থেকে এই কয়েক লক্ষ বছরে পৃথিবী থেকে অত্যাচার একেবারে মুছে যেত। কাকা ওভাবে দিনের পর দিন তার দেহের উপর যথেচ্ছভাবে হাত-পা চালিয়ে যেতে পারত না।

দীপা মাসী যদি দুঃখ পেয়ে থাকে, ঠিক হয়েছে। হারু মাস্টার পড়াতে পড়াতে একদিন বলেছিল দুঃখ আর অনুতাপের আগুনে মানুষের ভেতরের কু-ভাব দগ্ধ হয়ে গিয়ে, তাকে মানুষ হবার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। দীপা মাসী এগোক যতটা পারে, এগোবার পথে হাজির হয়ে সে বাধার সৃষ্টি করবে না। সোজা মায়ের সই-এর বাড়িতেই যাবে এখন। পরে যদি সত্যিই দীপা মাসীর পরিবর্তন হয়, দেখা যাবে তখন।

সোজা কিছুদূর এগিয়ে ডানদিকে ঘুরলে রেল লাইন। রেল লাইন পার হয়ে মায়ের সই-এর বাড়ি। ছ'সাত বছর আগের সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া। তবু পরিষ্কার মনে আছে বাড়ির ভেতরের ছবিটি। ওপথে সে পরেও গিয়েছে হাবলুর সঙ্গে, কিন্তু বাড়ির ভেতরে যায় নি কখনো। অদম্য প্রলোভন সত্ত্বেও যায় নি। শেষ মুহূর্তে কী যেন বাধা দিয়েছে তাকে মনের ভেতর থেকে।

জয়-মা-কালী সাইকেল স্টোর্সের জীবনের টিনের বাড়ি পার হবার সময় জীবনের বউ তাকে দেখতে পেয়ে ডাকে। প্রাণনাথ গোঁসাই-এর বড় মেয়ে জীবনের বউ, আর ছোট মেয়ে ভেলুর বউ। মেয়ে ইস্কুলের কেরানিগিরি ছাড়াও প্রাণনাথ গোঁসাই এখনো কাকার বাড়িতে নিয়মিত প্রতিটি পূজা করে। তবে কোজাগরী লক্ষ্মী ও শ্রীপঞ্চমীর সরস্বতী পূজায় ধুমধাম বেশী। কাকীমার আশা তার পুত্র বীরেশ ধনে ও জ্ঞানে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র হবে।

মৃণাল লক্ষ্য করে প্রাণনাথ গোঁসাই-এর বড় মেয়ে বিয়ের পর বেশ মোটা হয়েছে। আগে ছিল চিমড়ে-ধরা। গোঁসাই একদিন হাসতে হাসতে কাকীমাকে বলেছিল, বিয়ের জল পড়ে মেয়ের রূপ খুলেছে।

জীবনের বাড়ির দরজার সামনে যায় মৃণাল।

—একটা কাজ করবি মৃণাল?

—এখন সময় হবে না। ওপারে যাচ্ছি।

—লক্ষ্মীটি, দাদাটি—একটুও সময় নষ্ট হবে না। শুধু যাবার সময় ওই চায়ের দোকানের একজনকে একটা কথা বলে যাবি।
—কি বলতে হবে, বল।
—কাকে বলতে হবে, আগে শোন্।
—জানি। প্রিন্সিপ্যালের ছেলে কেষ্ট তো?
জীবনের বউ-এর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ফিস্ ফিস্ করে বলে,—কি করে বুঝলি?
—সেকথা শুনতে হবে না।
—বলনা লক্ষ্মীটি।
—তার সঙ্গে তোমার তো ভাব। রেল লাইনের ধারে বেড়াতে না? কত দেখতাম।
—দেখেছ? কী ডেঁপো ছেলে।
—গালাগালি দিও না। চললাম।
—গালাগালি দিলাম? তুই কী অভিমানী রে!
মৃণাল বিরক্তবোধ করছিল। কোনমতে বলে,—খুব হয়েছে, কী বলতে হবে বল।
—বলবি, সে স্টোর্সে চলে গিয়েছে।
—কে চলে গেল স্টোর্সে?
এবারে জীবনের বউ-এর বিরক্ত হবার পালা। বলে,—তাতে তোর দরকার কি? কেষ্টদাকে শুধু এই কথাটা বলবি।
—আমি পারব না।
—বাবা, অমনি রাগ হয়ে গেল? তোরা সবাই সমান। কেষ্টদাও অমন। পান থেকে চুন খসলেই রাগ। সব কথা কি তোকে শুনতে হবে?
—শুনতে চাই না। বলতেও চাই না কাউকে।
জীবনের বউ মৃণালের হাত চেপে ধরে। মৃণাল অনুভব করে দীপা মাসীর মত এ-হাত মসৃণ নয় মোটেও। এত বেশী খসখসে যে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মায়ের সই-এর হাত নিশ্চয়ই দীপা মাসীর মত হবে।
—বলগে ভাই। আমার এই সামান্য উপকারটুকু করে দে। তোকে দশটা পয়সা দেব।
মৃণালের মুখ লাল হয়ে ওঠে। পয়সা দিতে চাইছে প্রাণনাথ গোঁসাই-এর মেয়ে। নিশ্চয়ই ঠেকায় পড়েছে।
—আচ্ছা বলব। ছাড়ো।
—কী বলবি?

—বলব যে জীবনদা জয়-মা-কালী স্টোর্সে চলে গিয়েছে। এবারে তুমি যাও।
চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে সদ্য বিবাহিতা মেয়েটার। তবু প্রশ্ন করতে পারে না।
কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে,—কি করে বুঝলি তোর জীবনদা চলে গিয়েছে?

—তুমিই তো বললে।

—বাবাঃ ছেলে নয়তো—

মৃণাল এগিয়ে যেতে বাধা পায় আবার। জীবনের বউ বলে—এক কাজ কর। শুধু বলিস মাস্তুদি ডাকছে।

—ঠিক আছে।

—পয়সা নিয়ে যা।

—না। কেষ্টকে মুড়ি কিনে দিও।

মৃণাল তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। মাস্তুদি বলে সে কখনো ডাকে নি একে। প্রাণনাথ গোঁসাই-এর বড় মেয়ে বলেই জেনে এসেছে বরাবর। একে দিদি বলে সম্বোধন করবার প্রয়োজনই হয় নি কখনো। প্রিন্সিপ্যালের ছেলে কেষ্টর সঙ্গে অনেকেই ঘুরতে দেখছে লাইনের ওপর বহুদূরে। মৃণাল নিজে চোখে তো বহুবার দেখেছে। শহরের প্রাচীন লোকেরা এতে মুখ বাঁকাতো। কেষ্টর খুব দুর্নাম রয়েছে। প্রিন্সিপ্যালের ছেলে হয়েও বিদ্যের দৌড় হায়ার সেকেণ্ডারী। বাপ কলেজের অধ্যক্ষ বলে শহরের কলেজে না পড়ে কলকাতায় গিয়ে ভর্তি হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। চার মাস পরে দুই গালে এক গাদা কালো ব্রণ নিয়ে শরীরটাকে রোগা লিক্‌লিকে করে ফিরে এল, আর গেল না। এরপর থেকে তার অনেক কীর্তি-কাহিনী অনেককে ফিস্‌ফিস্ করতে শুনেছে মৃণাল। কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝেছে, কেষ্টর চেষ্টার চেয়ে অপচেষ্টা বেশী, ভালর চেয়ে খারাপের দিকে ঝোঁক বেশী। এই ছোট্ট শহরে তাকে মোটামুটি পছন্দ করে এমন মানুষ গুনতে হাতের একটি আঙুলেরও প্রয়োজন হবে না।

চায়ের দোকানের সামনে থেমে মৃণাল হাঁক দেয়—কেষ্টদা।

নীলপ্যান্ট পরা যুবকটি গগল্‌স্-এর ভেতর থেকে তার দিকে তাকায় এটুকু অনুমান করে সে।

হাত নাড়িয়ে মৃণাল কাছে ডাকে তাকে।

কেষ্ট বেঞ্চি থেকে লাফ দিয়ে উঠে এসে বলে, কি বলছিস্?

—ডাকছে।

—কে?

—মাস্তুদি। বলে দিয়েছে, জীবনদা দোকানে চলে গিয়েছে।

কেষ্টর মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে। বলে—যা যা, ঠিক আছে।

শাল দাঁড়ায় না। কিছুদূর যেতেই পেছন থেকে ডাকতে শোনে কেষ্টকে। সে পেক্ষা করে। কেষ্ট নিজেই এগিয়ে আসে।

এই শোন্, হারু মাস্টারের মেয়েটা নাকি বোবাদের মত চেঁচায় না?

-না।

-মারধোর করলেও চুপ করে থাকে?

-তাকে কেউ মারে না।

ধর, তুই যদি তার হাত চেপে ধরিস—চেঁচাবে?

-না। আমি কত ধরেছি। চেঁচাবে কেন?

-খপ্ করে হাত ধরলেও চেঁচাবে না।

ালের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। জবাবে বলে—খপ্ করে হাত ধরে দেখব তবে একদিন।

ষ্ট হি হি করে হাসে। ওর গালের ব্রণর দাগ আরও কালো দেখায় হাসলে।

তুই ডেঞ্জারাস্ ছেলে দেখছি।

র হাসি দেখে মৃণালের পিত্তি জ্বলে যায়। সে আর অপেক্ষা না করে চলতে শুরু ের।

ছুটা এগিয়েই সামনে রেল লাইন। সেই কাঠের স্লিপার জড়ো করা রয়েছে। সেই মুল গাছ আর বুনো গাছের নীলচে ফুল। সেই জায়গাটার একটা অদ্ভুত গন্ধ রয়েছে। লগাড়ির যে গন্ধ, সেই গন্ধ নয় ঠিক। অন্য রকমের—সম্পূর্ণ অন্য রকমের। ঠিক ঝ উঠতে পারে না স্পষ্ট করে। তার এ-গন্ধ তাকে যেমন প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে, মনি দূরেও ঠেলে দিতে চায়। যেন বলে,—এসো—আরো কাছে এসো। না, এসো না—পালাও—শিগগির পালাও। আহা, চলে যাচ্ছ? এসো—এসোই

রু মাস্টারের কথা কানে বাজে,—প্রথমে লাইনের ধারে। ধীরে ধীরে লাইনের ার। শেষে একদম চাকার নীচে। বাপ-মায়ের যে গতি হয়েছিল, ওর কপালে ই নাচছে। স্রেফ তাই।

রু মাস্টারের কাছে যেতে হবে কাল। হাবলুর কাছে যেতে হবে কাল। হাবলুর ছ থেকে বই যোগাড় করেছে সে। হাবলুর অভিমান হয়েছিল, সেদিন ভোর-েত ডেকে খেজুরের রসের সন্ধানে যাওয়া হয় নি বলে। ওর কথায় কথায় অভিমান। য়ের কাছে একদিন অভিমান করতে দেখেছে ওকে মৃণাল। সেই অভিমান ভাঙাতে মায়ের কত সাধ্য সাধনা। মৃণালের ইচ্ছে হয়েছিল ওর মায়ের মত করে অভিমান ভায়। কিন্তু বেজায় হাসি পেয়েছিল। অভিমান জিনিসটার মধ্যে বিরাট এক মা আছে বলে মন হয় তার। যে করে আর যে ভাঙায় দুজনেই যেন তা বুঝেও

বুঝতে চায় না।

লাইনের ওপর ওঠে মৃণাল। মায়ের মসৃণ সাদা কাটা পা, বাবার বিকৃত দেহ যথারীতি তার চোখের সামনে ভাসে। সে দুই দিকে একবার ভালভাবে দেখে নেয়। ট্রেন এলে, আগের মত এখন যে দিক্‌চক্রবালে ধোঁয়া দেখা যাবে, এমন কথা নেই নিঃশব্দে আসতে পারে ইলেক্‌ট্রিক। তারপর কেবিনের সামনে এসে মিষ্টি হুইসেলের আওয়াজ। শেষে লাইনের উপর ঢক্‌ ঢক্—ঢক্‌ ঢক্‌ শব্দ। ভাল করে সে দেখে নেয় তাই। হারু মাস্টার ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে এমন বিশ্বাস তার নেই। তবু অনেক কথা, ভবিষ্যৎবাণীর মতই ফলে যায়—ফলে যেতে দেখেছে সে। সাবধানের মার নেই। চার জোড়া লাইন পার হতে হবে তাকে। আপ, ডাউন, থ্রু আর মালগাড়ি।

লাইনের ওপারে পৌঁছে, পুরোনো স্লিপারের স্তূপের পাশে দাঁড়ায় সে। তার বাবা নিরাপদে পার হয়ে এসেছিল। কিন্তু ফেরার পথে ওপারে পৌঁছোতে পারল না। এই স্লিপারের পাশে একটি পাথরে হোঁচট খেয়ে তার পায়ের নখ উঠে গিয়েছিল অনেকটা। কাঁদে নি। বাবা কোলে তুলে নিয়েছিল। মা মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল। মা অসন্তুষ্ট হয়ে কথা বললেও মিষ্টি শোনাতো। লক্ষ্মীদি কথা বলতে পারলে মার মতই মিষ্টি লাগত শুনতে। প্রিন্সিপ্যালের ছেলেটা জানতে চায়, খপ্‌ করে হাত চেপে ধরলে লক্ষ্মীদি চেঁচিয়ে ওঠে কিনা। কেন জানতে চায়, কে জানে। কাকীমার মত মানুষও কেষ্টর কথা শুনে মুখ বিকৃত করে।

লাইনের উঁচু জায়গা থেকে নীচে নামে মৃণাল। পর পর ছয়টি খেজুর গাছ নীচে। খেজুর গাছের ভাঁড় খুলে নিয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যের আগে আগে আবার ঝুলিয়ে দেবে। সারারাত টপ্‌টপ্‌ করে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ে সকালে ভাঁড়গুলো পূর্ণ হয়ে থাকে। হারু মাস্টার একদিন এক ভাঁড় রস দেখে বলে উঠেছিল., আহা! পূর্ণ কুম্ভ। মৃণাল গাছের নীচে জিভ বার করে দাঁড়িয়ে দেখেছে, তৃষ্ণা মেটে নি। কিছুক্ষণ পর পর এক ফোঁটা করে পড়ে। তাও অধিকাংশই জিভের বাইরে। নাসারন্ধ্রের মধ্যেও ঢু যায়। হাবলুকে একবার সঙ্গে আনতেই হবে। নইলে ওর অভিমান যাবে না। ছাড়া হাবলু ছেলেটা ভাল। পড়বার বই সে-ই একমাত্র ধার দেয় বিনা দ্বিধায়। অ কেউ ওভাবে দিতে পারে না। অন্যেরা সহস্রবার মনে করিয়ে দেয়, পরদিন সকাল মধ্যে ফিরিয়ে দিতে যাতে ভুল না হয়। হাবলু তেমন নয়। সবাই পরিষ্কার মনে কিছু দিতে পারে না। প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েও নয়। দেবার মন আলাদা সেদিক দিয়ে দীপা মাসীর সঙ্গে হাবলুর সাদৃশ্য রয়েছে। দীপা মাসীর দেবার মন দরা একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। অথচ সুব্রত মল্লিকের ছেলে সুশান্তর মনটা ছোট। সুশান্ত তার ক্লাস ফ্রেণ্ড। কখনো একটা বই দুদণ্ডের জন্যেও দেখতে দি

য় না সে। কত ভাল ভাল বই আনে ইস্কুলে। ক্লাসের সবাইকে রঙচঙে মলাটটা খিয়ে অন্য বই-এর মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দেয়। কেউ হাতে নিলে ওর বুকের মধ্যে ক্ ধক্ করে ওঠে। কত সময় ইচ্ছে হয়, কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দতে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সুশান্তর বাবা সুব্রত মল্লিক ইস্কুলের সেক্রেটারী। কিন্তু র চেয়ে নিকৃষ্ট পরিচয় রয়েছে সুশান্তর স্বভাবে। ওদেরই উনচল্লিশী আমবাগানটি ণাল আর হারু মাস্টারের বাড়ির মাঝখানে। সেই বাগানে আমের সময় সুশান্ত প্রায়ই আসে আম পাড়া দেখতে। মৃণাল তার দলবল নিয়ে মজা করবার জন্যে কত ময় সুশান্তর কাছে গিয়ে বলেছে, আম দিতে। মুখখানা তখন দেখবার মত হয়ে ওঠে সুশান্তর। কখনো বলে, এবারে আম একদম হয় নি। কখনো বলে, এসব আম থেকে কটা আম কম পড়লে বাবা মেরে ফেলবে। কারণ আমগুলো দিদির শ্বশুরবাড়ি যাবে। আরও কতরকম কৈফিয়ৎ যে দেয় সে সামান্য দু-একটি আমের জন্যে।

একবার শুধু সে মৃণালকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে কাছে ডেকেছিল। মৃণাল গিয়ে উপস্থিত হলে, সে মহা উৎসাহে একটি আম এগিয়ে ধরে বলেছিল,—তোর জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করছি। এই নে। মৃণাল অবাক হয়ে আমটি হাতে নিয়ে দেখে, একপাশে অনেকটা বাদুড়ে খাওয়া। সে ছুঁড়ে ফেলে দিতে সুশান্ত চমকে উঠে বলে—ফেলে দিলি? বোম্বাই আমটা ফেলে দিলি? একদিকটা বেশ ভাল ছিল। কত দাম ওটার জানিস কলকাতার বাজারে? সেদিন মৃণাল রেগে গিয়ে পাহারাওলার ওপর কড়া নজর রেখে চান্দটা বোম্বাই আম সরিয়েছিল।

পথ চলতে চলতে কখন যে মায়ের সই-এর বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল, খেয়াল ছিল না মৃণালের। এ-বাড়ির সামনে দিয়ে সে বেশ কয়েকবার গিয়েছে। কিন্তু সামনের ঐ আমগাছটি ছাড়া আর কিছুই ভালভাবে লক্ষ্য করে নি কখনো। বাবা-মায়ের সঙ্গে এসে ওই আমগাছই প্রথম তার নজরে পড়েছিল। গাছের কাণ্ডটা অদ্ভুত-ভাবে বাঁকানো। যেন শুয়েছিল গাছটা, হঠাৎ কারও সাড়া পেয়ে মাথা উঁচু করেছে। কাণ্ডটা যেখানে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল সেখানে সে পায়ের নখের ব্যথা ভুলে উঠে বসে ব আনন্দ পেয়েছিল। তার পাশে বসেছিল, মায়ের সই-এর মেয়েটি। নামটা এখন আর মনে করতে পারে না। ঐ মেয়েটির জন্মদিনে নিমন্ত্রণ ছিল তাদের। কী কী খেয়েছিল সেদিন, ভুলে গিয়েছে। তবে সবকিছুর শেষে ক্ষীর ছিল একথা আজও ভোলে নি। বেশী ক্ষীর খেয়ে গা বমি বমি করছিল বলে বাবা পান থেকে একটা লবঙ্গ খুলে নিয়ে তার মুখে ফেলে দিয়ে বলেছিল—আস্তে আস্তে চিবোবে। লবঙ্গটা খুব ঝাল ছিল। তবু সে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। তারপর বাড়ি ফেরার পথে লাইনের ওপর যখন সব কাণ্ড ঘটে গেল, তার এক মুহূর্ত আগেও মুখের ভেতরটা লবঙ্গের ঝাঁঝে

কেমন ছলছলে লাগছিল।

আম গাছটির শোয়ানো কাণ্ডের ওপর সেদিনের পরে আরও অনেকেই বসেছে আজও বসে। একবার মাত্র দেখেই অনুমান করতে অসুবিধা হয় না মৃণালের গাছের ওই অংশটুকু মসৃণ এবং মলিন। হারু মাস্টার বলে, মানুষ হচ্ছে সব চাইতে সাংঘাতিক জীব। বাঘ, ভালুক, সাপ খোক মানুষের তুলনায় নস্যি। কথাটা বলেই বোধহয় মাস্টারের নস্যির কথা মনে পড়ে। নস্যির ডিবে সামনে তুলে ধরে ডা হাতের দুই আঙুল দিয়ে ঠুকতে শুরু করে। মৃণালের কতবার মনে হয়েছে নস্যি নেবার চাইতে ডিবে ঠোকাতেই বোধহয় আমেজ বেশী। কারণ ওইভাবে ঠুকতে ঠুকতে মাস্টার কত সময় নস্যি নিতে ভুলে যায়। না নিয়ে হয়তো বলে,—বাঘ ভালুক, জন্তু-জানোয়ার, কীট-পতঙ্গ যেখানেই থাকুক, প্রকৃতির কোন অনিষ্ট হতে দেখেছিস? মাথা নাড়ছিস কেন গাঁড়োল? মনে হচ্ছে যেন, আমার কথা সব বুঝে ফেলেছিস? ঘোড়ার ডিম বুঝেছিস। শোন্ মাঠে তো গরু চরে। মাঠের ঘাস অদৃশ্য হয় তাতে? অথচ গরুর প্রধান খাদ্যই ঘাস। কিন্তু মাঠের মধ্যে দিয়ে মানুষ চলে যখন, তখন কি হয়? অমন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছিস কেন? কি হয় বলতে পারিস না হাঁদারাম? ঘাস অদৃশ্য হয়। পায়ে চলার রাস্তা দেখিস না মাঠের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যায়? একটি নিষ্পাপ শিশুও যদি ঘাসের ওপর দিয়ে একই রাস্তায় চারদিন হাঁটে, দেখবি পাপের আগুনে ঘাসের রাজ্যে মড়ক লেগেছে। বুঝলি জাম্বুবান?

সত্যিই তাই। মায়ের সই-এর বাড়ির আমগাছের বাকলও যেন ক্ষয়ে গিয়েছে হেলানো জায়গাটিতে। তবে গাছের মাথা আগের মতই সজীব। আর মাস দু একের মধ্যে মুকুল দেখা দেবে ওই গাছে। তারপর আমের গুটি হবে।

মৃণাল এগিয়ে যায়। একটি মেয়ে তাকে দেখতে পায়। তার চাইতে ছোট। এ-বাড়ির কেউ হতে পারে। তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

মৃণাল ডাকে,—শোনো।

মেয়েটি এগিয়ে আসে। মৃণাল লক্ষ্য করে, ওর দুই হাত মাটিমাখা। খেলা করছিল কিংবা কাজ করছিল। একটি ময়লা ফ্রক তার পরনে। টিটুর ফ্রকও এমন ময়লা থাকে।

মৃণাল বলে,—এটা তোমাদের বাড়ি?

—হ্যাঁ।

—আমি তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমার মা তোমার মায়ের সই ছিল।

-তোমায় তো দেখিনি কখনো।

-আসিনি কখনো। তোমার জন্মদিনে নেমন্তন্ন খেয়ে যখন বাড়ি ফিরছিলাম, ামার মা-বাবা দুজনেই গাড়ি চাপা পড়ে।

ময়েটি চোখ বড় বড় করে বলে,—ও হ্যাঁ, আমি শুনেছি। দাঁড়াও, মাকে ডেকে ়চ্ছি।

-তোমার নামটা আমার মনে নেই।

-ডাকনাম পাখী।

ময়েটি নিজের নাম বলে হেসে ওঠে। মৃণালও হাসে। বলে,—আমার নাম কিন্তু াঘ নয়।

-বাঘ আবার এত রোগা হয় নাকি? দাঁড়াও। আচ্ছা তুমিও চল আমার সঙ্গে। ণাল অনুসরণ করে। মেয়েটাকে প্রথম দেখে বোকা মনে হয়েছিল। মাটি-মাখা াত দুটো দু'দিকে ছড়িয়ে কেমন ভাবে যেন চেয়েছিল তার দিকে। কিন্তু আসলে বশ চালাক। দু' একটা কথার মধ্যে ওর সপ্রতিভতা ধরা পড়েছে। মনটা খুশীতে ়রে ওঠে। মায়ের সই-এর বাড়িতে এরপর থেকে সে আসতে শুরু করলে, পাখী ার সঙ্গী হলে মন্দ হবে না। তবে ওকে সঙ্গী করে হাবলুর মত রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা ম্ভব হবে না। তবু যতটুকু সময় এ বাড়িতে থাকবে, ততটুকু সময় ভালই কাটবে। াড়ির মধ্যে এসে মৃণাল দেখে সে আদৌ চিনতে পারছে না কিছু। অথচ তার মনের ধ্যে আবছা একটা ছবি ছিল এই বাড়ির ভেতরটা সম্বন্ধে। হয়ত সব বদলে গিয়েছে। কংবা যে ছবিকে সে এ-বাড়ির বলে ভাবত, সেটা অন্য কোন জায়গার। তার নে আছে, রান্নাঘরের মস্ত বারান্দায় বসে সে ক্ষীর খেয়েছিল। কিন্তু এই বারান্দা মাটেই প্রশস্ত নয়। বরং ছোট।

াখী বলে,—তুমি একটু দাঁড়াও। মা ঠাকুর ঘরে আছে।

—তোমাদের বাড়ির ভেতরের কথা আমার একদম মনে নেই।

—এবারে মনে থাকবে তো?

—হ্যাঁ। যদি কখনো অদল-বদল করা না হয়।

মৃণালের দিকে চেয়ে বলে,—তোমার মুখে অত দাগ কেন?

—খেলতে গিয়ে কেটেছে। মাসীমা কখন বার হবেন?

াখী সে কথার জবাব না দিয়ে বলে—খেলতে গেলে রোজই কাটে বুঝি? আমাকে মার বোকা বোঝাতে হবে না। তুমি মারামারি কর নিশ্চয়।

প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চেষ্টা করে মৃণাল মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে,—রোগা বাঘ কি মারামারি করতে পারে?

পাখী বলে,—বাঘের আবার মোটা আর রোগা। সবাই সমান। স্বভাব।

মৃণাল হেসে ওঠে। পরক্ষণেই হাসি থামিয়ে সে ভাবে, এভাবে হেসে ওঠা তার পক্ষে একটু অস্বাভাবিক। হাবলুদের সঙ্গে থাকবার সময়েও সে হাসে বটে। কিন্তু হাবলু এ-ধরনের কথা বললে সে হাসত কিনা সন্দেহ। আসলে হাবলু এ-ধরনের কথা বলতই না। বলবার মত কোন কারণ কখনো ঘটে নি, ঘটবেও না। মেয়েটির সঙ্গে মিশে তাই একটা নতুনত্বের স্বাদ অনুভব করতে ভাল লাগে মৃণালের।

পাখী বলে,—তুমি হেসে উঠে আবার থেমে গেলে যে?

—ভাবলাম, হাসিটা বুঝি অন্যায় হচ্ছে।

—কেন? হাসি কখনো অন্যায় হয়?

—কখনো কখনো হয় বৈকি। ধর, কেউ ব্যথা পাচ্ছে দেখে যদি হেসে ওঠো?

পাখী বিস্ময়ে বলে,—তখন হাসব কেন? যে হাসে সে তো পাগল।

—না জেনে, অমন পাগলামী তো করতে পারে কেউ। তোমার মা ঠাকুরঘরে আছেন—পুজো করছেন। হাসি শুনে বিরক্ত হতে পারেন।

—তুমি এতসব ভেবে হাসো নাকি?

—এক এক সময়ে ভাবতে হয়।

—বাব্বাঃ। হাসব, তাতেও এত? অমন হাসি না হাসলেই হয়।

—হ্যাঁ, তাইতো আমি বেশী হাসি না।

—তুমি যেন কেমন কেমন। তুমি যেন খু-ব বড়।

মৃণালের মুখে ছায়াপাত ঘটে পাখীর শেষ কথায়। আশঙ্কার ছায়া—ধরা পড়ে যাবা আশঙ্কা। ধরা পড়ে গেলে পাখী আর তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না। পাখী বুঝে ফেলবে, তার চোদ্দ বছরের মনকে সে অনেক আগে পেছনে ফেলে এসেছে।

ঠাকুরঘর থেকে এতক্ষণে সাড়া পাওয়া যায়। মায়ের সই বলে,—কার সঙ্গে বকবক করছিস রে পাখী।

—এসে দেখোই না। তোমার জন্যেই তো দাঁড়িয়ে রয়েছি। মুখ বুঁজে কি দাঁড়িয়ে থাকা যায়? তাই বকবক করছি।

—উঃ, একটা কথা শুধোলে হাজারটা কথা শোনায়। বল না কে?

—তোমার সই-এর কথা মনে নেই?

—আমার আবার সই কোথায়? যে ছিল সে কবে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।

কোথায় গিয়ে যেন কথাটা বিঁধল মৃণালের। রাস্তায় যেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন গলার স্বরও মিঠে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ বড় কর্কশ। কাকীমার মত

ায়। তেমনি ঝাঁঝালো।

াখী অপ্রস্তুত হয়। সে বুঝতে পারে মৃণালের মনোভাব। বলে,—মায়ের কথায় কিছু মনে করো না। মা তো জানে না, তুমি এসেছ। তাছাড়া মেজাজ ঠিক নই।

-আমি কিছু মনে করিনি। আমার শোনা অভ্যাস আছে।

-অভ্যাস আছে কিনা জানি না। কিন্তু তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারলাম দুঃখ

াকে ওঠে মৃণাল কথাটা শুনে। তার মুখের রেখায় পরিবর্তন ঘটেছিল নিশ্চয়ই। ইলে এতটুকু মেয়ে বুঝে ফেলল কেমন করে! তার মন যে চোদ্দ বছরের ছেলেদের অনেক পরিণত এটা বুঝতে ততটা অসুবিধে হয় না। কারণ তার মুখ গত ছ' বছরে ঘাত-প্রতিঘাতে তেমনি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সাময়িকভাবে অন্যের কথা ার অভিব্যক্তির পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং একজন বালিকা তা ধরে ফেলেছে—এ যেন হা কলঙ্কের। পাখীর প্রখর অনুভূতির তারিফ সে মনে মনে করলেও নিজের ওপর বন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হতে পারে না।

াখী আর একটু কাছে সরে এসে ম্লান হেসে বলে,—বাঘ কখনো এত অল্পে দমে যায়?

াখীর হাসি সত্যিই ম্লান। মৃণালের খুব ভাল লাগে। এভাবে তার মন বুঝতে েউ চেষ্টা করে নি। এ-ও নতুন। এই নতুনত্ব তাকে যতটা বিচলিত করে, পাখীর ার কথা তার শত ভাগের এক ভাগও করে নি। একটা বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে াসেছে বলেই কথাটা অমন বেমানান মনে হয়েছিল তার কাছে। কিন্তু তা শুধু ্সর্তের জন্যে। সে জানে, পাখীর মা যখন বাইরে এসে তাকে দেখবে তখন নিজেই জ্জা পাবে।

খীকে সে বলে,—বাঘ রোগা হলে দমে না বটে, কিন্তু খুব সন্তর্পণে হাঁটে। থমকে কতবার। বাঘ তো আর পাখী নয় যে চোখ বুজে মনের আনন্দে উড়ে

-পাখী বুঝি তাই বেড়ায়?

ওপর দিকে চেয়ে একটু পরে বলে,—ওই দেখ, কিভাবে উড়ে যাচ্ছে পায়রাটা।

-কি করে বুঝলে চোখ বুঁজে রয়েছে?

বারে মৃণাল হেসে ওঠে। কিন্তু সে হাসি ঠিক আগের মত নয়। হাবলুদের সামনে মন হাসে তেমনি।

াই সময় ঠাকুর ঘরের দরজা থেকে পাখীর মা বলে ওঠে,—এত বকবক কার সঙ্গে— াখি?

পাখী সরে দাঁড়িয়ে বলে,—দেখো।

ভ্রূকুঞ্চিত করে পাখীর মা মৃণালকে দেখে। মৃণালের মনে হয় সেদিনের রাস্তার মহিলার সঙ্গে এই মহিলার আকাশ-পাতাল তফাৎ। রাস্তায় মুখখানা ছিল হাসি-ভরা আর আজ সে-মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। কণ্ঠস্বর সেদিন ছিল মিহি, আজ কর্কশ তার ধারণা হয় কাকীমা রাস্তায় বার হলে তার কণ্ঠস্বরও বোধহয় মিঠে হয়ে যাবে। মায়ের নির্বাক চাহনি দেখে পাখীও বিস্মিত হয়। ভাবে, মা চিনতে পারে নি। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—চিনতে পারলে না?

—তুই থাম। চিনেছি। মৃণাল নয়?

মৃণাল বলে,—হ্যাঁ। ক'দিন থেকে আপনার কথা মনে হচ্ছিল। তাই চলে এলাম। পাখীর জন্মদিনে ক্ষীর খেয়ে গিয়েছিলাম, আজও আমার মনে আছে।

—আচ্ছা বসো। পাখী শোন তো এদিকে একটু।

পাখী মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকে যায়। মৃণাল এদিক-ওদিক চেয়ে কোথাও বসবার জায়গা না পেয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে এসে বারান্দায় বসে।

ভেতর থেকে পাখীর মায়ের রুক্ষ অথচ চাপা গলার স্বর ভেসে আসে,—ভেতরে আনলি কেন ওকে হতভাগী?

—কেন? কি হয়েছে?

—কী হয়েছে? ওই অলক্ষণে ছেলেকে কখনো বাড়িতে ডেকে আনতে হয়?

—এসব বলছ কি মা? কত কষ্ট ওর—

—চুপ কর্। বাপ-মা খেকো ছেলে অপয়া ছাড়া কি? আর খেয়েছিল তোরই জন্মদিনে।

—তার মানে আমার দোষ। সেদিন এখানে না এলে ওঁরা বেঁচে যেতেন।

—থাম্ মুখপুড়ী।

—তুমি ভুল করছ মা।

মৃণাল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। ওদের কথাবার্তা এখনি বন্ধ হয়ে যাবে। ওর রান্নাঘরের বাইরে আসবার আগেই বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় পৌঁছতে হবে। সে প্রা ছুটতে থাকে। আমগাছটার মাথা দোল খাচ্ছিল মৃদুমন্দ হাওয়ায়। মৃণাল দেখল অথচ বুঝতে পারল না। আমগাছের হেলানো কাণ্ডও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবারে। কোনমতে তাকে রাস্তায় যেতে হবে।

শেষে রাস্তায় পৌঁছে নিশ্চিন্ত হয়। গতি কমিয়ে দেয় সে। একবার পথে আসতে পারলে সবাই পথের মানুষ। এ-পথে আগেও এসেছে সে। এখন সে অনেকের মধ্যে একজন।

কছুদূর এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ সামনে পাখীকে দেখে সে বিস্মিত হয়। বলে—অন্য দিক দিয়ে রাস্তা আছে বুঝি ?

পাখীর ঠোঁট ফুলে ওঠে কিছু বলতে গিয়ে। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে,—আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসিনি।

—তোমার হাতে এখনো কাদা দেখছি। ধুয়ে ফেলগে। শুকিয়ে উঠেছে।

—আমাকে মায়ের দলে ফেলো না।

—আমি জানি। তুমি খুব ভাল। তোমার মত ভাল মেয়ে আমি দেখিনি পাখী।

পাখীর চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। কাদা হাতের উল্টো দিক দিয়ে মুছে নিয়ে বলে,

—বাঘ বুঝি পালিয়ে যায় ?

মৃণাল প্রশ্নের আকস্মিকতায় প্রথমটা নীরব থাকে। তারপর বলে,—রোগা বাঘ বোধহয় পালায়।

—না। রোগা-মোটা সব বাঘ সমান। পালাতে জানে না। স্বভাব।

মৃণাল কিছু বলতে পারে না। সে হাসে—হাবলুদের সামনে যেমন হাসে।

আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব মৃণালদা।

সম্বোধনটা মন্দ লাগে না। কিন্তু বুকের ভেতরের ঠাণ্ডা ভাব এই সম্বোধনেও গলল না। তবে এবারে সে আগের মত অরক্ষিত নয়। এবারে সে পাখীর কাছে ধরা পড়ে নি।

—কোথায় দেখা করবে ?

—তুমি বলে দাও।

—আমি মাঝে মাঝে রেল লাইনে আসি। কিন্তু তুমি তো তা পারবে না।

—যদি পারি ?

—কখন আসবে তুমি কি করে বুঝব ?

—তুমি বল।

—আমি বিকেলে আসি মাঝে মাঝে। তা কি পারবে ?

—যদি পারি ?

—না আসাই ভাল। আমার এক মাস্টারমশায় বলেন, রেলের চাকা আমাকে সব সময় ডাকছে। তাই লাইনের ধারে ঘোরাফেরা করি। বাবা আর মায়ের মত আমিও যাব চাকার নীচে।

—উঃ, কী সাংঘাতিক।

—হ্যাঁ, তুমি যেও না। ছোটদের যেতে নেই।

পাখী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। দুচোখে তার অশ্রু টল্‌টল্ করে। তারপর হঠাৎ

পাশের বাড়ির মধ্যে ছুটে যায়। মৃণাল সেদিকে তাকিয়ে থাকে। ওই বাড়ির ভেত দিয়ে পাখীদের বাড়িতে যাবার সোজা পথ রয়েছে নিশ্চয়। সে-পথেই ও এসেছিল।

স্কুলের ছুটির ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা বই বগলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কি হারু মাস্টার বসে থাকে চেয়ারে। ছেলেরা বুঝতে পারে না কী করবে। অধৈ হয়ে ওঠে। তারা চেয়ে দেখে অন্য ক্লাসের ছেলেরা বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মত বা হয়ে আসছে। তারা দেখতে পায় পাশের মাঠের প্রথম শীতের সূর্যের রশ্মি এ মধ্যেই কমজোর হয়ে উঠেছে। বাড়ি গিয়ে বই রেখে দুটো মুখে দিয়ে ছুটে আসত আসতে সূর্য লাল হয়ে উঠবে। তারপর উইকেট পুঁতে ব্যাট ধরবার আর স থাকবে না বিশেষ।

হারু মাস্টার এত বেশী ক্লান্তি অনুভব করে যে সমস্ত ক্লাসটা যে তার একটিমাত্র অঙ্গু হেলনের অপেক্ষায় অস্থির হয়ে উঠেছে সেদিকেও খেয়াল থাকে না। এত অবস সে বড় একটা অনুভব করে না। অতীতের সমস্ত বছরগুলো হঠাৎ যেন ষড়যন্ত্র ক তার বয়সের ওপর চেপে বসেছে একসঙ্গে।

পেছনের ছেলেদের একজন বসবার একখানা বেঞ্চির একদিকটা বাঁ হাত দিয়ে তু হাতখানেক উঁচু করে ছেড়ে দেয়। শক্ত মেঝের ওপর সেটি পড়ে প্রচণ্ড শব্দ করে হারু মাস্টার চমক ভেঙে দেখে সবাই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—কি হল তোদের? পায়ে সব পক্ষাঘাত হয়েছে নাকি?

—স্যার—

—পালা। কত যেন সব রামভক্ত হনুমান।

ছেলেরা ছুটতে ছুটতে বার হয়ে যায়। মৃণাল অপেক্ষা করে। হারু মাস্টারের কপা দারিদ্র্যের রেখা ছাড়া অন্য কোনরকম রেখা আগে সে দেখে নি। আজ দেখল।

—তোর আবার কি হল? দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন?

—আপনি বাড়ি যাবেন না?

—সে কৈফিয়ৎ তোকে দিতে হবে? ভাগ্—

মৃণাল ক্লাস ছেড়ে চলে যায়। স্কুলের মাঠে খেলতে আসবার তার তাড়া নেই। মাঠে খেলে না বড় একটা। খেলায় ঝোঁক তার খুবই ছিল। কিন্তু বাড়ি যি খাবার খেতে বড্ড দেরী হয়ে যায়। সেই খাবার খেয়ে মাঠে আসতে আসতে গর কালের সূর্যও প্রায় লাল হয়ে ওঠে। শীতের সূর্য তো ডুবেই যায়। খাবার না খে আসতে পারে না সে। খিদেতে পেট জ্বলে যায়। বীরেশের মত চোটপাট করতে পারে না। নিজের মায়ের ওপর সবাই বোধহয় জুলুম করতে পা

অন্ততঃ হাবলু তো পারেই। সেদিন পাখীদের বাড়ি গিয়ে দেখল সেও তার মাকে রান্নাঘরের ভেতরে দু-চারটে কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ল না। কিন্তু তার পক্ষে অমন করা সম্ভব নয়। তার মা নেই। কাকীমাকে খেতে দিতে বলাও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু গরমকালে দেরীতে ফিরেও খেলার মাঠে যাবার কিছুটা সময় থাকে। কিন্তু যেটুকু খাবার সে খায়, পেটের এক কোণে তা মিলিয়ে যায় অন্ননালী বেয়ে নামতে না নামতেই। তারপর অবসন্ন দেহকে নিয়ে মাঠের ধারে-কাছে যাবার মত মনের অবস্থা থাকে না। অথচ সে ফুটবল খারাপ খেলে না। ওরা বলে, নিয়মিত খেললে সে ম্যাচে নামতে পারে। সে নিজেও জানে, পারে।

হারু মাস্টার বসেই থাকে চেয়ারে। মৃণাল ভাবে মাস্টারের বাড়িতে কাকা-কাকীমার বিভীষিকা নেই তাই বসে রয়েছে। অথচ কাকা-কাকীমা জলজ্যান্ত সত্ত্বেও সে চলেছে বাড়িমুখো। না গেলে, খেতে পাবে না। সকালের টলটলে ডাল আর ভাত প্রথম পিরিয়ডের পরেই হজম হয়ে গিয়েছে। টিফিনের পর থেকে পেটের মধ্যে জ্বালা শুরু হয়। পাকস্থলীর দুদিকের চামড়ার ঘর্ষণে বোধহয় অমন জ্বালা হয়। স্বাস্থ্যের মাস্টার বলেছেন, পাকস্থলী সব সময় খাবো খাবো করে। পেটে কিছু না থাকলে মরিয়া হয়ে নিজেকেই খেতে চায়। মাস্টারমশায় হাসতে হাসতে কথাগুলো বলেন। তিনি কল্পনাও করতে পারেন না, অমন সত্যি কথা তিনি আর একটাও বলেন না।

হারু মাস্টার চেয়ে চেয়ে দেখে, মৃণাল স্কুলের কম্পাউণ্ড ছাড়িয়ে রাস্তার ওপর গিয়ে ওঠে। ছেলেটা বড় ভাল। লক্ষ্মীকে ভালবাসে। লক্ষ্মীর জন্যে প্রাণ দেওয়াকে কিছুই বলে মনে করে না। ছেলেটার বড় কষ্ট। বাঙালী পরিবারে নেহাৎ বড়লোক না হলে কারই বা কষ্ট নেই। অনাহার আর অর্ধাহারের কষ্ট তো অধিকাংশ পরিবারেরই। নইলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন গাড়ি-বাড়ি করবে কীভাবে? অধিকাংশ বাঙালী যদি হারু মাস্টারের মত বোকা না হবে, তাহলে অল্প কয়েকজন অমন ফুলে ফেঁপে উঠে দেশকে ভালবাসার জ্ঞান বিতরণের সুযোগ পাবে কি করে? তারা তাদের মুরগীর মত প্রিয় দেশবাসীকে শান্তিপ্রিয় ও সহনশীল, ত্যাগী ও পরিশ্রমী, কর্মঠ ও কর্তব্যপরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান হবার সদুপদেশ দেবার মওকা পাবে কি করে? হারু মাস্টার সে কথা ভাবে না। দেশ সম্বন্ধে তার মোহ নেই আর। তবু সে অসৎ হতে পারে না। চেষ্টা করেও অন্যায় করতে পারে না। এর জন্য সে দোষ দেয় তার বাবা-মাকে। যুগোপযোগী শিক্ষা না দিয়ে তাকে একটা অপদার্থ বানিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তাঁরা। নাভিশ্বাস ওঠবার সময় শান্তি পেয়ে গেলেন এই ভেবে যে, একমাত্র পুত্রকে সৎশিক্ষা দিয়ে যেতে পারলেন। একবারও কল্পনা করতে

পারলেন না, যে-দেশের স্বপ্ন দেখে তাঁরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, কারাবরণ করেছিলেন, সে-দেশ স্বপ্নের মধ্যেই মিলিয়ে গিয়েছে। সে-দেশ রয়েছে শুধু বঙ্কিমচন্দ্র, ডি-এল রায়, আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা কাহিনী আর গানে। কিন্তু তাঁদের লেখাতেই বা কতটুকু রয়েছে? ওপর তলার মানুষ হয়েও নীচের তলা সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন এবং সহানুভূতি ছিল তাদের প্রতি এইটুকু বলা যেতে পারে। তাই কিছুটা ছবি আঁকতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। সর্বাঙ্গীন ছবি নয়। তবু সেইসব ছবি এই দুর্গন্ধময় আবহাওয়ায়, চোখের সামনে ভেসে উঠবার কোন অর্থ নেই। অথচ ভেসে ওঠে আজও। মনকে বিষণ্ণ করে দিয়ে আবার মিলিয়ে যায়। মেজাজকে তিক্ত করে দিয়ে যায়।

কিন্তু সেকথা নয়। হারু মাস্টার ভাবে মৃণালের কষ্ট অন্য ধরনের। দুঃখদারিদ্র্য মানুষের থাকে। কিন্তু তার মধ্যে ন্যূনতম স্বাধীনতাটুকুও থাকে। সে স্বাধীনতা থেকে আজ এই ছেলেটি বঞ্চিত। শুধু মল্লিকদের আমবাগানের ব্যবধান ও বাড়ির রহস্য গোপন রাখতে পারে না হারু মাস্টারের কাছে। মৃণালের বাবা, অমল বসুকে সে যেমন চিনত, তেমনি চেনে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাপদকে। এ শহরের কাউকে চিনতে তার বাকী নেই। মানুষ আর কয়জন হতে পারে? কিন্তু দুর্গাপদ শুধু অমানুষ নয়—সে হিংস্র পশু। তাই বুদ্ধিমান ওই ছেলেটির লেখাপড়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় নি, অবিরত অত্যাচার করে ওর শিশু-মনটিকে দুমড়ে মুচড়ে ভোঁতা করে দিচ্ছে দিনের পর দিন। আচ্ছা, ছেলেটা মুখ বুঁজে সহ্য করে কেন এসব? প্রতিবাদ করতে পারে না? একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—যা সব কিছু ওলট-পালট করে দেবে। হয়ত পারবে একদিন। এখনও বয়স হয় নি।

হারু মাস্টার তার নস্যির ডিবেটা টেবিলের ওপর ঠক্ ঠক্ করে তারপর সেটিকে পকেটে রেখে বিড়ি বার করে ধরায়। সে টেবিলের ওপর পা দুটো তুলে আরাম করে বসবার উদ্যোগ করে আবার থেমে যায়। তারপর কাপড়টাকে ভালভাবে সামলে নিয়ে পা তুলে দেয়। শেষে খেয়াল হয়, কাপড় না সামলালেও কোন ক্ষতি ছিল না। সামনে ছাত্ররা বসে নেই, বেঞ্চিগুলো শূন্য। ছেলেবেলার একটি স্মৃতি তাকে অযথা ওই সাবধানতা অবলম্বনে প্ররোচনা দেয়। ছাত্রাবস্থায় তাদের সংস্কৃতের মাস্টার হরমোহন পণ্ডিত ক্লাসে এসেই টেবিলের ওপর পা দুখানা তুলে দিয়ে আরাম করে বসতেন। পুরুতগিরি করে পুজোয় পাওয়া কাপড়ও ছিল খাটো। ফলে তিনি বিশ্রীভাবে বসে থাকতেন সারা পিরিয়ড। সংস্কৃতের ক্লাস ছেলেদের কাছে ছিল প্রচণ্ড অস্বস্তিকর। ইস্কুলে মাস্টারী করতে এসে হারু মাস্টার প্রতিজ্ঞা করেছিল, কখনো ওভাবে পা তুলে বসবে না। বসেও নি কখনো। তবে আজ এই ফাঁকা ক্লাসে যা

খুশী করা যায়। কেউ দেখবে না। বিনোদ দরজা বন্ধ করতে এসেও সামনাসামনি দাঁড়াবে না।

বিড়িটা ফেলে দেয় ছুঁড়ে জানলা দিয়ে। বড়ই ক্লান্তি অনুভব করছে সে। ছেলেটা বাঁচবে না তার। স্ত্রী না জানলেও, সে জানতে পেরেছে। স্ত্রীর ধারণা ছেলের রক্তশূন্যতা ওষুধ আর ছাগলের দুধ খাওয়ালে ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে তো তা নয়। এ রক্তশূন্যতা জন্ম থেকেই। রক্তে হিমোগ্লোবিন সৃষ্টি করবার কোন ক্ষমতাই নেই শিশুটির দৈহিক প্রক্রিয়ায়। মাত্র শতকরা বাইশ ভাগ হিমোগ্লোবিন। কলকাতায় গিয়ে মাঝে মাঝে রক্ত দিয়ে আনলে দু-এক বছর বাঁচতে পারে। কিন্তু অত খরচ করবার ক্ষমতা নেই তার। তবু হয়ত নিঃস্ব হয়েও খরচ করত, যদি ডাক্তার আশা দিত শতকরা পনেরো ভাগ রুগীও এতে বাঁচে। কিন্তু ডাক্তার বলেছে অন্য কথা। বলেছে, এ জাতীয় ব্যাধিতে কোন শিশুই তাদের শৈশব অতিক্রম করতে সমর্থ হয় নি। রক্ত দিয়ে বয়স বাড়িয়ে শুধু শুধু মায়া বাড়বে তার ওপর। রজনী ডাক্তার কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন থেকে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে এনে তার ফল জানিয়েছে হারু মাস্টারকে। তবে একেবারে নিরাশ করতে বাধে বলে একটু ছুঁইয়ে রেখে বলেছে, অসম্ভবও সম্ভব হয় কত সময়। হোমিওপ্যাথী তো অমন জবাব দেওয়া রুগীকে ভাল করে বলে শোনা যায়। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করাই ভাল। হারু মাস্টার তাই করছে। ষোল বছর পরে ছেলেটি হল, তবু তার মুখের দিকে চাইতে পারে না হারু মাস্টার রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার পর থেকে। ও মুখের দিকে চেয়ে হৃদয়টাকে খান্ খান্ করে লাভ নেই। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে যে, তার দিকে চাইবার মত মনের বল তার নেই। এমনকি তার স্ত্রী এবং লক্ষ্মী যখন ছেলেটিকে নিয়ে আদর করে, সহ্য করতে না পেরে সে দূরে সরে যায়। বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। ওই শিশুটিকে ঘিরে কত কল্পনা তার মায়ের। সে সব কল্পনার কথা যখন শোনাতে শুরু করে তার স্ত্রী, তখন চেঁচিয়ে ওঠে হারু মাস্টার। চেঁচালে স্ত্রী বরাবর বলে এসেছে, যে ষাঁড়ের মত চেঁচায় সে। ষাঁড়দেরও তাহলে বোধহয় অব্যক্ত কোন ব্যথা রয়েছে। তাই অমন মূক হয়ে থাকে অধিকাংশ সময়। আর যখন মৌনতা ভঙ্গ করে—ওইভাবে চিৎকার করে ভেতরের অসহনীয় জ্বালা বার করে দিয়ে পরিত্রাণ পেতে চায়। স্ত্রী জানে না, কত কিছু চেপে রাখবার জন্যে চিৎকারটা অমন হয়ে ওঠে তার।

বিনোদের নাকের শব্দ শুনতে পায় হারু মাস্টার। নাক দিয়ে সবসময় অমন ফঁস্ ফঁস্ আওয়াজ বার করা স্বভাব বিনোদের। পাশের ক্লাসের দরজা বন্ধ করে সে। তারপর এ-ঘরের সামনে এসে হারু মাস্টারকে দেখে অবাক হয়ে বলে—একি

মাস্টারমশায় ? ক্লাসে বসে আছেন একা একা ? বাড়ি যাবেন না ?

—যাচ্ছিরে বাবা। তোদের জন্যে কোথাও দুদণ্ড শান্তিতে বসবার উপায় পর্যন্ত নেই।

বিনোদ হেসে বলে,—পরিতোষবাবু তো ভাল টিউশনি বাগালেন।

—কাকে ?

—কাসেম মোল্লার ছেলে। সপ্তাহে তিনদিন ষাট টাকা।

—ওকে জন্ম জন্ম ধরে পড়ালেও পাস করবে না। তার চাইতে সামসুদ্দিনকে পড়ালেই পারত। বুদ্ধিমান ছেলে।

—সামুর বাবা তো মাত্র তিরিশ টাকা দিতে চেয়েছিল।

—তিরিশ টাকাই তার পক্ষে বেশী।

—তিরিশ আর ষাটে অনেক ফারাক মাস্টারমশায়।

হারু মাস্টার ইচ্ছে করেই আর কিছু বলে না। বিনোদ বহুদিনের পুরোনো হলেও, অন্য শিক্ষক সম্বন্ধে আলোচনা তার সামনে কথনো করে না হারু মাস্টার। আজ হঠাৎ দু-চার কথা বলে ফেলল। আজ তার মানসিক স্থৈর্য কেন যেন বিপর্যস্ত।

বিনোদ ঘন ঘন নাকের শব্দ করে। দরজা বন্ধ না করে সে যাবে না। টেবিল থেকে পা দুটো নামিয়ে নেয় হারু মাস্টার। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে আসে।

বিনোদ দরজা বন্ধ করতে করতে আপন মনে বলে,—পরিতোষবাবুর সংসার তো সামুর বাবা এসে চালাবে না। কে কাকে দেখে। ভাল মানুষ হয়েছ কি ফেঁসেছ। সামুর পড়াশোনা না হলেই বা কার কি, আর কাসেম মোল্লার ছেলে ডাব্‌বি খেলেই বা কার আসে যায়।

হারু মাস্টার অফিসঘরে এসে আলমারীর মাথার ওপর থেকে বাজারের থলেটা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামে। পাশের মাঠের দিকে চেয়ে দেখে হোস্টেলের ছেলেরা এর মধ্যেই বই রেখে এসে ব্যাট দিয়ে উইকেট ঠুকছে। আরও ছেলে আসছে। ওদের মধ্যে একজনও কি কৃতি খেলোয়াড় হবে ? ঘোরতম সন্দেহ রয়েছে। হারু মাস্টারের আরও সন্দেহ, এত ছেলে পড়াশোনা করছে, তাদের মধ্যে একজনও হয়ত মানুষ হবে না। মানুষই যদি না হল, তাহলে পরবর্তী জীবনে উন্নতির শীর্ষে উঠেই বা কী লাভ ? মানুষ না হলে অপরের মঙ্গল-চিন্তা হৃদয়ে ঠাঁই পাওয়া সম্ভব নয়। শুধু নিজের দিকে দেখো—নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে খুব সাবধানে একটি একটি করে ইট সাজিয়ে প্রাসাদ বানাও। সে প্রাসাদের বাইরে বড় বড় করে টাঙানো থাকবে—"Trespassers will be prosecuted" কিংবা "Beware of

logs.* সে প্রাসাদ শুধু নিজের জন্য। চাকরির ক্ষেত্রে মানুষ এভাবে প্রাসাদ বানায় অন্যান্য সহকর্মীর স্বার্থের হানি ঘটিয়ে। রাজনীতিতে প্রাসাদ গড়ে তুলছে মানুষ, দেশের হিতের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে। যে স্বার্থ সর্বপ্রথম ব্যবসাতে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে শিক্ষাক্ষেত্রে এসে ঢুকে পড়েছে। তাই পরিতোষ আর অন্যান্য মাস্টাররা নিজের নিজের প্রাসাদ বানাচ্ছে। সেই নির্মীয়মাণ প্রাসাদের চেহারা দেখে বিনোদ অবধি তারিফ করছে।

দূর ছাই নিকুচি করেছি। মা একটা কথা বলতেন প্রায়ই—ঘুঁটে কুড়ুনির ছেলে সুলতান খাঁ। তেমনি হল দেখছি। ছেলের নাড়ী দেখে মা টের পেয়েছিলেন হারু মাস্টার সুলতান খাঁ। পয়সার দিক দিয়ে নয়, অন্য কিছুর দিক দিয়ে নয়, শুধু চিন্তার দিক দিয়ে। সে যেন গোটা ভারতবর্ষের একমাত্র হারুণ-অল-রশীদ। নইলে যে-ব্যাপারে কারও মাথা ব্যথা নেই, সেই ব্যাপারগুলো তার মাথায় এভাবে তালগোল পাকাবে কেন? সে স্কুলমাস্টারদের মধ্যে দরিদ্রতম। তার মাথায় এসব চিন্তা আসা পাগলামীর লক্ষণ।

হারু মাস্টার বাজারে ঢোকে। পর পর কয়েকদিন বাজারে আসা হয় নি। আসবার মত আর্থিক অবস্থা ছিল না। শিশুপুত্রের জন্যে ছাগলের দুধ খরচ বাড়িয়েছে। কিছুতেই সামলাতে পারা যায় না। কয়েকদিনের বাজার করতে হবে আজ। ছেলেবেলার কথা মনে আছে, শীতকালে তরিতরকারি খুব খেত সে। অথচ অবস্থা তখনো ভাল ছিল না। এখন শীতের সব্জী বাজারে এসে চোখে দেখে চলে যেতে হয়।

অনেকদিন পর থলে ভর্তি করে বাজার করে হারু মাস্টার। লক্ষ্মীর বড় কষ্ট হয়েছে ক'দিন। মুখ ফুটে কিছু বলবার ক্ষমতা নেই। তবু বুঝতে পারা যায়। শুধু ডাল হলেই সে হাসিমুখে খেতে পারে। ডালও নেই। আজ তেঁতুল পুড়িয়ে তাই দিয়ে খেতে হয়েছে ভাত। লক্ষ্মী টক খেতে পারে না একেবারে। না পারলেও উপায় নেই। ওর মায়ের টক হলে অসুবিধা নেই। কতটুকুই বা ভাত, ভরপেট তো কারও হয় না। পেট ভরে খেতে হলে, শুধু ভাতই হয়—আর কিছু হয় না। ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে দু'একজন ভিখারী এসে করুণ স্বরে বলত—দু'দিন ভাত খাইনি মা। তখন কথাটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হত মাস্টারের কাছে। এখন বুঝতে পারে ওরা সত্যি কথা বলত। ভাত না খেয়ে তখনো কিছু কিছু লোক বেঁচে থাকত। কৃষকদের ঘরেও, অন্নের হাহাকার শোনা যেত, ভাদ্রের পর থেকে নতুন ফসল ওঠবার আগে অবধি। কিন্তু সে হাহাকার সরব হলেও ক্ষণস্থায়ী। এখনকার অন্নকষ্ট তার চেয়ে সহস্র গুণ বেশী। এখন সেটা বাসা বেঁধেছে তারই মত অসংখ্য ভদ্রঘরের ভেতরে।

ভদ্র কথাটা এক অদ্ভুত আবিষ্কার। শুধু এই কথাটা মানুষের কত অধিকার নীরবে ছিনিয়ে নেয়। কতকগুলো মিথ্যে শালীনতাবোধ, কতকগুলো ভুয়ো দায়িত্ববোধ আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে এই কথার যাদুস্পর্শে। এই কথাটা চালু করার পেছনে এক বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে। যা নিম্ন মধ্যবিত্তকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। মানুষ চেঁচিয়ে বলতে পারে না খিদে পেয়েছে। মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না যে কোন পেশায়। কবে এই কথাটার অবলুপ্তি ঘটবে "নবান্ন" কথাটার মত কেউ জানে না। নবান্ন কথাটা এখন লেখকরা বই-এ ব্যবহার করাও ছেড়ে দিয়েছে। কারণ সেকালের মত এখন আর আমন ধান চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সংসারকে হাতছানি দেয় না। তাই 'নবান্ন' কথাটা মৃত শব্দের যাদুঘরে শোভা বাড়াচ্ছে।

বাজারে বড় দেখে একটা লাউ কেনে হারু মাস্টার। থলেটা ডান হাতে নিয়ে বাঁ-হাতে লাউ ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে ফেরে। দেহ ক্লান্ত, মন বিমর্ষ। তবু লক্ষ্মীর কথা ভেবে একটু উদ্যম পায় সে। এতসব জিনিস দেখে লক্ষ্মীর মুখে হাসি ফুটবে। ওর মুখে হাসি দেখলে সব কষ্ট কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়।

বাড়ির কাছাকাছি একটা খোলা মাঠ। সেই মাঠের ভেতর দিয়ে পায়ে চলার পথ। এই পথে মাস্টারের বাড়ি তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যায়। মাঠের মাঝামাঝি জায়গায় একটা পুরুষ তালগাছ। জীবনে তাল হয় নি। সেখানে এসে মাস্টার থেমে যায়। সামনে ক্ষেপা ঘোষ পড়ে রয়েছে।

—এই ক্ষেপা। ওঠ হতভাগা।

—না, না গো না. করোনা ভাবনা।

যদি বা নিশি যায়, আমি যাবোনা যাবোনা।

—দেখেছ? আবার গোঁ গোঁ করে গান হচ্ছে।

—গান? না। কেউ গান গায় না। কেউ শুনতে চায় না।

—মাতালের গান কেউ শোনে না। ওঠ্।

—উঠব? কে উঠবে? ক্ষেপা ঘোষ? সে তো নেই। তার দেহ পড়ে আছে। এ শুধু তার দেহ। আত্মা গিয়ে মিশেছে—ওইখানে।

এই তো দেহ পড়ে আছে।
যার যাবার সে চলে গেছে,
এই তো দেহ পড়ে আছে।

হারু মাস্টার মুখ খিঁচিয়ে বলে,—নাও। এখন ঠেলা সামলাও।

সে একটু অপেক্ষা করে। নিজের দুই হাতের দিকে চায়। জিনিসগুলো বাড়িতে রেখে এসে ক্ষেপা ঘোষকে তোলা যেতে পারে। এভাবে পথের মধ্যে একজন মানুষ

াড়ে থাকবে, ভাবতে মনের ভেতরে খচ্‌খচ্‌ করে। বড় ভাল লোক ক্ষেপা ঘোষ। উটিও ভাল। তারই প্রতিবেশী বলতে গেলে।

ক্ষেপা ঘাসের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে অস্পষ্টভাবে বলে,—তোর শ্যামল বরণ কেমন যেন কালো হয়ে আসছে। তাই বলে ময়নার মত কালশিরা পড়ছে না তোর চোখের কোলে। সূর্য ডুবছে কিনা তাই অমন দেখাচ্ছে, নইলে তুই চিরযৌবনা। কবে থেকে দেখছি তোকে। এতটুকুও বাড়লি না—ঠিক তেমনিই। তোর যৌবনের বুঝি হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। এই যে তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে—এরও বয়স তুই জানিস। ও তোর হাঁটুর বয়সী কিনা সন্দেহ। অথচ ও কত বেড়ে গেল। ওর তাল হয় না। সবাই বলে পুরুষ। ধুস্‌ তাই কখনো হয়? ও পুরুষ হলে ময়নাও পুরুষ। আসলে ও বাঁজা। ময়নার মত ওরও জীবন নিষ্ফলা।

হারু মাস্টার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। কেন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে যায়। দু-চারপা যেতেই দেখে প্রিন্সিপ্যালের ছেলে কেষ্ট তার বাড়ির দিক থেকেই আসছে।

—তুমি।

আমি একটু সটকাট করলাম মাস্টারমশায়। নদীর ধারে গিয়েছিলাম।

এ রাস্তা সটকাট?

কেষ্ট বিগলিত হেসে বলে,—মানে রাস্তা দিয়ে তো রোজই চলি। আজ একটু বে-রাস্তায় চলতে ইচ্ছে হল। আপনার বাজারের ব্যাগটা আমার হাতে দিন মাস্টারমশায়। আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে।

—না। আমার কষ্ট হচ্ছে না। বরং যদি পার ক্ষেপা ঘোষকে তুলে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দাও।

—ওই মাতালটাকে? কী যে বলেন মাস্টারমশায়। ও তো রাস্তাঘাটে পড়ে থাকতেই ভালবাসে। আপনার লাউটা কত নিল। সুন্দর কচি লাউ তো।

—পঞ্চাশ পয়সা।

—দিন আপনার ব্যাগটা।

—না থাক।

—না না, তা হয় না। এটুকু আমি পৌঁছে দেবই। কপালে লেখাপড়া নেই বলে হল না। তাই বলে গুরুজনদের মানব না—এ হতেই পারে না।

কেষ্ট জোর করে হারু মাস্টারের হাতের ব্যাগ টেনে নেয়। মাস্টার ওর গায়ে অদ্ভুত ধরনের গন্ধ পায়। বিড়ি-সিগারেট তো বটেই—তাছাড়া আরও যেন কি। কুঁচকে যাওয়া নাককে সোজা করে ফেলে তাড়াতাড়ি। পৃথিবীতে বাস করে কতকগুলো

সার কথা শিখে ফেলেছে মাস্টার। কথাগুলো খুঁজলে জগতের সব ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যাবে, তবু মর্ম দিয়ে বুঝতে চায় না কেউ। সেইসব কথার একটি হল মানুষকে ঘৃণা করতে নেই। কারণ মানুষ কখনো খারাপ স্বভাব নিয়ে জন্মায় না। সে পরে খারাপ হয়। এই খারাপ হবার জন্যে দায়ী তার পরিবেশ এবং তার দুর্বলচিত্ততা। কেষ্ট খারাপ সে জানে। কিন্তু তার খারাপ হবার পেছনে কত কিছু হয়ত কাজ করেছে। তেমন অবস্থায় পড়লে হারু মাস্টার নিজেও খারাপ না হয়ে পারত না।

বাড়ির উঠোনে লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে ছিল। সে কেষ্টকে দেখে অবাক হয়। একটু আগেই কিছুক্ষণ ধরে ওকে বাড়ির দরজার সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে! নিশ্চয় বাবার সঙ্গে খুব বেশী পরিচয়। নইলে বাবার বাজারের ব্যাগ বয়ে আনবে কেন? সে ছুটে গিয়ে কেষ্টর হাত থেকে সেটি নিয়ে মাস্টারের হাতের লাউ-এর দিকে চায়।

—আচ্ছা কেষ্ট, এবার এসো। এটুকু বয়ে আনবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

—এতেই অনেকখানি আনন্দ পেলাম মাস্টারমশায়।

কেষ্ট আড়চোখে লক্ষ্মীকে দেখছিল। লক্ষ্মীর মুখে হাসি ধরে না। সে ছেলেমানুষের মত বারান্দায় বসে ব্যাগ থেকে একটি একটি করে জিনিস বার করে নীচে নামাচ্ছিল আর অবাক হচ্ছিল। বাবা আজ কত জিনিস এনেছে—সীমা-সংখ্যা নেই। সে বারবার বাবার দিকে চাইছিল। সেই চাহনিতে কৃতজ্ঞতা—সেই চাহনিতে মমতা।

হারু মাস্টারের মুখেও হাসি ফুটে ওঠে।

—চলি মাস্টারমশায়।

—এসো।

কেষ্ট বিদায় নেবার একটু পরে মাস্টারও মাঠের দিকে যায়। ক্ষেপাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে বাড়িতে।

নামেই পুতলীর বেড়াল। আসলে ঘটি ডোবে না। অর্থাৎ বেড়ালটির ওঠা-বস শোয়া সবকিছু মৃণালেরই ঘরে। বাচ্চা বয়সে অবশ্য মৃণালই ওকে মল্লিকদের আমবাগান থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। বাচ্চাটা এবং আরও তিন ভাইবোন আর ওদের গর্ভধারিণীকে কোন্ বাড়ি থেকে যেন বস্তায় ভরে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল আমবাগানে মৃণাল সবচাইতে নধরকান্তি বাচ্চাটিকে বেছে এনেছিল তাদের মধ্যে থেকে। কাকীমা জানতে পারে নি। সে বাচ্চাটাকে গোপনে এনে পুতলীর সামনে ছেড়ে দিয়েছিল কাকীমা দেখে চমকে উঠেছিল। বেড়াল থেকে ডিপথেরিয়া হয়। সুতরাং নিশ্চয়ই কোন মহাশত্রুর এই কাজ।

এত বিস্ফোরণ সত্ত্বেও কি করে যেন বাচ্চাটা টিঁকে গেল বাড়িতে। পুতলীর বেড়াল

হল সে। মোটা-সোটা দেখে সন্দেহ রইল না যে হুলো। তাই নাম রাখা হল 'খোকা"। কিন্তু বছর ঘুরে দু পাঁচ মাস যেতে না যেতেই কাকীমা একদিন নাক সিঁটকে কাকাকে বলল,—হুলো না ছাই। এখন গাদা গাদা বাচ্চা হোক।

কাকীমার কথা শুনে সবাই থ হয়ে গিয়েছিল। তাই কখনো হয়? অমন ছেলের মত দেখতে একটা জিনিস খামোখা মেয়ে হয়ে যাবে? কাকা অবধি বিশ্বাস করে নি। তারপর একদিন বাড়ির প্রাচীরের ওপর একটা বিরাটকায় কালো হুলো বেড়ালকে গম্ভীর এবং আকুল স্বরে ডাকতে দেখে, আর সেই সঙ্গে খোকার মতিগতি লক্ষ্য করে কাকা গদগদভাবে হেসে কাকীমাকে বলল,—হ্যাগো, তুমি তো ঠিকই ধরেছ। ওটা মেয়ে

কাকীমা সবজান্তার ভাব দেখিয়ে বলে,—আমরা এক নজরেই বুঝি।

কাকা হতাশ হয়ে বলে,—তোমাদের ব্যাপার, তোমরাই তো বুঝবে।

হুলো বেড়াল হঠাৎ মেয়ে হয়ে গেল, কিন্তু নামটা খোকাই থেকে গেল। টিটু কয়েকদিন খুকী বলে ডাকতে চেষ্টা করেছিল। খোকা ফিরেও তাকায় নি।

এর কতদিন পরে ঠিক জানা নেই কাকীমা একদিন খড়ি-ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে কাকার দিকে মুখ উঁচিয়ে বলল,—এবারে আঁতুর ঘর ঠিক কর।

কাকা ইঁদারা থেকে জল তুলে বালতি সমেত মাথায় ঢালতে গিয়ে থেমে যায়। দুই হাত উর্ধ্ব-বাহু হয়ে আঁৎকে ওঠে—এ্যাঁ? কী বললে?

—আঁতুড় ঘর।

মৃণাল তার ঘরের একমাত্র জানলার কাছে সরে এসে কথাটা শোনে। সে কাকার হতভম্ব ভাব লক্ষ্য করে।

—কার? বলনি তো? মানে বুঝতে পারিনি তো?

—মরণ। বলছি, তোমার খোকার আঁতুর ঘর।

—ওঃ।

কাকা পানখাওয়া কালো দাঁতগুলো বিকশিত করে বালতির জল মাথায় ঢালে শীতের মধ্যে।

—এতই নিশ্চিন্ত? কোথায় বাচ্চাগুলো হবে শুনি?

—কেন? ওর আস্তানায়—মৃণালের ঘরে?

—তারপর? বাচ্চাগুলোর কি বিধি-ব্যবস্থা করবে?

—সবাই যা করে। সবসুদ্ধ বস্তায় ভরে নদীর ওপারে।

—পুতলী কাঁদবে না?

—ও কথা আর আমাকে শুনিও না। মা-বাপ মরলে কত কাঁদে তা তো দেখেছি।

এ তো সামান্য বেড়াল।

মৃণাল জানলার কাছ থেকে সরে আসে। বাবা-মা মরলে সে সত্যিই কাঁদে নি। সে কাঁদতে জানে না বোধহয়। নইলে কত সামান্য ব্যাপারে লোকে চোখের জল ফেলে অথচ পিতা-মাতার মৃত্যুর মতো শোকবহ ঘটনায় তার চোখ শুকনো ছিল। কেন ছিল, আজও সে জানে না। শুধু মাঝে মাঝে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে আছে একবার গার্ডসাহেবের গাড়িতে, আর একবার হাসপাতালে। কাঁদতে পারলে অমন ঘুম হতো না তার। কাঁদতে জানলে মা-বাবা না-ও মরতে পারত তার। স্টীম ইঞ্জিনের অমন হুড়মুড়-করা শব্দ ঠিক শুনতে পেত। শুনতে পায় নি, কপালে মরণ লেখা ছিল বলে। শুনতে পায় নি, বাবা তাকে কাঁদতে শেখায় নি বলে। ব্যথা লাগলে কাঁদতে নেই, কেউ হাত থেকে কিছু কেড়ে নিলে কাঁদতে নেই। কথায় কথায় কাঁদে যারা ভীতু। এমন আরও অনেক কথা বাবা বলত মনে আছে।

হারু মাস্টারও অমন কথা বলে। মাস্টার বলে ভারতবাসীর মজ্জায় মজ্জায় ক্রন্দন মেশানো রয়েছে বলে, মাত্র সতেরোজন অশ্বারোহী লক্ষ্মণসেনকে নবদ্বীপ ছাড়া করেছিল। এই কান্না তাদের শেখানো হয়েছিল যুগ যুগ ধরে অতি সযত্নে। কারণ একবার কাঁদতে শিখলে শক্তি হবে অন্তর্হিত। তখন মজাসে রাজত্ব কর—লুটপাট কর। কথায় কথায় কান্না পায় বলে, ভারতবাসীর কচ্‌কচানি কথা শুধু। নিজের বুকে আঙুল ঠুকে মাস্টার একটু হেসে বলে—এই যেমন আমার। চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে না ওঠবার মস্ত দাওয়াই হল চোপা। শান্তিপুরের চোপা বিখ্যাত বলে, সেটা বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। চোপার উল্টোদিকে কান্না—হেড আর টেল। শ্রীচৈতন্য দার্শনিক বৈয়াকরণ প্রভৃতিদের চোপা বন্ধ করে দিতেই নদে গেল ভেসে। হেড না হয়ে টেল। শাক্ত গেল, বৈষ্ণব এল। কিন্তু যে শ্রেণীর মজা লুটবার তারা লুটেই চলল। আজও লুটছে।

হারু মাস্টারের সব কথার অর্থ বুঝুক আর না বুঝুক মৃণাল জানে মাস্টার তাকে অজ্ঞাতসারে সমর্থন করে। কারণ সে কাঁদতে জানে না। কিন্তু কাকার কথা শুনে মনে দ্বিধা জাগে তার। পুত্‌লীর খোকাকে সত্যিই যদি বাচ্চাসমেত ওপারে ছেড়ে দেওয়া হয়, পুত্‌লী কাঁদতে বাধ্য। তবে সে কান্না বেশীদিন চলবে না নিশ্চয়ই কাঁদতে কাঁদতে পুত্‌লীর রোগা হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। খাওয়া বন্ধ করবার সম্ভাবনাও অতি ক্ষীণ। খোকার যে বাচ্চা হবে, একথা মৃণালও জানত। পেট মোটা হলে বাচ্চাই হয়। খেয়ে দেয়ে এক ধরনের পেট মোটা হয়—বাচ্চা হলে আর এক ধরনের। পুত্‌লী হবার সময় কাকীমার অমন হয়েছিল। দশজনের ভাত একা খেলেও অমন হয় না। তারপর পুত্‌লী হতেই কাকীমা আবার স্বাভাবিক হল।

টুটু তখন অনেক ছোট। সে মাকে একদিন একটি প্রশ্ন করেছিল। প্রশ্নের জবাব পাল শুনতে পেয়েছিল।
টুটু প্রশ্ন করেছিল—পেট কেটে ভাইকে বার করলে মা?
—হ্যাঁ।
—ব্যথা লেগেছে?
—খু—ব। কি রকম কাঁদছিলাম দেখিসনি?
—কোথায় কেটেছে দেখি?
—না। ওসব দেখতে নেই। দেখলে আবার পেট কাটতে হবে।
কাকীমা তখন খুব দুর্বল ছিল বলে একটু দূরে মৃণালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও মুখ ঝামটা দেয় নি।
—ভাইটা খুব দুষ্টু তাই না মা?
—হ্যাঁ। এটা ভাই না, বোন।
এর কিছুদিন পরে টিটু বলল, মায়ের পেটের কাটা দাগ সে দেখেছে। কালো মত দাগ—জোড়া লেগে গিয়েছে। তখন বীজেশের সঙ্গে সঙ্গে মৃণালও অবাক হয়েছিল।

পুতলীর খোকা প্রতিটি রাত্রে ঠিক একই ভাবে আসে মৃণালের ঘরে। প্রথমে বাইরে থেকে খোলা জানলাটার ওপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ভেতরে পাঠরত মৃণালকে নিরীক্ষণ করে। ঘরে ঢোকবার অনুমতির অপেক্ষা। মৃণাল যতক্ষণ না তার চোখের দিকে দৃষ্টি ফেলে ততক্ষণ এইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে মৃণালকে চাইতে হয়। খোকা তখন অন্তরের অন্তস্থল থেকে একবার 'মিউ' বলে ডাকে। ভাবখানা যেন, পুতলী যতই আদর করুক তুমিই যে আমার সুখের মূলে একথা আমি ভুলিনি। আমবাগান থেকে তুমিই আমায় তুলে এনেছিলে। বেড়ালের যত অখ্যাতি থাকুক, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল একথা কখনো ভুলব না। এখনো তাই রাতে তোমার পায়ের কাছে পড়ে থেকে শান্তি পাই।
খোকা জানলায় দাঁড়িয়ে মিউ বলে ডেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর তক্তাপোষের কাছে এসে তার উচ্চতা রোজই একবার চোখ দিয়ে মেপে না নিয়ে ওপরে ওঠে না। শেষে ওপরে উঠে মৃণালের বিছানা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে দুপায়ে ডিঙিয়ে তার পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের শোবার জায়গাটি একবার শুঁকে বসে পড়ে। কয়েকবার হাই ওঠে তার। দেখলে মনে হয় সারাদিন কাজের অন্ত ছিল না। হাই বন্ধ হলে জিভ দিয়ে আপাদ-গ্রীবা চেটে পরিষ্কার করে যাচাই করে নেয় তার পোড়া-দেহের

জন্য বিছানা অপরিচ্ছন্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছি কি না। নিঃসন্দেহ হয়ে তে
শোয়।

কোন কোন দিন খোকা ঘরে আসবার আগেই মৃণাল শুয়ে পড়ে। সেদিন জানলা
দাঁড়িয়ে সে মৃণালের কটাক্ষপাতের জন্য অপেক্ষা করে না। সে জানে নিদ্রিত
মানুষকে বিরক্ত করতে নেই। তবু একটা অতি মিহি স্বরে ডাকে সে। ভাবখান
হলো, যদি জেগে থাকো তো তোমায় জানাই, আমি আসছি। তারপর মৃণালের গ
বাঁচিয়ে নির্দিষ্ট স্থানটিতে যায়।

সেদিনও খোকা এল। কিন্তু এসে জানলায় দাঁড়ালো না। সোজা তক্তাপোষে
ওপর মৃণাল যেখানে বসে পরীক্ষার পড়া করছিল সেখানে এসে তার কোলের ওপ
দু পা তুলে দিয়ে মুখের কাছে মুখ এনে একবার করুণ স্বরে ডাকে। বাঁ হাতে তা
পেট ধরে সরিয়ে দিতে গিয়ে মৃণাল চমকে ওঠে। পেটের ভেতরটা বেশ শক্ত ইঁটে
মত। খোকা ওর হাতের স্পর্শে আর্তনাদ করে ওঠে—যেন ব্যথা লেগেছে। পড়াশোন
হয় না। সে দেখল, খোকা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। বারবার বিছানায়
মৃণালের শোবার জায়গায় যায়, আবার ফিরে আসে মৃণালের কাছে। কিছুতেই নিজের
জায়গায় গিয়ে স্থির হয়ে বসে না।

—কিরে, তোর কী হল?

—ম্যা—ও, ম্যা—অ্যা—ও।

—বাচ্চা হবে নাকি রে?

—ম্যা—এঁ্যা—এ্যা—ও।

মৃণাল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। তক্তাপোষের নীচে কতকগুলো চট ছিল। সেগুলো
টেনে নিয়ে ঘরের এক কোণে মেঝেতে পেতে দিতেই খোকা ছুটে এসে তার ওপর
দাঁড়িয়ে শুঁকতে থাকে। দু'জনাই সমান উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একটা নতুন কিছু
ঘটতে চলেছে যে সম্বন্ধে দু'জনার কারও কোন রকম পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই। তাই
একাত্ম হয়ে দুজনা নতুন সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তের সব আয়োজন করে রাখতে চায়। ওরা
জানে না কী ঘটবে—কখন ঘটবে। তবে একটা কিছু ঘটবেই। নইলে খোকা এত
অস্থির হত না। মৃণালকে যে কখনো বিরক্ত করে না, আজ সে বিরক্ত করছে
নিঃসঙ্কোচে। আজ সে বলতে চেয়েছে, তোমার ওপর আমার দাবী রয়েছে বলেই
তোমার কাছে আমি বিপদের মুহূর্তে অনাবৃত।

এইভাবে আরও কিছুক্ষণ কেটে যায়। ঘরের কম-জোর বাল্‌বটি শুধু ওদের সহায়।
সে তার কাজ নিঃশব্দে করে যাচ্ছে। নইলে আর কেউ জানে না, কেউ খবর রাখে
না খোকা তার জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছে। কাল থেকে সে হয়ত

আজকের এই মুহূর্তের খোকা আর থাকবে না। কাল থেকে তার দায়িত্ব হবে অসীম—সে হবে নিঃস্বার্থ। তার বুকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগুলি এক অপার্থিব স্নেহমমতার রসে ভরপুর হয়ে উঠে তাকে ভারী করে তুলবে।

সহসা মৃণাল দেখতে পায়, খোকার চোখ দুটো কেমন অসহায় হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার নজরে পড়ে খোকার লেজের নীচে আর একটি ছোট্ট লেজ। মৃণাল রীতিমত বিস্মিত হয়। এই ধরনের একটা কিছু হয় জানা থাকলেও, সে দেখে নি কখনো। আজ পর্যবেক্ষণ করে।

খোকা চটের ওপর বসে পড়ে। পরক্ষণেই সে ঘুরে কী যেন চাটতে থাকে। মৃণাল দেখতে পায় একটা ছোট্ট সাদা-কালো মেশানো বাচ্চা। খোকা একাগ্র মনে তার পিছল গা চেটে চেটে পরিষ্কার করে।

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে তিনটে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর খোকা নিশ্চিন্ত হয়ে সেগুলোকে কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে পড়ে। মৃণাল দেখে বাচ্চাগুলোর গায়ের লোম বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে খোকার দেহের উত্তাপে আর জিভের ঘর্ষণে?

বিছানায় উঠে বসে মৃণাল। পড়াশোনা আজ রাতের মত বন্ধ। শুয়ে পড়তে হবে। নীচে চটের ওপর খোকা ঘুমোচ্ছে। তার কোলের কাছে নবজাত সন্তানদের সাদা-কালো মিলে মিশে একাকার। খোকার দেহের পাশে তাদের দেহগুলোকে পৃথকভাবে চেনা যায় না। খোকা নিশ্চিন্ত। সে জানে মৃণাল জেগে রয়েছে। সে আর কিছু জানে না। সুদূর ভবিষ্যতের কথা দূরে থাকুক, অদূর ভবিষ্যতেও যে তাকে বাচ্চা-সমেত বস্তা-বন্দী করে নদীর ওপারে ফেলে আসা যেতে পারে একথা কল্পনা করার মত শক্তি তার নেই। শক্তি থাকলেও, অতটা ক্ষুদ্র মন তার নয়। তাই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। মৃণালের পায়ের কাছে এতদিনের শয্যা সে ত্যাগ করেছে, তার জন্যে কিছুমাত্র পরিতাপও মনে স্থান পেয়েছে বলে মনে হয় না। আজ সে ভরপুর।

পরীক্ষায় প্রথম হয় মৃণাল। সে নিজেও ভাবতে পারে নি এতটা ভাল হবে। গতবার তৃতীয় হয়েছিল। অন্য ছেলেদের সঙ্গে সেও অষ্টম শ্রেণীতে যায়। একটি বছর ধরে এই নতুন ঘরে আসতে হবে প্রতিদিন। আজ নতুন নতুন লাগছে—এক বছরে পুরোনো হয়ে যাবে। দেয়ালে সুন্দর হাতের লেখায় টাঙানো হয়েছে:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

কথাটা সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আগেও দেখেছে, কিন্তু তখন এটির ওপর যেন

অধিকার ছিল না। আজ ওই ব্ল্যাকবোর্ড, ওই লেখা সবই তাদের। তেমনি সপ্তম শ্রেণীর যা কিছু এতদিন তাদের ছিল, সেগুলি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নতুন ছেলেরা এসে দখল করে নিয়েছে।

সপ্তম শ্রেণীর সব কিছুর সঙ্গে যেন একটা আত্মীয়তা জন্মে গিয়েছিল। সেগুলোর জন্যে মনের ভেতরে দুঃখের স্পর্শ অনুভব করে, তবু আসতে হল নতুন ঘরে। হারু মাস্টার বলে,—এগিয়ে যেতে হলে পুরোনো জিনিসকে আঁকড়ে ধরে রাখলে চলে না পুরাতনের প্রতি অবহেলা ভাল নয়। কারণ সেই অবহেলা এগিয়ে চলার, পথকে করে তোলে দুর্গম। পুরোনোর প্রতি মমত্ব বোধ মনকে বরং একটু পীড়া দিক তাও ভাল কিন্তু তার জন্যে চলার গতি যেন মন্থর না হয়।

মৃণাল হারু মাস্টারের কথা কয়টি ভাবছিল একটি বেঞ্চিতে বসে। হাতে তার স্কুল ম্যাগাজিন ও নতুন বইয়ের তালিকা। তালিকার বইগুলো একটাও সে কিনতে পারবে না। যোগাড় করবে কিছু। বাকীগুলো চেয়ে-চিন্তেই পড়তে হবে।

হাবলু তার হাতের ওপর হাত রেখে বলে—কী ভাবছিস এত ?

—কিছু না।

—না আবার। নূতন ক্লাসে বসে মুখ গম্ভীর করে আছিস।

—তুই থার্ড হয়েছিস বলে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। হঠাৎ খুব উন্নতি করে ফেলেছিস।

—তোর সঙ্গে থেকে থেকে। এবারে মা আর আপত্তি করতে পারবে না।

—কিসের আপত্তি ?

—আমি জানতাম, তোর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করি, মা ঠিক তা চায় না। মুখে আমাকে কিছু বলতে সাহস না পেলেও, বুঝি।

কথাটা মৃণালের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। এতদিন হাবলু একটি কথাও বলে নি এ সম্বন্ধে তার মত ছেলেও তাহলে চেপে রাখতে পারে।

—তুই প্রমোশন পেয়ে কোথায় গিয়েছিলিরে হাবলু ?

—বাবা দাঁড়িয়ে ছিল। দেখা করে এলাম। এই দেখ।

হাবলু একটা সুন্দর পেন দেখায়।

—তোর বাবা দিলেন ?

—হ্যাঁ, পাস করেছি বলে। থার্ড হয়েছি শুনে বাবা থ। বলেছে, আর একটা জিনি দেবে। সবার বাড়ি থেকেই এসেছে কেউ না কেউ। তোর কাকাও তো এসেছে দেখা হয় নি তোর সঙ্গে ?

মৃণাল বিস্মিত হয়ে বলে,—কাকা এসেছিল ?

—হ্যাঁ। হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকতে দেখলাম। বীজেশের জন্যে সুপারিশ করতে নিশ্চয়।

বীজেশ পাশ করতে পারে নি। পাশ করতে হলে যতটুকু পড়াশোনার প্রয়োজন বীজেশ তা করে না। তবু কাকা এসেছে। সবারই অভিভাবক এসেছে বলতে গেলে আজ—এক এক জন এক এক ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে। কেউ জানতে এসেছে ছেলে পাস করল কিনা। পাস করেছে শুনলে তাদের আনন্দের সীমা থাকবে না। কেউ আবার এসেছে, ছেলে স্ট্যাণ্ড করল কিনা দেখতে। হাবলুর বাবাও এসেছিল পকেটে নতুন কলমটি নিয়ে। হাবলু পাস করুক, এই তার আশা ছিল। আশাতীত ফল জেনে বাড়ি ফিরল হাবলুর বাবা।

সবার কেউ না কেউ এসেছে। কিন্তু তার কেউ আসে নি। তার বাবা বেঁচে থাকলে আসত। বাবার মুখেও আজ হাসি ফুটত। তবে হাবলুর বাবার মত কলম দিত না নিশ্চয়ই আনন্দে আটখানা হয়ে হাবলুর বাবা ছেলেকে কাঁদতে মানা করে না। অথচ তার বাবা কান্না পছন্দ করত না। তাই মনে হয়, আজকের দিনে সে ফার্স্ট হয়ে নতুন ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছে দেখেও, তার বাবাও তাকে জড়িয়ে ধরত না কখনো। অধিকন্তু হাবলুর মত সে যদি হাত পা তুলে নাচ শুরু করত তাহলে বাবার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠত। নিশ্চয়ই বলত—অত আনন্দ করবার মত কিছু হয় নি। এটা হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা নয়। ছোট শহরের একটা স্কুলে ফার্স্ট হওয়াকে অতটা গুরুত্ব দিলে নিজেকেই ঠকতে হবে।

বাবার কথাগুলো মৃণাল যেন স্পষ্ট শুনতে পায়। অথচ তাকে বই বগলে নিয়ে স্কুলে যেতে দেখবার সৌভাগ্য বাবার হয় নি। তবু যেন প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি আনন্দ আর দুঃখের মুহূর্তে বাবার নির্দেশ এবং মনোভাব সে জানতে পারে। ফলে আনন্দ আর দুঃখ কোনটাই বাঁধ ভাঙতে পারে না।

তবে তাকে ফার্স্ট হতে দেখে বাবার মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, আর সেই হাসিটুকুর মূল্য অসীম। হাবলুর বাবার কলম উৎসর্গের চেয়েও অপরিমেয়। শেষ দিনে বাবার একটি ছোট্ট কথায় তার বুক কতখানি ভরে উঠেছিল আজও মনে পড়ে। হোঁচট খেয়ে নখের কণা উঠে গেলে সে কাঁদে নি। বাবা তাকে কোলে তুলে নিয়েছিল। হয়ত কখনো আর সেই সুযোগ হবে না বলে বাবার মতিভ্রম ঘটেছিল, কিন্তু সেটাও তুচ্ছ। পুত্রের শুক্‌নো চোখের দিকে চেয়ে বাবা মাকে বলেছিল—ওভাবে নখের কোণা উঠে গেলে আমারও চোখে জল আসত। কথা কয়টি সান্ত্বনা আর গর্বের কারণ হয়েছিল। হাবলুর বাবার শত সহস্র ব্যাকুলতাতেও কি তা হতে পারবে কোনকালে?

—তুই যাইরি আজ সত্যিই অন্যমনস্ক মৃণাল। আমি বুঝতে পেরেছি, কেন তুই ধন্ধ ধরে বসে আছিস্।

কেন ?

—বাড়ি গেলে কি হবে ভাবছিস তো ? তুই এদিকে ফার্স্ট, ওদিকে আর একজন তো ডাব্বিয়েছে।

কথাটা আগে মনেও আসে নি মৃণালের। হাবলু ঠিক বলেছে। বাড়ি ফেরা আজ একটা সমস্যা বটে। সে তাড়াতাড়ি বেঞ্চি ছেড়ে ওঠে।

—কোথায় চললি ?

—একটু আসি।

—স্যাররা যে জ্ঞান দিতে আসবে ?

—আসছি।

মৃণাল অফিস ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। হেডমাস্টারের ঘরে উঁকি দিতে সাহস হয় না। কাকার চোখে চোখ পড়ে যেতে পারে। হেডমাস্টারের সামনে কাকার হাত কচলানো মূর্তির কথা সে জানতে পেরেছে জানলে, মেরে বাড়ি থেকে বিদায় করে দেবে।

বারান্দায় আলমারীর পেছন দিকে অতি পরিচিত নাকের শব্দ শুনতে পেয়ে সে এগিয়ে যায়। আলমারীর আর দেয়ালের মাঝে সামান্য ফাঁক রয়েছে। সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে বিনোদ গাঁজায় দম দিচ্ছিল। মৃণালকে মাথা বাড়াতে দেখে সে রীতিমত চমকে ওঠে।

—তুই ! এখানে এলি কেন ?

—আমার কাকা হেডমাস্টারের ঘরে আছে ?

—কখন চলে গিয়েছে।

—রাজেশের কি হল ?

—হেডমাস্টার এবার বেজায় কড়া। হবে না বলে দিয়েছে।

মৃণাল পেছন ফিরতেই বিনোদ ডাকে—এই শোন্।

—বল।

—আমি এখানে আছি, কি করে বুঝলি ?

মৃণাল একটু হেসে বলে,—খুব সোজা।

—ঢং করিস না। গাঁজার গন্ধ পেয়েছিস্ ?

—না। আগে পাইনি। এখন পাচ্ছি।

—বল্ না ব্যাটা, কি করে টের পেলি।

াল নিজের নাকে হাত দিয়ে দেখায়।

নোদ মুখ বিকৃত করে বলে,—শালার নাকটাই হয়েছে আমার গৃহশত্রু। আজ থেকে কি ? আমি যখন তোর সমান তখন থেকে। বিয়ের বাসর ঘরে—দূর শালা, কাকে বলছি। জুত করে না টেনেই নেশা ধরল নাকি ?

ল্কেটা মাটিতে ঠুকে, পোড়া গাঁজা হাত দিয়ে নিভিয়ে আলমারীর নীচে ঠেলে দেয় নোদ। কল্কের ভেতরের গোল ঢেলাটা সযত্নে কল্কের মধ্যে ফেলে লাল রঙের শালু য়ে জড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আলমারীর মাথায় তুলে রাখে।

-বিনোদদা, আমি একটু হেডমাস্টারের কাছে যাব।

-তুই কেন যাবি ? তুই তো ফার্স্ট হয়েছিস্।

-আমার জন্যে নয়--বীজেশের জন্যে।

-বকুনি খেয়ে মরবি। পালা—

াল তবু দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ হেডমাস্টারের ঘরে বরফ-কলের মালিক জিতেন াদ্দার বসে আছে। জিতেন পোদ্দারের ছেলে নিত্যানন্দ নিশ্চয়ই ফেল করেছে। ত্যানন্দের বাবা বার হয়ে যেতেই মৃণাল চোখ কান বুঁজে ঢুকে পড়ে।

াটা লেন্সের চশমা কপালের ওপর ঠেলে দিয়ে তিনি বলেন,—আমার আনন্দ হয়েছে াল। তোমাকে এবারে কিছু বই দিয়ে সাহায্য করতে পারব আশা করছি। যাও াসে যাও। একটু পরেই ছুটি হয়ে যাবে।

-আমি অন্য কারণে দেখা করতে এসেছিলাম স্যার।

হেডমাস্টার চশমাটা চোখের ওপর নামিয়ে প্রশ্ন করেন—কী কারণ ?

-আমি বীজেশের জন্যে বলতে এসেছি।

-তোমার কাকা এসেছিলেন—জান ?

-শুনলাম।

-তাকে বলে দিয়েছি যা বলবার। অত খারাপ পরীক্ষা হলে পাস করানো চলে না।

-কিন্তু ওকে প্রমোশন দিতে হবে স্যার।

হেডমাস্টার চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিয়ে বসে বলেন—কি বলতে চাও ?

-ওকে পাশ না করালে, আমার হয়ত পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে।

ীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মৃণালের দিকে চেয়ে থাকেন তিনি। মৃণাল নিশ্চল। হেডমাস্টারের ষ্টি তার চাহনিকে আনত করতে পারল না। সে বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল, ওই ষ্টিতে কী মেশানো রয়েছে। তিরস্কার ? হতে পারে। তবে শুধু তিরস্কার নয়— ারও কিছু।

-ক্লাসে যাও।

মৃণাল ঘর থেকে বার হয়ে যায়।

ক্লাসে হাবলু মৃণালের জামা টেনে বলে,—হেডুর ঘরে ঢুকেছিলি?

—হ্যাঁ।

—কেন রে?

—এমনি।

মৃণাল ভাবে, আজ তার মা থাকলে কি করত। আদর-টাদর করত নিশ্চয়ই। কী ধরনের আদর সে জানে না। অনেকের মা মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। অনেকের মা গালে চুমু খায়। হাবলুর মা হাত দিয়ে তার চিবুক ছুঁয়ে চুমু খায়। ছেলে ছোট থাকলে সামনে হাঁটু ভেঙে বসে বুকে জড়িয়ে ধরতে সে দেখেছে অনেক মাকে। কিন্তু তার সমান বয়সের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে হলে বসে পড়তে হবে না। হয়ত একটু নিচু হতে হবে মায়েদের। তবে মা কতটা লম্বা ছিল সে জানে না। সে যখন দেখেছে তখন অনেক বড় দেখাত। কিন্তু তখন সে নিজে ছোট ছিল বলে অমন দেখাত। আজ মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই অতটা বড় দেখাত না। মা যদি পাখীর মায়ের সমান হয়, তবে বুঝতে হবে মোটেও লম্বা ছিল না। পাখীর মায়ের চেয়ে মাথায় পাখী কিছুটা বড়।

মা নেই বলে, আদর টাদরের বালাই নেই। স্কুলেও কেউ আসে নি অভিনন্দন জানাতে। বাড়িতেও কারও আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখতে পাবে না। বীজেশ পাস করতে পারে নি। বাড়ির সবার মনের অবস্থা তো জানা। হেডমাস্টার কথা দিলেন না। যেটুকু সে বলেছে, অনেক বেশী করে বলেছে হেডমাস্টারকে। এর চাইতে বেশী বলা সম্ভব ছিল না। এর চাইতে বেশী সে কাউকে কখনো বলে নি। সে জানে না, হেডমাস্টারের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে কিনা। তেমন কোন লক্ষণ অন্ততঃ তার নজরে পড়ে নি। বাড়িতে ফিরে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে সোজা নিজের ঘরখানিতে ঢুকতে পারলে বেঁচে যাবে।

—তুই আজ বড্ড বেশী ভাবছিস্। তোকে দেখে আমিও কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি।

মৃণাল লক্ষ্য করে নতুন পেন দিয়ে হাবলু একটি পাতা ভরে কমপক্ষে দুশোবার "মা সরস্বতী সহায়" কথাটা লিখেছে। "সরস্বতী এবারে সত্যিই তার সহায়। সেই সঙ্গে তার বাড়ির সবাই। নতুন পেনের ক্লিপ আর নিব্ চকচক্ করছে। হাবলুর মুখও আনন্দে চকচকে।

একটু পরে জগবন্ধু স্যার এসে ঢোকেন। দুচারটে ভাল ভাল উপদেশ দিয়ে হাই তুলে বলে—তোরা ইচ্ছে করলে আমার কাছ থেকে নতুন বই কিনতে পারিস। যার কিনবি দু একদিনের মধ্যে আমাকে জানিয়ে দিবি। আমি শিগ্গিরই কলকাতা যাব

সুব্রত মল্লিকের ছেলে সুশান্ত হেসে উঠে বলে,—কত কামাবেন স্যার ?

জগবন্ধু মাস্টার দ্বিতীয়বার হাই তুলতে গিয়ে থেমে যায়। ছলছলে চোখটাকে বড় বড় করে বলে,—কী ? কী বললি ?

—বলছি, আমরা সবাই যদি আপনার কাছ থেকে কিনি, তাহলে কত পয়সা পিটবেন ?

জগবন্ধু কিছুক্ষণ থ হয়ে থাকে। কালো মুখে তার রক্তের তরঙ্গ। হতভম্ব ছাত্ররা ভাবে—আজ সুশান্ত না হয়ে অন্য কেউ হলে নিহত হত।

—তুমি আজই নতুন ক্লাসে উঠেছ সুশান্ত। তাছাড়া কত বড় বংশের ছেলে তুমি। তোমার মুখে এ ধরনের কথা আমি কল্পনা করিনি।

ক্লাসের সবার সহানুভূতি মাস্টারের প্রতি। সুশান্তকে দু একজন ছাড়া কেউই দেখতে পারে না। তবু সুশান্ত নিশ্চিন্তে নির্লজ্জের মত দাঁত বার করে হাসে।

জগবন্ধু বলে,—বই এর দাম ওপরে লেখা থাকে। সেই দামেই তোমরা পাবে।

সুশান্ত ফস্ করে বলে—কমিশন ? আপনি তো কমিশন পাবেন।

—হ্যাঁ পাবো বৈকি। এখান থেকে ট্রেন ভাড়া দিয়ে কলকাতায় যাব। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বই যোগাড় করব। তারপর সেগুলো ব্যাগ ভর্তি করে, রিক্শা ভাড়া দিয়ে স্টেশনে এসে গাড়িতে তুলব। অনেক খাটুনি আর খরচা আছে। এত কথা আমি বলতাম না। শুধু বলছি, এইজন্যে যে. অল্প বুঝে বড় বড় কথা বলতে নেই, এটা বুঝিয়ে দিতে। তোমরা যদি কলকাতা থেকেও বই কেন, কম দামে পাবে না। বিশেষ করে তোমাকেই বলছি সুশান্ত, তোমার বই কলকাতা থেকে কিনে আমায় জানিও কত কমে পেয়েছ।

সমস্ত ক্লাস নীরব। নতুন ক্লাসের প্রথম দিনেই সুশান্ত একটা বিষ-বোমা ফাটিয়ে সারা বছরকেই যেন কলুষিত করে দিল। ওই জগবন্ধু মাস্টার, একটু আগে যে উপদেশাবলী দিয়েছে, সারাটা বছরে সেই উপদেশ আর কখনো তার মুখ থেকে উচ্চারিত হবে কিনা সন্দেহ।

মৃণাল মনে করে, বই বেচে জগবন্ধু মাস্টারের তেমন লাভ নিশ্চয়ই হয় না। তবু এর মধ্যে কোথায় যেন দুর্বলতা লুকিয়ে রয়েছে। নইলে, সুশান্ত যে-ই হোক, এত মোলায়েম ভাবে কথা বলত না। হারু মাস্টারের মত স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখাই বোধহয় ভাল। হারু মাস্টারকে সুশান্তর মত ছেলেও এ পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারে নি। অথচ সুশান্তকে ছেড়ে কথা বলে না কখনো হারু মাস্টার। সে স্বভাবই তার নয়, ইস্কুলের বেঞ্চিতে পৃথিবীর বিজ্ঞতম ব্যক্তিও এসে যদি বসে, তবে সে হারু মাস্টারের কাছে অন্য ছাত্রদের সমানই ব্যবহার পাবে, কমও না—বেশীও নয়,

ঘরের মধ্যে মন-মরা হয়ে বসে থাকে মৃণাল। খোকার বাচ্চাগুলো বেশ বড় হয়েছে। ওদের মধ্যে একটাকে দেখতে সেই হুলোটার মত—প্রাচীরের ওপর দিনে-রাতে সময়ে-অসময়ে বসে থাকত সে। কিল্‌বিল্‌ করে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। কখনো কখনো চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে উঁকি দেয়। সেদিকে চেয়ে বসে থেকে মন ভরলেও পেট ভরে না মৃণালের। অথচ কাউকে ডেকে জেনে নিতেও ইচ্ছা হয় না। বীজেশ ফেল করেছে। তার খাওয়ার রুচি না থাকাই স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে কাকা-কাকীর জিভের স্বাদ আর জঠরের জ্বালা অন্তর্হিত হওয়াও বিচিত্র নয়। টিটু আর পুতলীর ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু এই দুই পক্ষের কোনটাতেই সে নয়। সে দল ছাড়া তৃতীয় পক্ষ। হারু মাস্টার ক্লাশ ফোর-এ ভাল ভাবে শিখিয়েছিল, থার্ড পার্সন সিংগুলার নাম্বার ক্রিয়ার শেষে 'এস' যোগ হয়। নিজেকে সেই থার্ড পার্সন সিংগুলার নাম্বার বলে অনুভূত হয় মৃণালের, তারই মত একঘরে। তাই খাওয়ার রুচি রয়েছে, পেট জ্বলে যাচ্ছে, অথচ কেউ দিচ্ছে না।

পুতলী এক-আধবার এসে দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, আবার চলে গিয়েছে। কিন্তু মৃণালের দিকে দৃষ্টি ফেলবার অবকাশ হয় নি। সে লক্ষ্য করেছে বাচ্চাগুলোর বাড়-বাড়ন্ত চেহারা। চৌকাঠ পার হয়ে সংসারে ঢুকতে ওদের আর দেরী নেই বিশেষ সেই অপেক্ষাতেই দিন গুনছে পুতলী। তখন খোকার বংশধরগণ তারই আওতায় গিয়ে পড়বে : বেচারা জানে না, শেষের সে-দিন কত ভয়ংকর। কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলবে তখন। ভাতের ওপর রাগও করতে পারে। মায়ের সাধ্য-সাধনা যেখানে বর্ষার বৃষ্টির মত অনিবার্য, সেখানে ভাতের থালা সরিয়ে দিয়ে বোধহয় স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করা যায়।

মৃণালের গা ঘামতে থাকে। রান্নাঘরে কাকীমা নেই। শোবার ঘরে গিয়ে খাবার দিতে বলবার মত দুঃসাহস এ-বাড়িতে তার কখনো হবে না। চুপ করে বসে থাকে তাই।

রাত বাড়ে। টিটু এসে দাঁড়ায়। সে অল্প দুটি কথায় প্রকৃত রহস্য ভেদ করে দিয়ে চলে যায়।

ফিস্‌ফিস্‌ করে টিটু বলে,—এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়।

—রাতেও খাবো না ?

—কখনো না। এ বাড়ি থেকে ভাতের পাট উঠল বলে তোমার।

—আগে জানলে ফেল করতাম।

—ও সব ভক্কী আমায় দিও না। বাবা সব জেনে এসে মাকে বলে দিয়েছে।

—কী জেনে এসেছে ?

—বাবা জলজ্যান্ত প্রমাণ পেয়েছে, তুমি চক্রান্ত করে দাদাকে ফেল করিয়েছ। বুঝতে বাকী নেই কারও।

—আমি ? চক্রান্ত ? কেন ? কার সঙ্গে চক্রান্ত করব ?

—মাস্টারদের সঙ্গে। ভাল ছেলে তো। তোমার কথা মাস্টাররা শোনে।

স্তব্ধ মৃণাল বসে থাকে। টিটুর কথার তীব্র প্রতিবাদ করবার সামর্থ্যও তার থাকে না। সে দেখতে পায় টিটু দাঁড়িয়ে রয়েছে তারই দিকে চেয়ে। প্রতিবাদ প্রত্যাশা করছে টিটু। তবু সে চুপ করে থাকে। শেষে সব কিছু বুঝে ফেলবার মত ঘাড় বাঁকিয়ে টিটু অন্তর্হিত হয়। অকাট্য প্রমাণ পেয়ে গেল সে, মৃণাল মূক থাকায়। কাকা কাকীমার কানে উঠবে কথাটা এখনি। সময় নষ্ট করবার মত পাত্রী টিটু নয়। সে জানে বাসি খবরের মূল্য কানাকড়িও নয়। অথচ টাট্‌কা সংবাদ পরিবেশন করলে তার প্রতিক্রিয়া নয়ন-মুগ্ধকর হতে পারে। এখনি কাকা ছুটে এসে সে দৃশ্যের অবতারণা করবে, পয়সা দিয়েও সে দৃশ্য দেখতে অপার আনন্দ। হারু মাস্টার একবার গল্প করেছিলেন, অপরাধীদের হিংস্র জন্তুর খাঁচার মধ্যে ফেলে দেওয়া হত। কী ভাবে তার মৃত্যু হয়, দেখবার জন্য দর্শকের অভাব কখনো হয় নি। বরং দর্শকের জন্য স্থান-সংকুলান দুরুহ হয়ে উঠত। অমন শাস্তি চালু করলে এ-যুগেও দর্শকরা ভেঙে পড়ত। মনটা মানুষের এতটুকুও বদলায় নি। বাইরের পালিশ যত বাড়ছে, ভেতরে তত বেশী পচন ধরছে। হারু মাস্টার এ ধরনের অনেক কথা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাধারণত শেষ করে। ছাত্ররা জানে কখন দীর্ঘশ্বাস পড়বে। আগে থেকেই মুখ টিপে হাসতে থাকে। কিন্তু মৃণাল বোঝে, হারু মাস্টারের কথাগুলো অনুভব করবার মত প্রখরতা অধিকাংশ ছাত্রেরই নেই। কিংবা তাদের বুদ্ধি ততটা পাকে নি।

কাকা ছুটে এলে, টিটু, বীজেশ, কাকীমা—এমনকি পুত্‌লীও আসবে। সেও নির্যাতনের বীভৎস রস আস্বাদন করতে শিখেছে। ভালই শিখেছে।

কিন্তু অনেক রাত হয়ে যায়, কেউ আসে না। টিটুর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই তো ? আজকে মৃণালকে নিষ্কৃতি দেবার বিনিময়ে কাল সকালে দুর্লভ কোন সামগ্রী দাবী করতে পারে।

রাত আরও গভীর হলে টিটুর কথামত এক পেট জল খেয়ে নেবে ঠিক করে সে। খোকা ঘুমোচ্ছে। তার বাচ্চাগুলো এখন আর তার ছোট্ট কোলের মধ্যে ধরে না। তবু তার সেইখানেই দলা পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে যতটা সম্ভব।

দরজার কাছে যেতেই খোকা কান খাড়া করে। ঘাড় তুলে নিদ্রাজড়িত চোখে

একবার দেখে নেয়। সে ঠিক জানে, মৃণাল আজ কিছু খায় নি বাড়িতে। কারণ খেতে বসলে অদূরে সে-ও এসে বসে। তবে সে জানে না, মানুষ-জাতির সিংহভাগ এতই হতভাগ্য যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের অনাহারে থাকতে হয়। পেটের ভেতরে খিল্ ধরলেও খাবার থাকে নাগালের বাইরে। হাত-পা-বিশিষ্ট জীব বলে তারা হেঁসেলের আনাচে-কানাচে বেড়ালের মত সুযোগ-সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে না।

মৃণাল দরজার কাছে দাঁড়ায়। খোকা ঘাড় গুঁজে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে আবার। ভাবে, খোকা কখনই এভাবে একেবারে না খেয়ে থাকত না। যেমন করে হোক, পাকস্থলীতে কিছু ভরে এসে ঘরে ঢুকত। সে-ও কি খোকার মত চেষ্টা করতে পারে না?

বাইরে কান পাতে মৃণাল। সারা বাড়ি স্তব্ধ। আমবাগানের মধ্যে হুতোম পেঁচা ডাকছে। ওই আমবাগানের ওপারে হারু মাস্টারের বাড়িতে লক্ষ্মীদি এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু মাস্টারের ছেলেটা কি ঘুমোচ্ছে? হয়তো নয়। ছেলেটার চেহারা দিন দিনই কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। ক্ষেপা ঘোষের ছাগলের দুধ এতটুকু রক্ত সৃষ্টি করতে পারে নি তার দেহে। লক্ষ্মীদির মা তাই কিছুদিন থেকে অন্য ছাগল ঠিক করবার জন্য তাগিদ দিতে শুরু করেছে। তার ধারণা, ক্ষেপা ঘোষের ছাগল কাঁঠালের পাতা খেতে পায় না। স্ত্রীর কথা শুনে মাস্টার মুখখানা কেমন অদ্ভুতভাবে বিকৃত করে। অথচ সেই বিকৃতিতে বিরক্তি ফুটে ওঠে না একটুও—বরঞ্চ মনে হয় কান্নাকে ও ভাবে রূপান্তরিত করে মাস্টার। মৃণাল বুঝতে পারে, কেন অমন করে। অদ্ভুত বলে মনে হয়। মাস্টারের স্বভাবের সঙ্গে ওই মুখবিকৃতি এতটুকু মেলে না। সম্পূর্ণ বেমানান। কথায় কথায় রুখে ওঠাই তাঁর স্বভাব। পৃথিবীতে বাস করতে হলে বায়ুস্তরের যে ওজন আবালবৃদ্ধবনিতা সবাইকে বইতে হয়, সে ওজন সর্বদাই যেন অসহনীয় বলে মনে হয় হারু মাস্টারের কাছে। সব কিছু দুঃসহ বলে সব কিছুতেই প্রতিবাদ। শুধু নিজের শিশু-সন্তানের বেলায় কেমন যেন আশ্চর্যরকম নরম হয়ে যায় মাস্টার ইদানীং।

বাইরে এসে দাঁড়ায় মৃণাল। হুতোম পেঁচার ডাক থেমে গিয়েছে। ধীরে ধীরে রান্নাঘরের বারান্দায় গিয়ে ওঠে সে। বারান্দায় কোথায় সুইচ আছে জানা সত্ত্বেও জ্বালাতে সাহস পায় না। আন্দাজে এগিয়ে গিয়ে দরজার শেকলে হাত দিয়ে দেখে তালা ঝুলছে। দরজায় তালা থাকবে না, এমন আশা সে করে নি। তবু একবার হাত দিয়ে দেখে নিয়ে একটু এগিয়ে কয়লা ভাঙার হাতুড়িটা অন্ধকারের মধ্যেই তুলে নেয়। বুকের ভেতরে ঢিপ্ ঢিপ্ করে। চুরি করছে সে। বেড়াল কখনো এভাবে চুরি

রে না। সে মানুষ বলেই তালা ভেঙে ঘরে ঢোকার ক্ষমতা রাখে। তবে বেড়ালের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার উদ্দেশ্যের মূলগত অমিল নেই। সে শুধু খেতে চায়। পরীক্ষার ফল বার হবে বলে সাত সকালে কোন রকমে একটু ডাল-ভাত মুখে দিয়ে ইস্কুলে গিয়েছিল। মৃণালও একই সঙ্গে রওনা হয়েছিল। কিন্তু তার পাতে ডালের মধ্যে অনেকখানি গাওয়া ঘি পড়েছিল। ফেল করায় মন খারাপ হলে সেই ঘিয়ের জোরেই রাতটা কাটিয়ে দেবে বীরেশ।

হাতুড়িটা ঠুকবার আগে আগে বুক বড় বেশী কেঁপে ওঠে। সে বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে কাকা কাকীমার ঘরের দিকটা ঘুরে আসে। কেউ জেগে নেই। শেষে তালার ওপর আস্তে আঘাত করে।

—ম্যাও।

চমকে ওঠে মৃণাল। খোকা এসে পা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। একটু লজ্জিত হয় মৃণাল। খোকা কি বুঝতে পারছে, সে চুরি করছে রান্নাঘর থেকে? হয়ত পারছে। অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে, এটা নিশ্চয়ই সে জানতে পেরেছে। নইলে বাচ্চাদের ফেলে রেখে এখানে এসে সে দাঁড়াত না।

আর একবার হাতুড়ি ঠোকে সে তালার ওপর। এবারে একটু জোরে। খোকা মানুষ হলে কাকা-কাকীর দরজার সামনে পাহারা দিতে পারত আজ। খোকা মানুষ নয়। তাই বলে অমানুষও নয়। সে পশু। মানুষই শুধু অমানুষ হতে পারে।

তালাটা শেষ পর্যন্ত খুলে যায়। যতটা চেষ্টা করতে হবে ভেবেছিল মৃণাল তার চেয়ে অনেক কম চেষ্টাতেই খুলে গেল। বহুদিনের পুরোনো তালা। ধোঁয়া আর ঝুল-কালিতে মিশমিশে কালো আর তেল চিটচিটে।

রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় সে। খোকাও পেছনে পেছনে ঢুকে পড়ে। জানলাগুলো বন্ধ। এই ঠাণ্ডাতেও ঘরখানা বেশ গরম—আরামদায়ক গরম।

লাইট জ্বালায় মৃণাল। অস্পষ্ট মনে পড়ে, হেঁসেলে ওইখানে বহুদিন আগে মা বসে থাকত। সন্ধ্যার একটু পরেই খেতে বসত সে এদিকটা। বীরেশও বসত। কাকীমা যত্ন করে তাদের ফ্যানা ভাত খাইয়ে দিত। খেতে না চাইলে কত রকমের গল্প করে ভোলাতো। কাকীমার গা দিয়ে তখন সুন্দর একটা সুঘ্রাণ বার হত। নিটোল হাতে সোনার চুড়িগুলো চিক্‌মিক্ করত। নাকে একটা সবুজ পাথরের নাকচাবি ছিল কাকীমার। মায়ের অমন ছিল না।

এই নির্জন রান্নাঘরে হঠাৎ মনে কেন যে অতীতের স্মৃতি ভেসে উঠল নিজেই বুঝতে

পারে না। এসব কথা তার মনেও ছিল না। হয়ত রান্নাঘরে সব সময় কাকীমা থাকে বলে, এমনভাবে আগে কখনো ঘরখানার দিকে ভালভাবে চাইতে পারে নি সে। স্মৃতির দুয়ার তাই ছিল অবরুদ্ধ।

বাবা খেতে বসত ওইখানে। বাবার পাশে কাকাও বসত মাঝে মাঝে। দুই ভাই খুব হাসাহাসি চলত। বাবার সামনে কাকীমা ঘোমটা দিত। ঘোমটার আড়ালে দুজনার হাসি দেখে নিজেও হাসত। সেই হাসি দেখবার জন্যে মৃণাল কাকীমার ঘোমটার ভেতরে উঁকি দিত। হাসলে কাকীমার নাকচাবির সবুজ পাথরটা বেশ চিক্‌চিক্‌ করত।

মাকে একবার সে প্রশ্ন করেছিল,—কাকীমা নাকচাবি পরে কেন মা?

—বড় হলে বুঝবি।

সে বড় হবার অপেক্ষা করে নি। তখনই জানবার জন্যে জেদ ধরেছিল। তার জেদ দেখে কাকীমা হেসে লুটোপুটি। শেষে তার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল–আমাদের নিঃশ্বাসে বিষ আছেরে।

—সাপের বিষের মত?

—হ্যাঁ।

—নাকচাবিতে কি হয়?

—নাকচাবির সোনা সেই বিষকে ক্ষয় করে দেয়।

—মায়ের নিঃশ্বাসে বিষ আছে?

—সব মেয়েদের নিঃশ্বাসেই আছে।

—মা পরে না কেন তবে?

—মাকে জিজ্ঞাসা কর।

হেঁসেলের কাছ থেকে মা বলে উঠেছিল,—কী যা তা বলছিস্ আন্না।

কাকীমার নাম আন্না। বহুদিন পরে মনে পড়ল মৃণালের। মায়ের কথায় কাকীমা হাসি থামে নি। তাই দেখে মাও না হেসে থাকতে পারে নি।

শেষে কাকীমা বলেছিল,—তোর বউ আসুক, আমি একটা নাকচাবি দেব।

কাকীমার নাকচাবি এখন আর নেই। নাকের ওখানে ফুটোটা কালো হয়ে থাকে। কাকীমার হাতও আর অমন নিটোল নেই। গা দিয়ে সুঘ্রাণ বার হয় কিনা সে জানে না। কারণ গায়ের কাছে ঘেঁষতে পারে না। তবে মুখের সেই হাসি অন্তর্হিত হয়েছে। মৃণাল জানে না, তার অলক্ষ্যে সেই হাসি ভেসে ওঠে কিনা কাকীমার মুখে।

—ম্যাক্—কা-ও।

—দাঁড়া। তুই আবার কি খাবি এখন?

—মিউ।

খোকাকে তাড়া দিলেই কণ্ঠস্বরে অমন মধু ঢেলে দেয় সে।

মৃণাল প্রথমেই ভাতের হাঁড়িতে দেখে ভাত নেই। এই খিদের জ্বলুনিতে ভাত ছাড়া আর কিছু খেতে তার মন চায় নি। এ ঘরে অন্য কিছু থাকবে বলে ভরসাও কম। কারণ সব কিছু কাকীমা ভাঁড়ার ঘরে রাখে। ভাঁড়ার ঘর রান্নাঘরের মত এতটা অরক্ষিত নয়। পাগলের মত সবকিছু তন্নতন্ন করে খোঁজে সে। শেষে একটা কৌটোতে চিঁড়ে কিছু পায়। মুখে দিয়ে দেখে একটু তেতো তেতো। গুড়ও জুটে যায়।

—ম্যাও।

—তোর কিছু নেই। চিঁড়ে খাবি?

খোকা মৃণালের গায়ে লেজটা বুলিয়ে চলে। তার আশা ভাল খাবার কিছু পাবে। কিন্তু মৃণাল যখন চিঁড়ে ভিজিয়ে গুড় দিয়ে মেখে দিল, তখন সে একটু শুঁকেই করুণ স্বরে ডাকল। তারপর নির্বিবাদে হেঁসেলের ভেতরে ঢুকে গিয়ে, এটা ওটা দেখতে লাগল। সে বুঝতে পেরেছে মৃণাল তারই দলে। সুতরাং হেঁসেলে প্রবেশ করে সব কিছু দেখবার অধিকার তার রয়েছে।

গোগ্রাসে খেয়ে, বাটিটা ধুয়ে যথাস্থানে রেখে কৌটোটা বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে বাইরে আসে মৃণাল। খোকাও সঙ্গে আসে। তালাটা চেপে দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে সে।

খোকার জন্য একটু কষ্ট হয় তার। কিন্তু খোকাকে বিশেষ বিচলিত বলে মনে হয় না। সে নির্বিকার চিত্তে আবার বাচ্চাগুলোর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। সে জানে, সব সময় সবকিছু পাওয়া যায় না। না পেলে যেমন হতাশ হবার কিছু নেই, পেলেও তেমনি আনন্দে নেচে ওঠবার অর্থ হয় না। ওর হাবভাব দেখে মৃণাল ভাবে, মানুষের চাইতে বেড়াল উন্নত শ্রেণীর জীব। তাই ওদের চিত্তে আশা নিরাশার দোল-দোলানি নেই।

পরদিন ভোরবেলা টিটু এসে জাগায় তাকে।

—রাত্তিরে চোর এসেছিল জানো?

—না তো? কী চুরি হয়েছে?

—কিছু নিতে পারে নি বোধহয়। তোমার ঘরের পাশ দিয়ে গেল, ঘুম ভাঙল না?

—খুব পা টিপে টিপে গিয়েছিল নিশ্চয়।

—ঘোড়ার ডিম। মা পর্যন্ত দুপ্-দাপ্ শব্দ শুনেছে। বাবাকে ধাক্কা দিয়েছিল। বাবা নাকি পাশ ফিরে শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করেছিল।

মৃণালের বুক কাঁপে। সেই সময় কাকা উঠে পড়লে সর্বনাশ হত। কিন্তু টিটুর পরের কথায় সে নিশ্চিন্ত হয়।

টিটু বলে—মা একসঙ্গে অনেক পায়ের শব্দ শুনেছে। ভারী পায়ের শব্দ। ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছিল তারা।

—সত্যি? আমি তো কিছুই শুনতে পাইনি। না-খেয়ে বোধহয় বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম।

কথা বলতে বলতে খোকার দিকে নজর পড়ে মৃণালের। পিঠটা উঁচু করে জিভ বার করে আলিস্যি ভাঙছে। মুহূর্তের জন্যে মনে হয় খোকা বুঝি হেসে উঠবে তার কথা শুনে।

—কাকা আমাকে কাল মারল না কেন রে?

—আমি একটু উস্‌কে দিলেই মারত।

টিটু চলে গেলে, মৃণাল বাইরে গিয়ে মুখ ধোয়। পড়াশোনা কিছু নেই। বাড়ির বাইরে যেতে পারলে বেঁচে যায়। কিন্তু খাবারের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। দূর থেকে কাকীমার মুখ বড় বেশী গম্ভীর বলে মনে হয়। হেঁসেলের হাঁড়ি, কড়াই, হাতা খুন্তি সব বাইরে বার করে দিয়েছে, মেজে ঘরে তোলবার জন্যে। চোরের স্পর্শ লেগে অপবিত্র হয়েছে সব।

এক সময়ে পুতলীকে কাছাকাছি দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করে,—তোর খাওয়া হয়েছে?

—হ্যা—ক-খ-ন। নলেন গুড় দিয়ে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘরে নিয়ে রেখেছিল মা। তাই দিয়ে চিঁড়ে খেলাম। দাদাটার কী খিদে পেয়েছিল। গরুর মত গিললো।

—অনেকটা খেয়েছে?

—হ্যা—এ্যাত্তো। কাল খায় নি কিনা? ফেল করেছে যে। ফেল করলে খেতে নেই যে।

—ও।

মৃণাল অন্যমনস্ক হয়। কাকীমা আজকেও তাকে কিছু দেবে না। শাস্তি দিচ্ছে। মাস্টারদের সঙ্গে চক্রান্ত করে বীরেশকে ফেল করাবার শাস্তি। হেডমাস্টার তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করলে আজ খেতে পেত। কাল রাতেও অনাহারের জ্বালায় তালা ভেঙে চুরি করতে হত না। আর সব চাইতে বড় কথা, সে পড়াশোনা চালাতে পারত। পাশের বইগুলোর দিকে একবার সে চায়। ওগুলো পড়া শেষ হয়েছে। ক'খানাই বা বই। অধিকাংশই তো এর-ওর কাছ থেকে ধার করে নিয়ে আসে দুদিনের জন্যে। রয়েছে শুধু একগাদা খাতা। ওই খাতাগুলোর জায়গাও এবারে ফাঁকা পড়ে রইবে। নতুন খাতা এসে স্থানটুকু অধিকার করতে পারবে না।

মৃণাল কাঁদতে চেষ্টা করে। চোখ জ্বলুনিই সার হয়। জল আসে না চোখে। সে পুরোনো খাতাগুলো একটা একটা করে তুলে নেয় কোলের ওপর। ওল্টাতে শুরু করে পাতাগুলো সযত্নে—যেন কত দামী বই। সারা বছরের পরিশ্রমের প্রায় সবটুকু ফল বন্দী করে ফেলেছে সে খাতাগুলোর মধ্যে। তাই এরা বড় আদরের।

টিটু ছুটে আসে। মৃণাল খাতাগুলো কোলের ওপর রেখে টিটুর মুখের দিকে চায়। একটা নির্বিকার ভাব তার মনের মধ্যে। টিটুরা তার মনে আশা কিংবা নিরাশার দোলা আর জাগাতে পারে না। কাকীমার হাতের খাবার কিংবা কাকার হাতের শাস্তি—সবকিছু এই মুহূর্তে তুচ্ছ বলে মনে হয়। সব কিছুকে নীচে ফেলে রেখে সে যেন অনেক উঁচু স্তরে উঠে গিয়েছে।

—তোমাদের হেডমাস্টার এসেছে মৃণালদা।

খাতাগুলো ধীরে ধীরে রেখে মৃণাল বলে,—আমাকে ডাকছেন ?

—না। বাবার সঙ্গে কথা বলছে।

টিটুর কথা শ্রুতিকটু লাগে। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে 'এসেছে' 'বলেছে' বলাটা যেন কেমন। ইস্কুলের ছেলেরাও অনেক সময় অমন বলে বটে। কিন্তু তখন তারা হেডমাস্টারকে "হেড়ু" বলে উল্লেখ করে।

হেডমাস্টার কেন এসেছেন, অনুমান করতে চেষ্টা করে মৃণাল। হয়ত কাকাকে অনুরোধ করবেন, তার পড়াটা যাতে চালু থাকে। বৃথা অনুরোধ। কাকাকে তিনি চেনেন না। তাই বীজেশকে ক্লাসে উঠিয়ে না দিয়েও এভাবে বলতে এসেছেন।

টিটু চলে যায়। সে হয়ত আশা করেছিল হেডমাস্টারের কথা শুনে মৃণাল আগ্রহ প্রকাশ করবে। সে জানে না, এখন হেডমাস্টার, বিনোদ, হারু মাস্টার, ক্ষেপা ঘোষ, দীপা মাসী—সবাই তার কাছে একই পর্যায়ের। শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা আর সহানুভূতির রকমফের ছাড়া কারও সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট রইল না। নতুন ক্লাসে দেয়ালে টাঙানো কবিতার ছত্রটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মুখস্থ। আগে থাকতেই মুখস্থ ছিল।

এবারে বিজেশ আসে। ফিক্ করে একটু হেসে বলে,—পাস করে গেলাম।

মৃণাল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কথাটার মর্মার্থ। যখন বুঝল, তখন বীজেশের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কথাটা সত্য কিনা, অনুধাবনের চেষ্টা করে। কারণ অনাবিল চিত্তে মিথ্যের ঝুলি খুলতে তার মত পারদর্শী কাউকে দেখে নি মৃণাল।

বীজেশ বলে,—আহা, ন্যাকা সাজা হচ্ছে। তুই-ই তো হেড়ুকে এনেছিস পাস করিয়ে দিতে।

—কে বলল ?

হেডু নিজে এসে বলে গেল। বাবাকে বলল, আমাকে এবারে ভালভাবে পড়তে হবে। আসছে বছরে ফেল করলে কিছুতেই প্রমোশন দেবে না। বাবা রাজী।

মৃণাল বুঝে উঠতে পারে না, কথাটা প্রকাশ করে দিয়ে হেডমাস্টার ভাল কাজ করল কিনা। কারণ কাকা যা নিজে করতে পারে নি, তার কথায় সেটা সম্ভব হওয়ায় আত্মসম্মানে আঘাত লাগা আশ্চর্যের নয়। তবে এবারে কাকা অন্ততঃ বিশ্বাস করবে, সে কোন চক্রান্ত করে নি।

বীজেশ চলে যাবার পর, মৃণাল একা বসে ভাবতে থাকে। কিন্তু আর সে ভাবতে পারে না। মস্তিষ্ক কেন যেন বড় বেশী দুর্বল হয়ে পড়েছে। নইলে কপালের দুপাশটা অমন টন্‌টন্ করবে কেন? ইচ্ছে হয় বিছানায় শুয়ে পড়তে—সাহসে কুলোয় না।

পুত্‌লী ঘরে ঢোকে। বেড়ালের বাচ্চাগুলো এতক্ষণ তক্তাপোষের অন্ধকার কোণে ছিল। এবারে বাইরে বার হয়ে আসে। সেদিকে চেয়ে পুত্‌লীর চোখ দুটো জ্বলজ্বল্ করে ওঠে। সে মৃণালের দিকে চেয়ে একটু হাসে। মৃণালও হাসে।

—হাত দেব, মৃণালদা?

ওরা সবাই তাকে 'মৃণালদা' বলে ডাকতে শিখেছে। অথচ এককালে সে ছিল 'বড়দা'। বীজেশের বড়দা, টিটুর বড়দা। পুত্‌লী অবশ্য তখন জন্মায় নি। টিটু বলত 'বল্‌দা'। বীজেশকে সে বলত 'মেজদা'। কবে থেকে যেন বীজেশ হঠাৎ শুধু 'দাদা' হয়ে গিয়েছে এবং সে হয়েছে 'মৃণালদা'।

পুত্‌লীর কথার জবাবে মৃণাল বলে,—দে। কোলে তুলিস না। ওদের পায়ের নখগুলো বার হয়ে থাকে। আঁচড় লাগবে।

—একটুখানি ছোঁব।

পুত্‌লী একটির পিঠে হাত বোলায়—তারপর আর একটা। শেষেরটিকে কোলে তুলে নেয়।

—কী সুন্দর, তাই না?

—হুঁ।

—এদের নাম কি হবে? বাব্বা, কত নাম রাখতে হবে। তাই না?

—হুঁ।

—আমি সব নাম রাখব।

মৃণাল দুঃখের হাসি হাসে। পুত্‌লীর কত কল্পনা। কল্পনা মাত্রেই এমন উদ্ভট হয়। বাস্তবের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই, তাকেই বলে কল্পনা। পুত্‌লী বেচারা, দুঃখ পাবে, এদের বস্তা-বন্দী করে নির্বাসনে পাঠালে।

কাকীমার গলায় আওয়াজ ভেসে আসে। পুত্‌লীকে ডাকছিল চেঁচিয়ে। পুত্‌লী তাড়াতাড়ি উঠে বলে,—ওই যাঃ, তোমায় খেতে ডাকছে।

—কে ?

—মা।

—কি করে বুঝলি ?

—ডাকতেই তো পাঠিয়েছিল আমাকে।

যার জন্যে কাল বিকেল থেকে অস্থির হয়ে রয়েছে মৃণাল, সেই খাবারের ডাক শেষ পর্যন্ত সত্যিই এল। কিন্তু এখন কেন আগ্রহ নেই ? নিজেকে বড় বেশী অবসন্ন বলে মনে হয় তার ? ওই খাদ্য উদরস্থ করবার একটা অলিখিত শর্ত রয়েছে যেন। সেই শর্তের একটু এদিক-ওদিক হলে অনাহারে থাকতে হবে। এমন খাদ্য গ্রহণে কতখানি হীনতা রয়েছে, সে বোঝে। অথচ সে জানে, খেতে তাকে হবেই। কাকীমা মনে মনে যে শর্ত আরোপ করেছে, সেই শর্ত সে মানবে না। এখনো মানে নি। অনাহারে থাকবার ভয়ে সে বীজেশকে পাস করে দিতে অনুরোধ করে নি হেড্‌-মাস্টারকে। সে শুধু চেয়েছিল তার লেখাপড়া চলুক। অনেক বড় হতে চায় সে। বাবার ঘরে যাঁদের ফটো টাঙানো ছিল, সেই সব ফটোর অনেকগুলো ভেঙে চুরমার হয়েছে, কিন্তু ময়লা হয়ে অনাদৃত পড়ে রয়েছে—তবু সে জানে বাবা কী চাইত। নইলে ওসব ফটোর স্থান ঘরে হতো না। তাই বড় হতে চায় সে। বড় হতে হলে লেখাপড়া শিখতে হবে।

পুত্‌লী বলে,—যাও, মা ডাকছে।

—যাচ্ছি।

—দেরী করছ কেন বলতো ? তুমি চলে গেলে আমি আর একটু বাচ্চাগুলো দেখব যে !

পুত্‌লীর জন্যেই তাকে উঠতে হয়।

কদিন পরে এক স্তব্ধ দুপুরে মৃণাল উৎকর্ণ হয়ে ওঠে এক অস্বাভাবিক চিৎকারের শব্দ শুনে। কোথা থেকে ভেসে আসছে এ শব্দ, প্রথমটা বুঝতে পারে না। কেউ যেন বিলাপ করছে। সে বাড়ির পাশে আমবাগানের ভেতরে এসে দাঁড়ায়। দেখতে পায় তার আগেই কাকীমা, টিটু আর পুত্‌লী এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। এবারে সে বুঝতে পারে কে যেন বুক ভাঙা চিৎকার করে কাঁদছে। আমবাগানটা বড। তবে ওপাশে যে তিনটি বাড়ি আছে তার মধ্যে হারু মাস্টারের বাড়ি একটি।

মৃণাল ছুটতে থাকে।

টিটু চিৎকার করে,—এই মৃণালদা—
মৃণাল ফিরে তাকায়। কাকীমার জলন্ত দৃষ্টি তার চোখে পড়ে, কিন্তু এখন কাকীমার ভয়ে থামলে চলবে না। মাস্টারের যদি কিছু হয়? লক্ষ্মীদির যদি কিছু হয়ে থাকে? সে মাস্টারকে কথা দিয়েছে প্রাণ দিয়ে লক্ষ্মীকে বাঁচাবে। আজ যদি লক্ষ্মীদির কিছু হয়, তবে সে বেঁচে ফিরতে পারবে না। কোন্ মুখে মাস্টারের সামনে দাঁড়াবে?
পেছনে টিটুর চিৎকার বারবার কানে এল, তবু সে উন্মাদের মত ছুটতে থাকে। সমস্ত পৃথিবীর জনতা পেছন হতে পরিত্রাহি চিৎকার করলেও তার থামবার উপায় নেই। কাছাকাছি গিয়ে মৃণাল নিঃসন্দেহ হয় কান্না হারু মাস্টারের বাড়ি থেকেই আসছে। লক্ষ্মীদির মা কাঁদছে।
হাঁপাতে হাঁপাতে উঠোনে গিয়ে পৌঁছোয়। সেখানে ইতিমধ্যেই ভীড় জমেছে। ক্ষেপা ঘোষ আর তার বউও রয়েছে। লক্ষ্মীদি কোথায়? লক্ষ্মীদি? মৃণালের বুকের ভেতরে ধ্বক্ ধ্বক্ করে। লক্ষ্মীদি কোথায় গেল?
পাগলের মত সে প্রশ্ন করে,—কী হয়েছে?
ছল্‌ছল্ চোখে ক্ষেপা ঘোষ বলে,—আমার দোষেই ছেলেটা গেল। বউ ঠাকরুণ ঠিক কথা বলতেন। ছাগলকে কাঁঠালের পাতা দিলে তার দুধে রক্ত হয় না। আমি একটা অমানুষ।
লক্ষ্মীদি নয়। তার আদরের ভাই ফ্যাকাশে রঙের ছেলেটার মৃত্যু হয়েছে। সেদিনই জন্মালো—শাঁখের আওয়াজ এখনো কানে বাজছে মৃণালের। এর মধ্যেই সব শেষ। রেলের নীচে না পড়লেও মানুষের মৃত্যু হয়—এমনকি শিশুরও হয়।
ভেতরে যেতে সাহস পায় না সে। অথচ ভেতরে গেলে মাস্টারমশায় আর লক্ষ্মীদিকে দেখতে পাবে। কীভাবে মানুষকে সান্ত্বনা দিতে হয় সে জানে না। সান্ত্বনা দেবার কোন অর্থ আছে বলেও মনে হয় না। তবু মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তার কি ভাল লাগবে না একটু!
ধীরে ধীরে সে ঘরের বারান্দায় গিয়ে ওঠে। ভীড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলে ওঠে, —তোর আবার ঘরে যাবার দরকার কি মৃণাল?
উক্তিটা কার, সে বুঝে উঠতে পারে না। কারও কণ্ঠস্বর চেনবার মত মনের অবস্থা তার নেই। তবু সে থমকে দাঁড়ায়। একটু অপেক্ষা করে। তারপর হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়।
কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরে। কাঁধের ওপর টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়ে। ফিরে দেখে লক্ষ্মীদি। লক্ষ্মীদির চোখে অবিরল ধারা। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট আওয়াজ বার হচ্ছে তার মুখ দিয়ে।

মৃণালের মন আক্ষেপে ভরে ওঠে, চোখে তার জল নেই বলে। বুকের ভেতরে লক্ষ্মীদির প্রতি সমবেদনায় টল্‌টল্ করে উঠলেও চোখ বিশুষ্ক। অথচ এখন অশ্রুর অসীম মূল্য। কেন সে এল তবে? ক্ষেপা কাঁদছে, ময়না কাঁদছে—সবার চোখ ছলছল। শুধু সে কেন কাঁদতে পারছে না। শিশুটির জন্যে, লক্ষ্মীদির জন্যে, তার মনেও কি কম কষ্ট? লক্ষ্মীদির মায়ের দুঃখে, তার বুক কি চৌচির হয়ে যাচ্ছে না। মাস্টারমশায়ের জন্যে সে কি কম ব্যথিত?

লক্ষ্মীর হাত চেপে ধরে সে বলে—লক্ষ্মীদি, আমি কাঁদতে পারি না। লক্ষ্মীদি, তোমার কষ্ট আমারও কষ্ট। মাস্টারমশায়ের দুঃখ আমারও দুঃখ—তবু আমি কাঁদতে পারি না।

বোবা শব্দ বার হয় লক্ষ্মীর মুখ দিয়ে। শুনতে না পেলেও বুঝতে পারে মৃণালের ভাষা। সে তাকে তাদের ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। সেখানে মৃত শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে আকুল কান্নায় বারবার ভেঙে পড়ছে তার মা। পাড়ার দু-চারজন মহিলা তাকে পেছন থেকে ধরে রেখেছে। হারু মাস্টার চুলগুলো মুঠো করে ধরে মাদুরে বসে রয়েছে।

লক্ষ্মী মৃণালকে নিয়ে মায়ের কাছে গেল না। শিশুটিকেও দেখালো না একবার। সে তাকে নিয়ে বাবার কাছে গিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল। তার তীব্র অনুভূতিশক্তি অন্তর থেকে তাকে বলে দিয়েছে, বটগাছটিকে সর্বপ্রযত্নে অটল রাখতে হবে। ঝড়-ঝাপটায় শাখা-প্রশাখার কত পাখীর নীড় ভেঙে পড়ে। আবার নতুন বাসা তৈরী করে তারা। কত পাখীর ছানা পড়ে মরে থাকে, ডিম ভেঙে যায়। আবার সব হয়। কিন্তু গাছটি ভেঙে পড়লে পাখীরা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে।

মৃণাল যেন লক্ষ্মীর মতই মূক হয়ে যায়। সে মাস্টারমশায়ের পাশে বসে থাকে কিছুক্ষণ। মাস্টারমশায় বুঝতেও পারে না কে বসল তার পাশে। আদৌ কেউ বসেছে কিনা সে বোধশক্তিও হয়ত নেই। মাস্টারমশায় আজ সব কিছুর মধ্যে একান্ত একাকী।

লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে থাকে। তার দৃষ্টি মৃত ভ্রাতার মুখের দিকে। মাঝে মাঝে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তবু বাড়ির অবশিষ্ট তিনটি প্রাণীর মধ্যে একমাত্র সে-ই নিজেকে ভেঙে পড়তে দেয় নি।

মৃণাল হারু মাস্টারের গা স্পর্শ করে।

—মাস্টারমশায়।

নিথর মাস্টার একইভাবে বসে থাকে। যেন প্রাণশূন্য দেহ কাঠ হয়ে গিয়েছে ওই অবস্থায়।

—আমি মৃণাল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাস্টার ফিরে চায়। মৃণাল অবাক হয়ে লক্ষ্য করে হারু মাস্টারের চোখদুটো লাল অথচ এক ফোঁটা অশ্রু নেই।

—মাস্টারমশায়, সবাই বলে কাঁদতে পারলে নাকি অসহনীয় দুঃখ সহ্য করবার মত হয়।

—আমি রোজই কাঁদতাম রে। লুকিয়ে কাঁদতাম। চোখে তাই জল নেই আর। ও বাঁচবে না, আমি অনেক আগে থেকে জানতাম। এ রোগে কেউ বাঁচে না।

—মাস্টারমশায়, চোখের জল কি সত্যিই ফুরিয়ে যায়? পথ বন্ধ হয়ে থাকে না তাহলে?

—কী জানি। হয়ত দুটোই ঠিক।

মৃণাল কথা খুঁজে পায় না আর। ভাবে, এ কী করছে সে? সান্ত্বনা দিতে এসে প্রশ্ন শুরু করেছে? এতে মাস্টারমশায় হয়ত দারুণ ব্যথা পাচ্ছে। সে হতভম্ব হয়ে মাস্টারের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

—লক্ষ্মী আর ওর মা কিছুই জানত না। ভাবত, ভাল খাওয়ালে ছেলের গায়ে রক্ত হবে, তা হয় না রে। সবাই জন্মায় মৃত্যুর জন্যে। খোকাও তাই জন্মেছে। শুধু পৃথিবীতে বড্ড কম সময় পেল সে। যেটুকু পেল সেটুকুও জ্বালা যন্ত্রণা সয়েই গেল।

—লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চাইতে পারছি না আমি। মনে মনে হয়ত কত কল্পনা করেছিল ভাইকে ঘিরে।

হারু মাস্টার একটু কেঁপে ওঠে। তারপর বলে,—ওর মায়ের কত কল্পনা ছিল। আগে থাকতে সে কল্পনাকে ভেঙে দিতে চাইনি। ভীষণ কষ্ট পেতাম রে। আজ বরং এক-দিক দিয়ে নিষ্কৃতি পেলাম।

হারু মাস্টার আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মায়ের কোল থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নেবার সময় আসে। পাড়ার দু-একজন চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা মুখ নীচু করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। এ-কাজ নিষ্ঠুর অথচ অপরিহার্য। মৃণাল জানে প্রাণহীন দেহে পচন ধরে। তার বাবা আর মায়ের দেহ যখন চিতায় ওঠানো হয়, তখন কাকাকে অবধি নাকে কাপড় দিতে হয়েছিল। ঘন ঘন থুথু ফেলেছিল কাকা। বাবা এবং মায়ের মৃতদেহ পেতে কেন যেন দু-একদিন দেরী হয়েছিল। তবু ওই দেহ দুইটি প্রদক্ষিণ করে মুখে আগুন দিতে বলা হয়েছিল তাকে। সে-ও দুর্গন্ধ পেয়েছিল। বুঝতে পারে নি প্রথমটা, কোথা থেকে আসছে সেই গন্ধ। ভেবেছিল শ্মশানের গন্ধ বুঝি। অহরহ যেখানে মৃতদেহ আনা হয়, সেখান থেকে সুঘ্রাণ বার হতে পারে না।

একগোছা প্যাকাটির আগায় আগুন ধরিয়ে সে প্রথমে তার বাবার মুখের কাছে সেই লেলিহান শিখা নিয়ে গিয়েছিল। বাবার মুখ সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাচ্ছিল। চাকার

ল্লায় পড়ে হয়ত অমন হয়েছিল। মায়ের মুখ কিছুটা চেনা যাচ্ছিল। তবে মায়ের াতগুলো বার করা ছিল। মায়ের ছোট ছোট দাঁত অনেক বড় দেখাচ্ছিল। আর চাখদুটো একটু খোলা ছিল। মৃণালের মনে হয়েছিল, মা বেঁচে উঠলেও উঠতে পারে। ওই খোলা চোখে তারই দিকে চেয়েছিল মা। তাই কাছে গিয়ে আগুন স্পর্শ করাতে দ্বিধাবোধ করছিল। পেছন থেকে কাকা তেড়ে উঠেছিল। সেই প্রথম বকুনি খেল াকার কাছে—জীবনে প্রথম।

ারু মাস্টারের স্ত্রীর কাছ থেকে ছেলেকে নিতে পারে না কেউ। শেষে মাস্টার নিজেই ওঠে। কাছে গিয়ে বলে,—ও বেঁচে গেছে সুমি। বড় কষ্ট পাচ্ছিল। তোমায় বলিনি মাগে, ও বাঁচত না। কলকাতার বড ডাক্তার একথা বলেছিল।

ড় বড় চোখে স্ত্রী চায় মাস্টারের দিকে। স্বামী তার এই দিনে মিথ্যে কথা বলছে? াত পুত্রকে সামনে রেখে? কলকাতায় তো নিয়ে যাওয়া হয় নি একে।

ওর রক্ত নেওয়া হয়েছিল, তোমার হয়ত মনে আছে সুমি। সেই রক্ত কলকাতায় াঠানো হয়েছিল। অভিলাষ ডাক্তার নিজে গিয়েছিলেন। এ-রোগে একজনও বাঁচে া। এ পর্যন্ত তেমন ঘটে নি। সেই ডাক্তারই বলেছিলেন। তাই আমি—

ুকরে কেঁদে ওঠে মাস্টারের স্ত্রী,—তুমি একা একা দিনের পর দিন জলে পুড়ে মরেছ গো।

—হ্যাঁ সুমি, অনেক চেষ্টাতেও তোমাকে বলতে পারিনি। এবারে ওকে ছেড়ে দাও। াকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছ সে তো নেই ওখানে। বরং ভগবানের কাছে প্রার্থনা র সে যেন নতুন দেহ নিয়ে ফিরে আসে তোমার কাছে।

ণাল মাস্টারের মুখের দিকে চেয়েছিল। এই মুহূর্তে এমন শান্তভাব সে কল্পনা করতে ারে নি। স্বামীর কথায় লক্ষ্মীদির মা যেন প্রবোধ পায়। কিন্তু শিশুকে টেনে নবার সঙ্গে সঙ্গে সে বিস্ফারিত নয়নে দুবাহু বাড়িয়ে জ্ঞানহারা হয়ে মাটিতে পড়ে ায়।

ক্ষ্মী এগিয়ে এসে মৃণালকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে। মৃণাল বিস্মিত হয় লক্ষ্মীর ান্নায় এতক্ষণে স্বর ফুটেছে। সেই স্বর অস্বাভাবিক বোবার কান্না নয়—সে স্বর মিষ্ট। কানে শুনতে পায় না বলেই হয়ত লক্ষ্মীদি জানে না বিলাপের ক্রন্দন কত কদর্য তে পারে।

শিশুটিকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে হারু মাস্টার কম্পিত হস্তে কোলে তুলে নেয়। মৃণাল াস্টারকে অনুসরণ করে। সে দেখতে পায় ক্ষেপা ঘোষও সঙ্গে সঙ্গে আসছে। মাসছে পাড়ার আরও অনেকে। ময়না অনেকটা পথ তার শীর্ণ শরীর নিয়ে সবার পছনে পেছনে চলতে থাকে। শেষে দেশী মদের দোকানের সামনে এসে থেমে পড়ে।

দোকানের কালো রঙের সাইন বোর্ডের ওপর সাদা লেখাটার দিকে একবার চায়; তারপর সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, যতক্ষণ না শবযাত্রীর দল অদৃশ্য হয়ে যায়।

ছয়টি মাস অতিবাহিত হয়।

একটি মফস্বল শহরের জীবনে ছয় মাস কিছুই নয়। ছয় বছর পরে সেই শহরে ফিরে এলেও মানুষ বাইরে থেকে এমন কিছু পরিবর্তন দেখতে পায় না। হয়ত দুচারটে নতুন বাড়ি তৈরী হয়, কিংবা যে রাস্তা বরাবর কাঁচা ছিল, তার পাশে খোয়ার স্তূপ জমা হয়েছে। অথবা খুব বেশী হলে ইঁটের রাস্তার ওপর পিচের প্রলেপ লক্ষ্য করা যায় কদাচিৎ। নতুন দোকান, নতুন রেস্তোরাঁর উদ্ভব হয় কখনো-সখনো। একটা বালিকা বিদ্যালয় হয়ত খুলল ছয় বছরের মধ্যে। হাসপাতালের দুটো ব্লক হয়ত বাড়ানো হল। তবে এসব বাহ্য। ভেতরটা অর্থাৎ শহরবাসীর পারিবারিক আর সামাজিক জীবনে কিন্তু ছয় বছরে খুবই ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তন ঘটতে পারে। যদিও সে-পরিবর্তন সম্বন্ধে কেউ তেমন সচেতন থাকে না। ভাবে, গতানুগতিক জীবন চলেছে তাদের—বৈচিত্র্যের শিহরণ নেই, উপভোগের আমেজ নেই।

কিন্তু ছয় বছর আর ছয় মাসে অনেক পার্থক্য। মাত্র ছয়টি মাসে শহরের অন্তর জীবনেও পরিবর্তন ঘটে না। ঘটেও নি। দরিদ্র শিক্ষকের রক্তহীন শিশুর মৃত্যু গোটা শহরের জীবনে সামান্য তরঙ্গেরও সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। হয়ত একটা বিশেষ গণ্ডীর ভেতরে কিছুটা আলোড়ন তুলেছিল—যে আলোড়ন খুবই ক্ষণস্থায়ী। হারু মাস্টার, তার স্ত্রী এবং লক্ষ্মীর হৃদয়ের গভীর ক্ষতচিহ্ন বাইরে থেকে দেখে আর বোঝবার উপায় নেই। সে ক্ষতের ব্যথা মাঝে মাঝে টন্‌টন্ করে উঠলেও, ওপরটা শুকিয়ে এসেছে।

মৃণাল যথারীতি রেল লাইনের ধারে ঘুরতে যায়। সেদিনও ঘুরছিল। পর পর কদিন বেশ বৃষ্টি হয়েছে। ফলে লাইনের আশেপাশে শুকনো মাঠ সবুজ হয়ে উঠেছে। জংলা গাছগুলোতেও জীবনের সাড়া। এখানে এলে আজকাল মা-বাবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সই-এর কথা মনে হবেই। কিছুতে ভুলতে পারে না। সে চায় না মনে করতে। সই-এর দুর্ব্যবহারের পর থেকে বাবা-মায়ের সঙ্গে তাকে ভাবতে চায় না। অথচ কতখানি আশা ছিল তার। দীপা মাসী তার শুকনো মনকে সঞ্জীবিত করত এককালে। জীবনের যে দুটি দিক তাকে অকারণ আশার আলো দেখাত, সে দুটি দিকের দুয়ার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দীপা মাসীও তার হৃদয়কে আর কোমল করে তুলতে পারে না। সে আর দীপা মাসীর বাড়ি যায় নি। সামনা সামনি দেখাও হয় নি। শুধু একদিন নদীর ধারে চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় দেখা

হয়েছিল দৈবাৎ। তার হাত দুটো চেপে ধরে কত করে যেতে বলেছিল বাড়িতে। সত্যিই কেঁদে ফেলেছিল অতখানি বয়সের মাসী। তবু সে যায় নি। যাবার ইচ্ছে এক একবার হয়েছে। বিশেষতঃ কাকার নির্যাতন যখনি চরমে উঠেছে, তথাপি আশ্রয়স্থল হিসাবে একমাত্র দীপা মাসীর বাড়ির কথাই মনে পড়েছে। তবু যায় নি সে। বাড়ির কাছাকাছি গিয়েও শেষ মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে চলে এসেছে। ওখানে যেতে হলে সান্ত্বনা লাভের জন্যে নীচু হয়ে যাবে না সে কখনো। উঁচু মাথা নিয়ে যাবে, যদি কখনো যায়। নির্যাতনের সদ্য চিহ্ন সর্বাঙ্গে ধারণ করে সহানুভূতি উদ্রেকের কারণ হবে না। তাছাড়া না গিয়ে গিয়ে সংকোচ এসেছে। তাইতে, মাথা উঁচু আর মাথা নীচুর প্রশ্ন ওঠে না।

একটা মিষ্টি-মধুর আওয়াজ শুনতে পায় মৃণাল। তারপর ঢক্ ঢক্—ঢক্ ঢক্ শব্দ। ট্রেন আসছে পেছন থেকে। লাইনের ওপর নেই সে। হারু মাস্টার তো ভবিষ্যৎবাণী করেই রেখেছে। লাইনের ওপর থেকে যেদিন সে নামবে না, অটল পাহাড়ের মত সাপের চোখের দিকে চেয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকবে—সেদিন তার জীবনের শেষ দিন।

হতেও পারে। তেমন দিন আসতে পারে বৈকি। কাকার উদ্যত লাঠি যখন তার ওপর ক্রমাগত পড়তে থাকে, তখন এক এক সময় হারু মাস্টারের কথাটা যে মনে হয় না, এমন নয়। মনে হয়, হারু মাস্টার মৃত্যুর অনেক সহজ এবং সুখের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই মনোভাব ক্ষণস্থায়ী। সর্বদেহে অসহনীয় ব্যথা থাকা সত্ত্বেও, কাকা তাকে ডানা কাটা জটায়ুর মত ফেলে রেখে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা সতেজ হয়ে ওঠে। মৃত্যুর কথা মনে থাকে না তখন। মনে হয়, আর দুটো বছর কোনরকমে কাটাতে হবে। ইস্কুলের সীমা পার হলেই জীবনের এক নতুন দিক উন্মোচিত হবে। তখন কাকার ওপর নির্ভর করতে হবে না।

ইলেকট্রিক ট্রেন চলে যায়। কত ছিমছাম্ গাড়িটা। স্টীম-ইঞ্জিনের গাড়িগুলো এমন নয়। অন্ততঃ সই-এর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরে আসবার সময় যে ট্রেনটি দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিল সেটি এমন ছিল না। সেদিন পাখীর জন্মদিন না হলে আজ বাবা এবং মা দুজনাই বেঁচে থাকত। অথচ পাখী মেয়েটি বেশ ভালই।

পাখী তার সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিতে চায় নি, মায়ের অমন ব্যবহারের পরেও। মৃণালের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এই রেললাইনের ধারেও আসতে চেয়েছিল। মানা করে দিয়েছিল সে। হারু মাস্টারের ভবিষ্যৎবাণী বলে, ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল। পাখীর সখ হয়ত মিটে গিয়েছে সে-সব কথা শুনে। নইলে আসলেও আসতে পারত একদিন অন্ততঃ। মায়ের দুর্ব্যবহারের জন্যে মনে মনে সে ব্যথিত হয়েছিল একথা ঠিক। হারু

মাস্টার বলে ছোটবেলায় মন থাকে নরম। যত বড় হওয়া যায় ততই সে মন রোদ-জলে শক্ত হতে শুরু করে। পাখীর মন এখনো নরম রয়েছে। ওই মন শক্ত হতে হতে ঠিক তার মায়ের মতই হয়ে উঠবে একদিন। ওর মায়ের মন কি বরাবরই অমন ছিল? মোটেই না। অমন থাকলে মা তার সঙ্গে সই পাতাতো না। কোমল ছিল বলেই তাকে ভাল লেগেছিল মায়ের। বরাবর যদি মানুষের মন একই রকমের থাকত কত ভাল হত। কাকীমার নাকছাবি এখনো চক্‌চক্ করত তাহলে। কাকা হাসত। সই-ও বদলাতো না। মায়ের 'বকুল-ফুল' পাতানো সার্থক হত। যদি গোড়া থেকেই সই-এর মন এমন কঠোর হত তাহলে মা কখনই ঘেঁষতো না তার কাছে। ট্রেনে কাটা পড়তে হত না বাবাকে সমেত। লাইনের এপারে কি আর সই-এর অভাব?

পাখীর কথা মৃণালের আজ বেশী করে মনে পড়ে। কাদা-মাখা দুই হাত দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গীতে বাগানের মধ্যে দাঁড়াবার ঢং ছবির মত চোখে ভাসে। সেই পাখীই কথা বলতে শুরু করল। বলল,—রোগা বাঘও বাঘ। মনে মনে বড় গর্ব হয়েছিল মৃণালের। অন্যের মুখে নিজের সম্বন্ধে এমন প্রশংসা সূচক মন্তব্য জীবনে আর সে শোনে নি। হাবলু এবং মাস্টারমশায়েরা অবশ্য কথায় কথায় বলে, সে খুব ভাল ছেলে। কিন্তু ওকথার মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব সে খুঁজে পায় না, যা তার মনকে ভরিয়ে দিতে পারে। পাখীর ছোট্ট কথাটি কিন্তু পেরেছিল বেশ, নতুন ধরনের কথা কিনা। তারও মনে হয়েছিল, সত্যিই তো, বাঘ রোগা হলে কি আর শেয়াল হয়ে যায়? তা যায় না। আবার শেয়াল যদি কোন কারণে খুব মোটা হয়ে গেল ধর, তবে সে এমন কিছু বাঘ হয়ে যাবে না।

পাখী হয়ত এসেছিল লাইনের ধারে তার মানা সত্ত্বেও। বোধহয় এমন দিনে এসেছিল যেদিন সে আসে নি। আজও মৃণাল তাই ওদিককার রাস্তার দিকে তাকায়। এবং অবাক হয়ে ভাবে, যতদিন সে এসেছে, প্রতিদিন নিজের অজ্ঞাতে একবার ওদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েছে।

আকাশ কালো হয়ে আসে। বৃষ্টি শুরু হবে আবার। মৃণাল লাইন ছেড়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করে। কিছুদূর গিয়ে প্রিন্সিপ্যালের ছেলে কেষ্টর সঙ্গে দেখা। বাঁ চোখ টিপে কেষ্ট হাসে। মৃণাল ডান চোখটা টিপে উত্তর দেয়।

—আরে শ্লা—দারুণ দিলি তো একখানা। আয় চা খাবি?

—না।

—শোন্ না। তোর লক্ষ্মীদি সব সময় বাড়ির মধ্যেই বসে থাকে নাকিরে?

মৃণালের ভেতরটা শক্ত হয়ে ওঠে। বলে,—হারু মাস্টারকে জিজ্ঞাসা ক'রো।

উত্তেজিত কেষ্ট বলে,—কেন, তুই জানিস না?

—জানলেও বলব না।

—ছাখ্, মৃণাল, আমাকে চিনিস না।

—মারবে নাকি?

—আলবৎ।

মৃণাল রুখে দাঁড়িয়ে বলে—আমিও মারতে জানি।

কেষ্ট খপ্ করে মৃণালের হাত ধরে পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেয়। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায় মৃণাল। তবু মুখ দিয়ে শব্দ বার হয় না।

বিকৃত মুখে কেষ্ট বলে ওঠে—এবারে?

—জয়-মা-কালী স্টোর্সের জীবনদাকে খবর দেব বলছ?

—কিসের খবর?

—সে না থাকলে মাস্তুদি তোমায় ডাকে—

কেষ্ট হিংস্রভাবে মৃণালের হাতটা মুচড়ে দিতে থাকে।

মৃণাল বসে পড়ে।

—বলবি শ্লা, আর কখনো?

—হ্যাঁ।

—তবে রে—

মৃণাল মাটিতে পড়ে যায়। যত যন্ত্রণাই হোক কিছুই অসহনীয় নয় তার কাছে। সে অভ্যস্ত। কিন্তু একটা জিনিস সে উপলব্ধি করল পথের ধুলোয় নাক ডুবিয়ে। কাকা অত্যাচার করলে প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা জাগে নি কখনো। অথচ কেষ্টর বেলায় জাগছে। মনে মনে ঠিক করে রাখে এর বদলা সে নেবেই। বুঝিয়ে দেবে, রোগা বাঘও বাঘ—শেয়াল নয়।

ষ্ট তার হাত ছেড়ে দিয়ে একটা লাথি মেরে বলে,—যা আজ ছেড়ে দিলাম।

াল ছিট্‌কে দূরে সরে গিয়ে একটা ইটের টুক্‌রো তুলে নেয়। কেষ্ট থমকে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে মৃণালের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে কিংবা একটা কিছু তুলে তে গেলেই সে জখম হবে। হতভম্ব হয়ে পড়ে।

-তুই মারবি?

ালের চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। দুজনাই পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

াল টুক্‌রোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে,—না! আজ না। তোলা রইল।

মাথাটাকে উঁচু করে এগিয়ে চলে। পেছনে একবারও ফিরে চায় না।

তক্ষণে বৃষ্টি নামে। বড় বড় ফোঁটা। মৃণাল দৌড়োতে থাকে। মাস্তুদির বাড়ি

অতিক্রম করবার সময় একবার ইচ্ছে হয়, ভেতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ওখানে যাবে না সে। ওখানে কেউ আসবে।

দীপা মাসির বাড়ির কাছাকাছি আসতে সর্বাঙ্গ ভিজে যায়। কতদিন যে এইভা দৌড়োতে দৌড়োতে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গিয়ে মাসীকে অবাক করে দিয়েছে। আ যেতে পারে না : রাজ্যের সংকোচ।

—মৃণাল।

দীপা মাসী দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে লক্ষ্যই করে নি আগে।

—আমার মাথা খাস্—ভেতরে আয়।

মাসীর কথা মত ভেতরে সে যেতে পারে না। দীপা মাসী বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে ছুটে ছুটতে এসে তার হাত চেপে ধরে বলে—চল্।

মৃণাল সঙ্গে যেতে যেতে বলে—কর্তাটি কোথায় ?

—সে নেই। কিন্তু তার জন্যে তো আসা বন্ধ করিস নি। আসা বন্ধ করেছিস আম জন্যে। আমি কর্তার চেয়েও খারাপ—তাই না রে ?

ঠিক যেন মনে হয়, দীপা মাসী কাঁদতে কাঁদতে কথাগুলো বলল। বৃষ্টির জল মুখের মে গিয়ে কথাগুলোকে বোধহয় অমন ভিজিয়ে দিয়েছে।

ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে মৃণালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থা দীপা মাসী। মৃণালও না চেয়ে পারে না। সে লক্ষ্য করে মাথার চুলের মধ্যে দি জল গড়িয়ে গাল বেয়ে পড়ছে। দু-একটি ধারা চিবুকের কাছে এসে গলা দিয়ে নে গিয়ে ভিজে ব্লাউজকে আরও ভিজিয়ে দিচ্ছে। দীপা মাসী আগের মতই রয়েছে।

—কত দিন পরে এলি।

দীপা মাসী সহসা মৃণালকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে।

দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে মৃণাল অতবড় দেহের সবটুকু ভার সহ্য করে যায়। ভাবে, পেট কে বার করলে বোধহয় মেয়েরা লম্বা আর ভারী বেশী হয়। কিন্তু কাঁদছে কেন দী মাসী ? আনন্দে নাকি ? তার তবে অন্যায় হয়েছিল বুঝতে হবে, এতদিন না এ মাসী ভাল তেল মাখে মাথায়। মাসীর চুলের ঘষায় তার সারা মুখ সুন্দর গন্ধে ভ গেল। তেল আর জলে মাখামাখি। দূরে সরে যেতে ইচ্ছে হয় মৃণালের। দাঁড়িয়ে থাকে। মাসী তাকে ভালবাসে ঠিকই।

তার কানের কাছে বারবার ফিস্‌ফিস্ করে ডাকে মাসী,—অজয়। ঠিক অজয় তুই

—সে আবার কে ?

মাসী পাগলের মত হাসে। কাঁদতে কাঁদতে হেসে বলে,—অজয়ই তো ?

-কে, তাই বল না

—ধর্ তুই। যদি মৃণাল নামে না ডেকে, বলি অজয় ?

—আমি চলে যাব। মৃণাল নামটা বাবার দেওয়া। তোমার খেয়াল খুশী মত যা তা ডাকলেই তো চলবে না।

—বেশ, মৃণালই। হল তো ? এবারে জামা প্যাণ্ট ছাড়তে হবে না ?

—কি পরব ?

দীপা মাসী হেসে বলে,—আমার একটা শাড়ি। ওগুলো উনুনের কাছে রেখে শুকিয়ে দিচ্ছি।

—আমি শাড়ি পরব না।

—তবে ?

—আমি ভিজে প্যাণ্ট পরেই থাকব।

—অসুখ করবে যে পাগল। কর্তার ধুতি পরবি ?

নাক সিঁটকে মৃণাল বলে—নাঃ।

—তবে ?

-আমিই বরং উনুনের কাছে গিয়ে বসব।

মাসী একটু ভেবে নিয়ে বলে,—বেশ তাই চল্। বাবুর যা রাগ। পান থেকে চুন খসলেই বিপদ।

—শুধু শুধু আমার রাগ হয় না।

-তা জানি। কিন্তু আমার মনটা দেখবি না ? আত্মসম্মানই সব ? আত্মসম্মান কার কাছে দেখাতে হয় রে ? আমার কাছে ?

মৃণাল একটু ভাবে। সত্যিই তো, যে তার জন্যে এতটা উতলা তার কাছে সেদিনের ব্যবহার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল বৈকি। পৃথিবীতে আর কোথাও এতটা জোর সে কখনো করতে পেরেছে ?

মাসীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই যেন সে বলে,—তুমি আমার পিঠের জামা তুলে দেখতে পার।

—তার মানে ?

—কত মার খেয়েছি, তার চিহ্ন দেখে চোখ দুটো সার্থক করতে পার। তবে একটা কথা দিতে হবে।

মাসীর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। সে বলে,—কী কথা দেব বলে দে।

—আহা উহু করা চলবে না।

উনুনের কাছে গিয়ে মৃণাল নিজেই তার জামা খুলে ফেলে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে,—এই দেখ।

দীপা মাসী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মৃণাল জানত মাসীর চোখ জোড়া অমন হবে। এমন কি এই অসংখ্য ক্ষতচিহ্নের যে স্রষ্টিকর্তা, সেই কাকার সামনে জাম খুললে, সে-ও চমকে উঠবে। তাই সে খালি গায়ে থাকে না। জামা ছিঁড়ে গেলেও পরে থাকে। স্নান করে সবার অলক্ষ্যে।

মাসী সন্তর্পণে সারা গায়ে হাত বুলিয়ে চলে। দাঁত দিয়ে জোর করে নীচের ঠোঁ কামড়ে ধরে। তারপরে ছুটে বার হয়ে যায়।

মৃণালের ছোট দাঁতের পাটি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। মাসী কথা রাখছে। আহা উঃ করবে না। মাসী তাকে ভয় পায়। মেয়ে মাত্রেই ভীতু। বয়সের বাছ-বিচার নেই টিটুকে ইচ্ছে করলে সে ভয় দেখাতে পারে। কাকীমাকেও পাবে। তবে দেখাতে ঘৃণা হয়। নিজেকে ছোট মনে হয়, মানুষের দুর্বল দিকের সুযোগ নিতে।

মাসী একটু পরে ফিরে আসে রান্নাঘরে। ভিজে চুল আঁচড়ে, ভিজে কাপড় আর ব্লাউজ ছেড়ে মুখে পাউডার বুলিয়ে মাসী ফিরে আসে। চোখে জল নেই। বর মুখে একটা অস্পষ্ট হাসি। মৃণালকে কাছে টেনে নিয়ে বলে,—আমি কথা রেখেছি এবারে তোকেও একটা কথা দিতে হবে।

মাসীর গায়ের সুঘ্রাণ ভাল লাগে। তার মুখও বেশ সুন্দর দেখায়। মৃণাল বলে,—বলো।

—দিবি কিনা বল্।

—দেব।

—এবার থেকে আমি যা-ই করি না কেন, এখানে আসা বন্ধ করতে পারবি না।

মৃণাল চুপ করে থাকে।

—চুপ করে রইলি কেন? কথা দিবি না?

—তুমি যা খুশী করবে?

—হ্যাঁ, করবই তো। যাকে ভালবাসা যায়, তাকে সব কিছু করা যায়। বুঝতে পারিস না, তোকে আমি কত স্নেহ করি?

—তা বুঝি।

—বুঝিস! সত্যি কথা বলছিস মৃণাল?

—এটা বুঝতে পারা এমন কি কঠিন?

—তুই বুঝিস তবে? তবু আসিস না? তুই এত নিষ্ঠুর হয়েছিস?

—নিষ্ঠুর-ফিষ্ঠুর বুঝি না। কথা দিলাম, এখানে আসা বন্ধ করব না।

—যাক্ নিশ্চিন্ত হলাম। হ্যাঁরে, আমি যেমন তোকে ভালবাসি, তুই কি আমা তেমনি ভালবাসিস?

—মৃণাল মনে মনে বিরক্ত হয়। দীপা মাসীর সব তাতেই বড় বেশী চেপে ধরবার স্বভাব। অল্পে সন্তুষ্ট নয়। হাত দিয়ে সে তার জামা দেখে—প্রায় শুকিয়ে এসেছে। কিন্তু প্যাণ্ট আগের মতই জবজবে। এভাবে পরে থেকে প্যাণ্ট শুকোবে না। টিপলে এখনো জল গড়াবে। তবু সে কিছু বলে না। বললেই একটা শাড়ি কিংবা কর্তার ধুতি আনতে চাইবে।

—কথা বলছিস্ না কেন? ভালবাসিস না?

—কী জানি।

—কাউকে তোর ভাল লাগে না?

—লাগবে না কেন?

—কাকে,—কাকে ভাল লাগে রে?

—হাবলুকে এখনো ভাল লাগে।

—আর? আর কাকে?

মৃণাল দেখতে পায় দীপা মাসীর চোখে তীব্র কৌতূহল ফুটে উঠেছে। সে বুঝতে পারে না, এই সব সামান্য কথায় অত আকুল হয়ে ওঠে কেন মাসী। সব মেয়েরা যেমন ভীতু হয়, তেমনি এটাও বোধহয় তাদের স্বভাব।

—বল্ না দুষ্টুটা। অমন গম্ভীর হয়ে আছিস কেন?

—আমি কোথাও যাই নাকি?

—আমাকে ভাল লাগে না?

—লাগবে না কেন? না লাগলে, ডাকলে আসতাম নাকি?

—আমায় তবে ভালবাসিস খুব?

মৃণাল চুপ করে থাকে। খুব ভালবাসে কিনা সে জানে না। তবে দীপা মাসীকে তার খারাপ লাগে না।

মৃণাল দেখে মাসী তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, তার জবাবের অপেক্ষা করছে। তাই একটু ভেবে চিন্তে বলে,—আমার নিজের মাসী নেই, নিজের কাকা-কাকীমারা রয়েছে। তাদের ঘৃণা করি। শুধু লক্ষ্মীদিকে ভালবাসি। তোমাকেও বাসি নিশ্চয়।

—যাক্ নিশ্চিন্ত হলাম। যেভাবে শুরু করেছিলি, ভাবছিলাম বিচারক বুঝি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেয়।

মাসীর কথা মৃণালের কানে যায় না। সে ভাবে হাবলুর কথা। হাবলুকে এখনো সে ভালবাসে। যদিও সে আগের হাবলু নেই। সরল বলেই অমন হয়েছে। আজকাল সে মৃণালকে বই দিতে চায় না। কেন দিতে চায় না, সে কথাও ফস্ করে বলে

দিয়েছে একদিন। বই দিলে সে মৃণালকে ডিঙিয়ে ফার্স্ট হতে পারবে না। কথাটা বলেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল হাবলু। মৃণাল জানে বুদ্ধিটা তার নিজের নয়। তবু মারাত্মক আঘাত পেয়েছিল সে। তাই শত চেষ্টা সত্ত্বেও হাবলুদের বাড়িতে আর যেতে পারে না। কাকার অত্যাচারে এক ধরনের ব্যথা সহ্য করতে হয়; কিন্তু হাবলুর এই সামান্য কথা কাকার দশ দিনের অত্যাচারের চেয়েও বেশী বলে মনে হয়েছিল তার কাছে। কাকার অত্যাচার বন্ধ হলেই ভুলে যাওয়া যায়। অথচ হাবলুর ওই কথা কয়টি তাকে হামেশাই অন্যমনস্ক করে দেয়। কেন যে হাবলু অত সরল হল।

—কিরে, কী ভাবছিস?

—কিছু না, মাসী।

বর্ষায় ভরা-নদী।

এপার উঁচু। কিন্তু ওপারের কূল ছাপিয়ে জল চলে গিয়েছে অনেক দূরে। মাঠের মধ্যে দিয়ে ক্ষেতের সর্বনাশ করে গ্রামগুলোকে গ্রাস করেছে বলে মনে হয় দূর থেকে। ওদিকে চেয়ে থাকতে মৃণালের ভাল লাগে। এত জল সে গত বছর দেখে নি। এবারে বন্যা বেশী হয়েছে। ওই সব গ্রাম থেকে লোকেরা দলে দলে নৌকো করে শহরে আসে। তাদের অনেকে ভিক্ষে করে, অনেকে নুন, তেল ইত্যাদি কিনে নিয়ে আবার ফিরে যায়। ওদের মুখে শুনেছে মৃণাল অশেষ দুর্গতির কথা। তাই দূরের গ্রামগুলোর দিকে চেয়ে থেকে থেকে বিষাদে মন তার ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তবু ভাল লাগে চেয়ে থাকতে—বন্যার রূপ দেখতে।

রেল লাইনের দিকে কদিন যাওয়া হয় নি। নদীর ধারে এসে ক্ষেপা ঘোষের মিউনিসিপ্যালিটির লক-গেটের পাশে উঁচু বাঁধানো জায়গায় চুপচাপ বসে থাকার একটা নেশা রয়েছে। অনেকেই আসে নদীর জল দেখতে। কিন্তু তার বয়সী কাউকে বড় একটা দেখা যায় না। আগে হলে হাবলু সঙ্গ ছাড়ত না। এখন তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন সে দেবুর দলে, মল্লিকদের ছেলে সুশান্তর দলে। তাকে দেখতে পেলে হাবলু সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। মুখে কিছু বলতে পারে না। অথচ মনে মনে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছে। মৃণাল বই চেয়ে বসবে বলে ভয় হয়ত। বোঝে না, এক দিনের কথাতেই বই চাইবার সাধ জন্মের মত মিটে গিয়েছে।

জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মৃণাল হঠাৎ লক্ষ্য করে তারই বয়সী একটি ছেলে তালের ডোঙা নিয়ে এপার ঘেঁষে এগিয়ে আসছে। দুর্দান্ত সাহস বলতে হবে ছেলেটার। তোলপাড় করছে যে নদী, তাতে তালের ডোঙায় চাপা কম সাহস নয়। সাঁতার

জানলেই বা কি ? স্রোতের টান কম নয়। সাঁতার জেনে লাভ ?

ছেলেটি লক-গেটের কাছে এসে, একটা লোহার রড চেপে ধরে হেসে বলে—কিরে, ওভাবে হুতুম পেঁচার মত বসে আছিস যে ?

—কি করব ?

—ডোঙায় চড়বি ?

—উল্টে যাবে। অভ্যাস নেই।

—থাক্ বসে তবে।

—তুই কোথায় যাচ্ছিস্ ?

—জানিনে।

—ফিরবি কি করে ?

—এই ভাবেই। চলি।

—দাঁড়া।

ছেলেটা এবারে মৃণালকে ভালভাবে লক্ষ্য করে। মৃণাল লক-গেটের বাঁধানো জায়গা থেকে ধীরে ধীরে নেমে ডোঙার সামনে গিয়ে বলে—চল্, আমিও যাবো।

—এই না বললি, অভ্যেস নেই।

—কারই বা থাকে ? তোর ছিল ?

—না থাকলে এমনিতে চুরি করলাম ডোঙাটা ?

—চুরি ?

—তবে কি বাপের ডোঙা ভেবেছিস্ ?

—তোর মুখখানা দারুণ তো।

ছেলেটা হো হো করে হেসে বলে—কিছুই তো শুনিস নি। মুখ খুললে কানে তালা বন্ধ করতে হবে। নে যাবি তো উঠে পড় চট্‌পট্।

মৃণালের পছন্দ হয় ছেলেটিকে। ওরই বয়সী, অথচ বাহুদ্বয় বলিষ্ঠ। মুখের কোন আগল নেই। স্বভাব বেপরোয়া। এমন একজন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের।

মৃণাল ডোঙায় এক পা দিতেই সেটা কাত হয়ে পড়ে একদিকে। তাড়াতাড়ি আবার পা উঠিয়ে নেয়।

ছেলেটা বলে,—নাঃ শালা। তোর দ্বারা হবে না। প্র্যাক্‌টিস দরকার। চলি।

—তোর বাড়িটা কোথায় বলে যা। প্র্যাকটিস্ করতে যাব।

—শহরে না। আজমপুর গাঁয়ে। এখান থেকে পাক্কা আড়াই মাইল।

—অনেক দূর চলে এসেছিস তো ? এবারে বাড়ি ফিরে যা।

—আরে যাঃ। তোর নামটা বললি না তো ?

—মৃণাল।

—বাঃ বাঃ, বেড়ে—। আমার নাম কি জানিস?

—গদাধর।

—ধুঃ শালা। ওর চাইতে ভাল। বঙ্কিমচন্দ্র। সেই সাহিত্যিক ফাহিত্যিক না কি ছিল একজন? তারই নামে নাম।

—তোর বাড়িতে যাব একদিন।

—যাস্। তোকে দেখেই প্রাণের বন্ধু বলে মনে হচ্ছে মাইরি।

—আমারও ঠিক তাই রে বঙ্কা।

—আরে, তুই আমার ডাক নাম জানলি কি করে?

—বঙ্কিমচন্দ্রের সট্‌কাট্।

—তোর শালা মগজে বুদ্ধি আছে। ঠিক যাস্ কিন্তু আমার বাড়িতে। আজমপুর। এখন গিয়ে লাভ নেই। জলের তলায়। শুকনো হলে যাস্। হাঁ করে আছিস কেনরে শালা? যাবি তো?

মৃণাল ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি জানায়।

ডোঙা আবার এগোতে থাকে। ধীরে ধীরে ছোট হয়। শেষে একেবারে মিলিয়ে যায়।

হারু মাস্টার বলে, আমরা নাকি সংসারে স্রোতের টানে ভেসে চলেছি। স্রোতের বিরুদ্ধে থাকার চেষ্টা করেছ কি মরেছ। হারু মাস্টার কত কথা বলে। সব কথা মৃণাল বুঝতে পারে না। অল্পই বোঝে। তবু হারু মাস্টারের কথা শুনতে তার ভাল লাগে। অন্যান্য ছেলেরা আড়ালে হাসে মাস্টার কথা বলবার সময়। কিন্তু সে হাসতে পারে না।

হারু মাস্টার একটু থেমে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে,—তাই বলে কি স্রোতের বিরুদ্ধে যাবার চেষ্টা করবে না কেউ? করবে বৈকি? আঘাত সইবার, কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা রয়েছে যাদের তারাই করবে। স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া অধিকাংশ সময়ই পরাজয়ের নামান্তর। বিবেক, উদ্দম আর মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে এ-ও এক ধরনের সস্তা শান্তি লাভের নেশা।

মৃণাল এক ঝাঁক কচুরিপানার দিকে চেয়ে থাকে। ছুটে চলেছে স্রোতের টানে কিছুক্ষণের মধ্যেই বঙ্কার ডোঙাকে হারিয়ে দেবে। ডোঙার গতি এত তীব্র নয়। অথচ হারু মাস্টারের কথা মানতে গেলে কচুরীপানার ঝাঁকটির মনের জোর নেই। থাকলে স্রোতের উল্টোদিকে চলবার চেষ্টা করত। বঙ্কার ডোঙা যখন উজানে আসবে তখন স্রোতের বাধাকে ঠেলতে.হবে। মনের জোরের পরিচয়। কিন্তু এটা হ'ল সত্যিকারের

দী। হারু মাস্টার বলে সংসার-নদীর কথা।

—কি রে মৃণাল? ঢেউ গুন্‌ছিস একা বসে?

দবু, সুশান্ত আর হাবলু হি হি করে হাসছে রাস্তা থেকে।

—এটা সমুদ্র নয়। ঢেউ নেই।

সুশান্ত বলে—ওঃ, তাই তো। ফার্স্ট বয়ের সঙ্গে কথা বলতে হলে ভেবে চিন্তে বলতে হয়।

ওরা এগিয়ে এসে তার কাছে দাঁড়ায়।

হাবলু হঠাৎ বলে ওঠে,—জানিস, দেবুটা প্রেমে পড়েছে।

মৃণালের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। এর মধ্যে বেশ পেকে উঠেছে তো? গম্ভীর হয়ে বলে—কথাটার মানে জানিস?

বন্ধুদের সাক্ষী মেনে হাবলু বিদ্রূপের স্বরে বলে ওঠে,—দেখ্‌ দেখ্‌, কী বলছে তোদের ফার্স্ট বয়। প্রেম কথার মানে জানিনে? ভালবাসা—

—হাবলু, তুই তোর বাবা মাকে ভালবাসিস। সেটাও কি প্রেম?

দেবু আর সুশান্ত হাসিতে ফেটে পড়ে। হাবলু ফ্যাকাশে মুখে বলে—তোরা হাসছিস্?

দেবু বলে,—তবে কি কাঁদব? কেমন দিলে একখানা। টপ্‌ ক্লাস মাইরি।

হাবলু বলে,—তোরা আমাকে বলতে বললি কেন?

দেবু বলে—মৃণালটা সবজান্তা। ওর কাছে গ্যাস দেওয়া চলবে না। চ—চ।

ওরা হাবলুর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে। 'না' বলবার সাধ্য নেই বেচারার। 'না' বলতে যতটুকু ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন মনের, সে ক্ষমতা হাবলুর নেই, তাই সে কচুরী-পানার মত স্রোতের টানে ভেসে চলল।

ক্ষপা ঘোষ পুরোনো বাক্স প্যাঁটরা ঘাঁটতে শুরু করল একদিন সকালে উঠে। পৈত্রিক আমলের বাক্সগুলি। অব্যবহার্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে ছাগলের ঘরের পাশে আর একখানা ছোট্ট ঘরে।

ময়না এসে বলে,—ওখানে কি করছ?

—একটা জিনিস খুঁজছি।

—সাপটাপ থাকতে পারে—

—কামড়ালে তো বেঁচে যাও।

ময়নার মুখ সাত সকালেই কালো হয়ে ওঠে। কয়েকদিন হল তার পেটের ব্যথা বেড়েছে। শরীর খুব দুর্বল। কথা কইতেও কষ্ট হয়। সে ধীরে ধীরে চলে যায়

রান্নাঘরের দিকে। ক্ষেপাকে দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে হবে। সাড়ে নটার মধ্যে খেয়ে মিউনিসিপাল অফিসে ছুটবে।

তন্নতন্ন করে খুঁজে শেষে হারানো মানিক পেয়ে যায় ক্ষেপা। সেটিকে একটু মেলে ধরে আপন মনে বলে ওঠে,—এঃ, পোকায় কেটে কিছু রাখে নি দেখছি। স্বয়ং ভগবান কাটিয়েছেন।

—সারা দেশের এই দশা। সারা দেশকে পোকায় কেটেছে।

ঘর থেকে বার হতেই ময়না এগিয়ে এসে বলে—কী ওটা?

—চিনতে পারো? দেখিয়েছিলাম তো একদিন। সেদিনের সব কিছুই নাকি মেয়েদের চিরকাল মনে থাকে। অবিশ্যি তুমি আবার মেয়েও নও মানুষও নও। তবু ফুলশয্যা তো হয়েছিল। দেখ তো চিনতে পার কিনা?

ময়না জিনিসটাকে চিনতে না পেরে, নিজেকে অপরাধী বলে ভাবে। সে অপেক্ষা করে, ক্ষেপার আরও বিষ মেশানো মন্তব্য শোনবার জন্যে। ঝাল ঝেড়ে যদি শান্ত হয় স্বামী, হোক।

ক্ষেপা কিন্তু কিছুই বলল না। বরং সামান্য একটু তুচ্ছতা অথচ একটা আবেগ মিশিয়ে বলে,—কংগ্রেস ফ্ল্যাগ।

এইবারে মনে পড়ে যায় ময়নার। ফুলশয্যার রাতে চোখে মুখে কত উজ্জ্বলতা, কত উৎসাহ নিয়ে ওটিকে দেখিয়েছিল সেদিন। বলেছিল,—এইটি হাতে নিয়ে, আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম ময়না। পুলিশের লাঠি আমার মাথায় পড়ল। তবু ফ্ল্যাগ ছাড়িনি। আঁকড়ে ধরে রেখেছিলাম যতক্ষণ জ্ঞান ছিল। তাই আমাদের সেদিনের নেতা নৃসিংহ মুখার্জি ওটি রেখে দিয়েছিলেন। আমি ফিরে এলে তিনি সাগ্রহে বললেন,—এটি তোমার কাছে রাখো ক্ষেপা। আজীবন তোমার সঙ্গী, তোমার গর্ব হয়ে থাক।

ক্ষেপার মুখের দিকে চায় ময়না। স্বামীর প্রতি সহানুভূতিতে বুক তার ভরে ওঠে। সে শুনেছে, মাতাল অবস্থায় ক্ষেপা স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক কাহিনী আপন মনে বলে চলে। কিন্তু আসলে এ-ব্যাপারে এক বিন্দু মোহ নেই, সে আশাহত। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সে একটিবারও ও নাম উচ্চারণ করে না। এমন কি সেদিনের নেতা আজকের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নৃসিংহ মুখার্জির নাম উচ্চারণ করবার আগে নামের পাশে যে-কোন একটা খারাপ ধরনের বিশেষণ না বসিয়ে পারে না। কারণ নৃসিংহ মুখার্জি পরের ধনে পোদ্দারী করতে করতে এখন শহরে তিনখানা বাড়ি বানিয়েছে, কয়েকটি মোটা-লাভের ব্যবসা ফেঁদেছে। তার দুটো বাস-রুট, দুটো কাঠগোলা, একটা সুরকীর কল, পাঁচখানা লরী, একটা জিপ এবং দুটো প্রাইভে

কার। গাড়িতে ঘুরে ঘুরে এমন বিশাল চেহারা হয়েছে যে ডাক্তারের উপদেশানুসারে প্রতিদিন সকালে নদীর ধারে ঘণ্টা খানেক পায়চারী করতে বাধ্য হয়। ওষুধে কুলোয় না।

ময়না শান্ত চোখে চেয়ে থাকে স্বামীর দিকে। ক্ষেপা ঘোষ কিছুক্ষণ ফ্ল্যাগটা দুহাতে মেলে ধরে রইল। তার সক্রিয় মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া কিছু দেখা গেল না। শেষে ফ্ল্যাগটাকে উঠোনের কাপড় মেলবার তারের ওপর রেখে বলে,—সাত সকালেই গিলতে হল দেখছি।

সে বোতল আনতে ঘরে যাবার উপক্রম করতেই ময়না বলে ওঠে,—এখন আবার ওসব ছাইভস্ম খাচ্ছ কেন?

—তোমার পিণ্ডি চট্‌কাতে।

তবু ময়না নির্বিকার কণ্ঠে বলে,—অফিস আছে যে—

—আজ যাব না অফিসে। আজ বিসর্জনের দিন।

ময়না বুঝে উঠতে পারে না ক্ষেপা ইতিমধ্যেই কিছু গিলেছে কিনা। তেমন তো মনে হয় না। তবে কেন বিসর্জনের কথা তুলল? পুজোর এখনো দিন পনেরো বাকী রয়েছে।

ক্ষেপা অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকে। ময়না রান্নাঘরে গিয়ে উনোনের জ্বলন্ত কাঠ তুলে তাতে জলের ছিটে দিয়ে নিভিয়ে ফেলে। শুধু শুধু এত তাড়াতাড়ি ভাত রেঁধে লাভ নেই। মানুষটা অফিসে যাবে না আজ। মাতাল হয়ে বাড়ি থেকে বার হলে কখন ফিরবে তারও স্থিরতা নেই। হয়ত সারাদিন ফিরবেই না। কোথায় গিয়ে পড়ে থাকবে ঠিক কি? এখন আর কেউ রাস্তা থেকে তুলে এনে বাড়ি পৌঁছে দেয় না। প্রথম প্রথম দিত। এখন হুঁশ হলে নিজেই ফিরে আসে ভোরায়। এসে ধন্দ ধরে বসে থাকে—একটাও কথা বলে না।

ক্ষেপা ঘর থেকে বার হয়ে আসে—বেশ কিছুক্ষণ পরে। সে একটু একটু টলে। ময়না রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে ভয়ে। বাড়িতে মদ খেলেও সে কখনো মাতাল হয় না। মাতাল হয় বাইরে গিয়ে।

ক্ষেপা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে উঠোনের তার থেকে ফ্ল্যাগটা তুলে নিয়ে বলে,—চল্, তোকে বিসর্জন দিয়ে আসি। ডাক্ ড়ুমা ড়ুম্ ড়ুমা ড়ুম্। চল্ দুগ্‌গা জলে চল্। ক্ষেপা ঢাকীদের নকল করে একটু একটু নাচবারও চেষ্টা করে। কিন্তু পড়ে যাবার উপক্রম হলে নিজেই সামলে নেয়।

ময়না ছুটে এসে সাশ্রু নয়নে বলে,—এভাবে তুমি বাইরে যেও না।

ফ্ল্যাগটাকে মাথায় নিয়ে ক্ষেপা বলে,—কেন? বিসর্জন দেব না?

—পরে দিও।

—না। আমি যাব। তুমিও চল না? তোমাকেও দিয়ে আসি জলে। সাক্ষাৎ মা দুগ্‌গা তুমি। মা হয়েই রইলে বাবা। বউ আর হলে না। চল্। দুটোকে ভাসিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরি। ফ্ল্যাগ আর তুমি। তুমি-আর ফ্ল্যাগ। বিগত-যৌবনা ফ্ল্যাগ আর অনাগত-যৌবনা তুমি। বাঃ সুন্দর।

ক্ষেপা বার হয়ে যেতেই ময়না দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে উঠোনের মাঝখানে ক্রন্দনরতা অবস্থায় বসে পড়ে।

ক্ষেপা চলতে থাকে নদীর দিকে। ভাসিয়ে দেবে কংগ্রেস পতাকা। কোন মোহ নেই আর। নৃসিংহ মুখার্জির মত মানুষ যার নেতা, তার মত নচ্ছার যার দৌলতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, সে জিনিসে মোহ থাকতে পারে না। হারু মাস্টারের মত ব্যক্তির যে-রাজত্বে সুখ নেই, সেটা রাম-রাজ্য নয়, রাবন-রাজ্য নয়—কংস-রাজ্য।

পুরোনো শতচ্ছিন্ন পতাকাকে দলা পাকিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বিড়বিড় করে ক্ষেপা—কিন্তু তবু তোকে ভালবাসি। তুই আমার পুরোনো দিনের সাক্ষী। তোর যখন সুদিন ছিল, তখন নৃসিংহ শালার মধ্যেও একটু দেশাত্মবোধ ছিল। তাই তোকে আজও ভালবাসি। ভাল না বাসলে নদীর ধারে বয়ে নিয়ে যেতাম ভাবছিস? সেই গুড়ে বালি। পুড়িয়ে ফেলতাম। স্রেফ আগুন ধরিয়ে দিতাম। তোকে মা দুগ্‌গার মত বিসর্জন দেব মাইরি। কিন্তু তারপর? তারপর কী নিয়ে থাকব? ময়না থেকেও নেই—তুইও নেই। কী নিয়ে থাকব? সব ফাঁকা—। ছেলে ছোকরারা সবাই লাল ফ্ল্যাগ নিয়ে ইনক্লাব করে। লালের ওপর কী নেশা। তবু ওদের সঙ্গে মিশতে পারিনে। বাধো বাধো ঠেকে। সতীত্ব বিসর্জন—রাগ করিসনে, ঠাট্টা করছিনে। শহীদ ক্ষুদিরামের দিব্যি, ঠিক তেমনি মনে হয়। ওদের চোখে কত আশা, কত আগুন, কত একাগ্রতা। এক এক সময়ে মনে হয়, ওরা ঠিক পারবে -হারু মাস্টারের অন্ন যোগাতে—ময়না হতভাগীর চিকিৎসা করিয়ে তাকে স্বাস্থ্যবতী করে তুলতে, ওরা ঠিক পারবে। কিন্তু কী মনে হয় জানিস? ওদের নৃসিংহরাও যদি চেয়ারম্যান হয়? তারাও যদি কুমড়ো পটাশ্ হয়? ভাবতে বুক কেঁপে উঠে। মন কেঁদে-ওঠে—বুক ছুঁয়ে বলছি সত্যিই কেঁদে ওঠে। তখন আর ওদের সঙ্গে মিশতে পারিনে। দু'দুবার ঠকে যাব? আমি আজ একা। তুই-ও থাকবি না। ময়না থেকেও নেই। একা। নতুন একদল ছেলে বলছে, তোর সম্মান পুনরুদ্ধার করবে। দেখা যাক। ওদের তাজা প্রাণ—

—এই ক্ষেপা।

ক্ষেপা ঘোষ তার রক্ত-জবা চোখ তুলে চেয়ে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বয়ং

সিংহ মুখার্জি। সে দেখতে থাকে চেয়ে চেয়ে। তারপর একসময় স্পষ্ট দেখে, সিংহের মূর্তিটা ধীরে ধীরে লম্বা হতে হতে পায়ের দিকটা বাঁশের মত হয়ে গেল। তারপর দেহটা হয়ে উঠল খড়ের তৈরী।

ক্ষেপা হাতের ফ্ল্যাগটাকে বগলে চেপে ধরে পকেট হাতড়াতে থাকে। খুঁজে পায় তার দেশলাই। অনেক কষ্টে সেটি থেকে একটা কাঠি বার করে। নৃসিংহ জোচ্চোরের কুশপুত্তলিকা দাহ করবে সে।

—এই ক্ষেপা কাঠি জ্বালাচ্ছিস্ কেন? ঘুম থেকে উঠেই গিলেছিস হতভাগা?

চোখ রগড়ে ক্ষেপা দেখতে পায় কুশপুত্তলিকা আর নেই। স্বয়ং নৃসিংহ চেয়ারম্যান তার বিরাট বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সম্মুখে। উঃ কী চেহারা হয়েছে শালার। আগে ছিল ছিপ্‌ছিপে। রাতের পর রাত ইট মাথায় দিয়ে শুয়ে কাটিয়েছে তার পাশাপাশি।

—অফিসে যাবিনে?

—না।

—না গেলে তোর চাকরি থাকবে না। আমি মাতালদের বরদাস্ত করি না। তুই বলে এতদিন টিঁকে রয়েছিস।

ক্ষেপা অদ্ভুত ভাবে টেনে টেনে হাসে। শেষে বলে,—আজ বিসর্জন—

নৃসিংহ ভ্রূকুঞ্চিত করে পাশ কাটিয়ে যেতে গেলে ক্ষেপা তার গরদের পাঞ্জাবীর কোণা ধরে টানে।

—কী আস্পর্ধা ছোটলোকের।

—এই যে ফ্ল্যাগ। রক্তের বদলে রক্ত চাই। কত রক্ত চুষে নিয়েছে জোঁকে—জোঁকের মুখে চুন দেব এবারে।

—কী ওটা?

—ফ্ল্যাগ। মনে নেই? সেই যে মাথা ফেটে অজ্ঞান। বিসর্জন দিতে চলেছি নদীতে।

আশ্চর্য বলে মনে হলেও ক্ষেপার বলার ভঙ্গিতে নৃসিংহ চিনতে পারে জিনিসটিকে। অত মোটা খদ্দর আজকাল আর দেখা যায় না। সে বলে,—ঢং কেন এত? ফেলে দিলেই চুকে যেত?

ক্ষেপা নৃসিংহের জামা ছেড়ে দিয়ে কান্নার স্বরে হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়। টলতে টলতে চলে সে। হাসতে হাসতে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তবু সে ফ্ল্যাগটাকে মাথায় নিয়ে বিড়বিড় করে গান গায়—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই—।

পুজো আসে। ষষ্ঠীর দিন। মৃণাল বাড়ি থেকে বার হয়।

রেল লাইন পার হয়ে পাখীদের বাড়ির রাস্তা ধরে কিছুদূর চলতে একটা অদ্ভুত অনুভূতি মৃণালকে আচ্ছন্ন করল। পাখী হয়ত তাকে চিনতেই পারবে না। চিনলেও তেমন ভাবে কথা বলতে চাইবে না। আবার মনে হল, বাড়ির বাইরে সেই বাগানে কাদামাখা হাতে এবারেও পাখীর সঙ্গে দেখা হবে এমন কোন কথা নেই। হয়ত সে বাড়ির ভেতরে থাকবে—হয়ত সে পুজোর ছুটিতে অন্য কোথাও বেড়াতে চলে গিয়েছে। অনেকেই তো অমন যায়। যদি বাইরে তার সাক্ষাৎ না মেলে তবে কতবার আর একই রাস্তায় ঘোরাফেরা করা যায়? বড় জোর তিনবার। এর বেশী অশোভন হয়। তাকে দেখে পাখীর আনন্দ হোক আর না হোক, রাগ কিংবা ঘৃণা হবে না আশা করা যায়। অবিশ্যি ইতিমধ্যে যদি তার মা মা-খেকো ছেলের সংস্পর্শে আসার ভয়াবহতার বীজ তার মনের মধ্যে বপন করতে পারে তাহলে অন্য কথা।

মৃণাল খানিকটা এগিয়ে যেতেই এক পুজো মণ্ডপের ভেতর থেকে সুন্দর জামা গায়ে একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে তার হাত ধরে। চমকে মেয়েটির দিকে চাইবার আগেই তার মাথার চুলের সুগন্ধ এবং গায়ের পাউডার স্নো ইত্যাদির সুঘ্রাণ নাকে এসে লাগে।

—হ্যাঁ।

—আমাকে চিনতে পারলে তো দেখছি।

—চিনব না কেন? বারে—

—আমি তোমাকে চিনতে পারতাম না।

—কেন?

—আমার মনের মধ্যে একটা ময়লা ফ্রক-পরা মেয়ে ভাসছিল।

পাখী হেসে ওঠে।

—হাসির কথা নয়। তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে লাগছে।

—যাঃ, আমি দেখতে আবার ভাল হলাম কবে?

—সত্যি বলছি।

পাখীর মুখ রাঙা হয়। রাঙা ভাবটুকু কাটাবার জন্যে সে বলে,—কোথায় যাচ্ছিলে?

—তোমাদের বাড়ির দিকে।

—কেন?

—ভাবছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

পাখীর মুখ আনন্দে ঝলমল্ করে ওঠে। সেই মুখের দিকে চেয়ে মৃণাল ভাবে, এর সঙ্গে ঠাকুর দেখে বেড়াতে কত আনন্দ। ভাল জামা পরলে পাখীকে কী সুন্দর দেখতে লাগে। অথচ সেদিন বুঝতেই পারে নি।

মৃণালের অপরিষ্কার হাত ধরে থাকে পাখী। ওর হাত গরম। সামনে পুজো প্যাণ্ডেলে ছেলেমেয়েদের ভীড়। ষষ্ঠীর দিন।

পাখী বলে,—আমি কতদিন রেল লাইনের ধারে গিয়েছি।

বিস্মিত মৃণাল বলে,—সত্যি?

—হ্যাঁ। একা যেতে ভয় করে। বড় ফাঁকা জায়গা। তবু লুকিয়ে গিয়েছিলাম।

—কিন্তু আমি তো প্রায়ই যাই।

—প্রত্যেক শুক্রবারে যাবে এবার থেকে।

—আচ্ছা। তুমি আসবে তো?

একটু গম্ভীর এবং একটু উদাস কণ্ঠে পাখী বলে,—বলতে পারি না। তবে গেলে শুক্রবারেই যাব।

—বেশ। আমি থাকব।

—ঠাকুর দেখবে না?

—হ্যাঁ।

—আগে এইটে দেখবে চল।

ওরা পুজো প্যাণ্ডেলে গিয়ে ঠাকুর দেখে। মৃণালের হাত ছেড়ে দেয় পাখী। কিন্তু ঠাকুরের সামনে গিয়ে মৃণাল পাখীর হাত উঠিয়ে নেয়। পাখী একবার তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসে। মৃণালের বুক কেন যেন ভরে ওঠে।

বাইরে এসে বলে,— তুমি এখানে অপেক্ষা করলে আমি পরশুও আসতে পারি।

পাখীর মুখ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। সে বলে,—আমরা কাল মাসীর বাড়ি চলে যাব।

—কবে ফিরবে?

—লক্ষ্মী পুজোর আগের দিন।

—এতদিন?

—হুঁ।

ওরা রাস্তা দিয়ে চলে। আরও দু-একটা প্রতিমা দর্শনের পর পাখী বলে,—তুমি তো আমাদের বাড়িতে যাবে না।

—না।

—আর ঠাকুর নেই এদিকে।

'—আমি তাহলে চলে যাই আজ।

—না। আর একটু—। চল ওই পুকুরের সিঁড়িতে গিয়ে বসি।

মৃণাল লক্ষ্য করে পাখীর সেই চপলতা একটুও নেই। হাসির মধ্যেও কেমন যেন একটু সংযত ভাব। পুকুরের সিঁড়িতে বসে তাই সে বলে,—সেদিনের পাখীর মুখে কত কথা শুনেছিলাম। আজকের পাখী যেন একটু অন্যরকম।

—মোটেই না। সেদিন বড্ড বাজে বকেছিলাম।

—আজও বকলে ক্ষতি কি?

—না।

—রোগা বাঘের ভয়?

—যাঃ, পাখীর আবার বাঘের ভয় হয় নাকি? বাঘ থাকে মাটিতে—পাখী ওড়ে আকাশে। তুমি আগের চেয়ে রোগাও হয়েছ লম্বাও হয়েছ মৃণালদা।

—কী করে বুঝলে?

—বারে, বোঝা যায় না? তোমার মুখে হাতে নতুন নতুন কাটা দাগও রয়েছে। কী কর তুমি? সব সময় মারামারি?

—হ্যাঁ।

—বিশ্বাস করি না। যারা অত মারামারি করে, তারা এমন গম্ভীরভাবে কথা বলতে পারে না।

—আমি গম্ভীর?

—গম্ভীর না?

—এত কথা বলছি—

—যতই কথা বল।

—সেই জন্যেই বুঝি তুমিও গম্ভীর হয়েছ?

—না। আমি তোমার মত হবার চেষ্টা করছি।

—কেন?

—এমনিতে। অমন হতে আমার খুব ভাল লাগে।

মৃণাল চুপ করে থাকে।

—তুমি নতুন জামা পরবে না মৃণালদা?

—আমি তো ছোট নই তোমার মত।

পাখী খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বলে,—উঃ, কত বড় মানুষ।

—বড় নই?

—ভারী তো বড়।

—তোমার চেয়ে অনেক বড়।

—জানি, মাত্র তিন বছরের।

—কে বলল ?

পাখী জবাব দেয় না। তার মা বলেছে। কিন্তু মায়ের কথা উত্থাপন করতে চায় না মাজকের দিনে। মৃণালও বুঝতে পেরে কিছু বলে না।

সন্ধ্যা হয়।

মৃণাল বলে,—চল এবারে।

—এখনি ?

মৃণাল হেসে বলে,—না। একটু পরে।

পাখীও হাসে। তবু এক সময় উঠতে হয় তাদের। মৃণালকে যেতে হবে অনেকটা পথ। বেশী রাত হলে পুজোর দিন বলে রেহাই পাবে না।

পাশাপাশি চলতে চলতে পাখী ডাকে,—মৃণালদা।

—কী বলছ ?

—তোমার খুব কষ্ট, তাই না ?

চমকে ওঠে মৃণাল। আজও তার মুখের রেখায় কিছু ধরা পড়ল নাকি ? প্রশ্ন করে,—কেন ?

—দেখে মনে হয়। আমি তো জানি সেই দুর্ঘটনার কথা। তোমার বাবা মা কেউ নেই। কত কষ্ট। আমার ইচ্ছে হয়, যদি তোমার কষ্ট কমিয়ে দিতে পারতাম—

মৃণাল থেমে পড়ে। পাখীর মুখোমুখি দাঁড়ায়। তারপর বলে,—তোমার সঙ্গে যতক্ষণ গল্প করছিলাম, কষ্টের কথা মনে ছিল না।

—তোমার কী কষ্ট, আমায় বলবে ?

মৃণাল বুঝতে পারে, অসতর্ক মুহূর্তে সে স্বীকার করে নিয়েছে তার কষ্ট রয়েছে। বড় ভুল হয়েছে। বেশী আনন্দে বোধহয় এমন ভুল হয়।

—কী আর এমন কষ্ট পাখী। তেমন কিছুই না—

—ছিঃ মৃণালদা, ছোটদের কাছে মিথ্যে বলতে হয় ?

—মিথ্যে নয় পাখী। কষ্টের কথা যত ভাববে ততই কষ্ট। ধর, আমি যদি ভাবি আমার মা নেই, সবার আছে। তাহলে আমার কষ্ট হবে। যদি ভাবি, সবাই কেমন মায়ের ভালবাসা পায়, আমি পাইনে—তাহলে কষ্ট আরও বাড়বে। যদি ভাবি, বাবা মা নেই বলে সবাই আমাকে দূরে সরিয়ে দেয়—ঘেন্না করে, তাহলে কষ্টের সীমা থাকবে না। তাই ওকথা ভাবতে নেই পাখী। না ভাবলে কোন কষ্টই থাকে না।

পাখী দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার অশ্রু মৃণালের হাতে ঝরে পড়ে।

বিচলিত হয় মৃণাল। সে বিস্মিত হয়। তার আসল কষ্টের কথা না জেনেও, একজন চোখের জল ফেলেছে তার জন্যে। অভাবনীয়। এ দীপা মাসীর অশ্রু নয়—এ অশ্রু টলটলে—মুক্তোর মত।

—পাখী, কষ্টের কথা যদি কখনো বলি, তোমাকেই বলব। আমি মিথ্যে কথা বলিনে চোখ মুছে ফেল।

বউকে বাধ্য হয়ে একদিন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় ক্ষেপার ডাক্তার দেখাতে। ত্তদিন ধরে পেটে কিছু থাকছে না। যা খায়, বমি হয়ে যায়। সেই সঙ্গে পুরোনো যন্ত্রণা তো রয়েইছে।

গজ্ গজ্ করতে করতে ক্ষেপা বলে,—সুখও নেই, সোয়াস্তিও নেই। চলো, দেখিয়ে আসি।

ময়না জানে, ডাক্তার তাকে দেখাতেই হবে। এতদিনের অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে, যম তাকে তাড়াতাড়ি নেবে না। কিন্তু এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি পেতে হলেও, ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন।

তবু, ক্ষেপার বিরক্তি আর বিদ্রূপের ভয়ে সে বলে,—থাক্। এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে।

—খুব হয়েছে। আর কিছু না হোক, দুবেলা দুমুঠো চাল ফুটিয়ে দেবার শর্ত তোমাকে মানতেই হবে। এইভাবে বিছানায় পড়ে থাকবে, আর আমি উপোস করে থাকব ওটি হবে না। চল।

অসুস্থ ময়নার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। বলে,—হোটেলে যাও না। হোটেলের তো অভা· নেই।

—বাস্। হয়ে গেল। একবার বলেছিলে খারাপ পাড়ায় যেতে, এবারে বলছ হোটেলে খেতে। তবে তুমি মরতে রয়েছ কেন? হাড় জ্বালাতে কেন বিয়ে করবার সখ হয়েছিল?

সখ তার সত্যিই হয়েছিল। কিন্তু তখন ময়না অনভিজ্ঞা কিশোরী। স্বাস্থ্যবতী গৃহবধূদের দেখে তার ধারণা হয়েছিল সে-ও অমন হয়ে উঠবে। তাছাড়া, মা বল· বিয়ের জল পড়লে মেয়েদের কত শিবের অসাধ্য রোগ ভাল হয়ে যায়। বিয়ের দু এক বছরের মধ্যেই সে বুঝে ফেলেছে, সব আশায় ছাই পড়েছে। তবু মুখ বুজে থাকে। ক্ষেপা তাকে বিদ্রূপ করে, ক্ষেপা ক্রোধমত্ত হয়। হবারই কথা। এক জনের স্বাস্থ্যহীনতার জন্যে সে-ই বা কেন জ্বলে পুড়ে মরবে সারা জীবন? কতবা ভেবেছে বিষ খায়। ক্ষেপার মুখের দিকে চেয়েই বিষ খেতে ইচ্ছে হয়েছে। পা·

না। ভেবেছে, মৃত্যু তার যখন আপনা হতেই এগিয়ে আসছে, কেন তবে পাপ করে? তবু আসে নি মৃত্যু। দূর থেকে বারবার শুধু হাতছানি দিয়েই সরে গেছে। বছরের পর বছর ঘুরেছে—তার মাংসহীন কাঠামোখানার অস্তিত্ব এখনো পৃথিবীর ওপর সচল।

ক্ষেপা হাত পা ছুঁড়ে বলে ওঠে—চল চল, অনেক হয়েছে।

ময়নাকে উঠতে হয়। কোনরকমে ঘরের কাচা একখানা শাড়ি পরে সে স্বামীর পিছনে পেছনে রওনা হয়। পা কাঁপতে থাকে। শরীর আনচান করে। একটা রিক্সা হলে ভাল হয়। মুখ ফুটে বলতে পারে না সে কথা।

একটু পথ এগিয়ে স্ত্রীকে পেছিয়ে পড়তে দেখে ক্ষেপা খিঁচিয়ে ওঠে—আগেই জানতাম, কিছু খসবে আজ। দাঁড়াও।

কিছুদূর গিয়ে একটা রিক্সা ডেকে আনে ক্ষেপা। বলে,—ওঠো।

ময়না রিক্সায় বসে বেঁচে যায়। পেট চেপে ধরে ভাবে, এবারে যমের বাড়িতে যেতেও আপত্তি নেই তার।

হাসপাতালে উপস্থিত হতেই নিতু কম্পাউণ্ডার এগিয়ে এসে বলে—ক্ষেপাদা যে। বউদিকে দেখাতে এলে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তা, এখানে কেন দাদা, জানই তো, এখানে পায়ে হেঁটে ঢোকে আর কাঁধে চড়ে বার হয়।

—জানি।

—তবে?

—কোথায় মরতে দেখাব, বলতে পার?

—বিনোদ ডাক্তার আছেন, তরফদার ডাক্তার রয়েছেন। ডাক্তারের অভাব?

তর্জনীর সঙ্গে বুড়ো আঙুল ঠুকে ক্ষেপা বলে,—পয়সা লাগে।

—তা তো লাগবেই। রোগীকে ভাল করতে হলে পয়সা লাগবে না?

—এটাও সরকারী হাসপাতাল, এখানেও ডাক্তার আছে। তারা বুঝি ডাক্তারী পাশ করে নি?

—করেছে। কিন্তু তারা চাকরি করে—ব্যবসা নয়। রোগী মরল কি বাঁচল বয়ে গেল তাদের। তাছাড়া সব সময় ডাক্তারও থাকে না। একজন বদলী হয়ে চলে গেল, অন্যজনের আসবার নাম নেই। আমার মত কম্পাউণ্ডার চালায় তখন। এই তো তিন দিন আগে একজন ছোকরা ডাক্তার এসেছে। কী জানে সে চিকিৎসার?

—জ্ঞান দিও না ভাই, ওকেই দেখাব।

—তোমাকে আর কী জ্ঞান দেব। তবে বউদিকে যদি বাঁচাতে চাও অন্য পথ দেখ
—এখানে ওষুধেরও পয়সা লাগে না।
নিতু কম্পাউণ্ডার হি হি করে হেসে বলে,—ওষুধ থাকলে তো পয়সা লাগবে?
—কোথায় যায় সব?
—তোমাদের মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা তৈরীর টাকা যেখানে যায়—মশা মারা তেলের টাকা যেখানে যায়, সেখানেই যায়।
ক্ষেপা গুম ধরে থাকে। ময়নাও চুপ। লোকটির কথা শুনে সাময়িক আরামের আশাও অন্তর্হিত হয়। তবু বসে থাকতে হয় তাকে। ক্ষেপা হাসপাতালের ডাক্তার না দেখিয়ে বাড়ি ফিরবে না।
নিতু বিদায় নিলে ক্ষেপা ডাক্তারের ঘরের সামনে উপস্থিত হয়। সেখানে রোগীর তেমন ভীড় নেই। নিতুর কথা কানে বাজতে থাকে।
একটু পরেই ময়নার ডাক আসে। ক্ষেপা স্ত্রীকে সঙ্গে করে ভেতরে যায়। নিতু কম্পাউণ্ডার মিথ্যে বলে নি। গাল টিপলে দুধ বার হবে ডাক্তারের। মন খারাপ তার।
ডাক্তার প্রশ্ন করে,—আপনি ওঁর স্বামী?
—হ্যাঁ।
—কী অসুখ?
—চিরকাল দেখছি পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হয় মাঝে মাঝে। চেহারা তো আপনি নিজের চোখেই দেখছেন। কিছুদিন থেকে যন্ত্রণার সঙ্গে আবার বমি শুরু হয়েছে। দুর্বল শরীর আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে।
—কী চিকিৎসা করেছেন এ পর্যন্ত।
—তেমন কিছুই নয়।
—সেকি? বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখেছেন? অন্যায় করেছেন।
—পয়সা নেই স্যার। পয়সা নেই বলেই এই হাসপাতালে এসেছি. না পারতে। নইলে জায়গাটির দুর্নাম এখান থেকে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে অজ পাড়াগাঁয়েও পৌঁছে গিয়েছে।
ডাক্তারের কচি মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে মনে মনে জানে, অনুযোগটি কত সত্যি। প্রথমে এসেই ওষুধের স্টক দেখতে গিয়ে হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল তার। যে হাসপাতালে বাইশটা সীট রয়েছে, ও. টি. রয়েছে, এমার্জেন্সী ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সেখানে নগণ্য একটি ডিসপেন্সারীর ওষুধও নেই। কিন্তু সেকথা প্রকাশ করা যায় না। রিকুইজিশান পাঠিয়েছে অনেক ওষুধের। ভগবান জানেন এসে পৌঁছোবে কিনা। পৌঁছোলেও সেগুলি নিরাপদে থাকবে কিনা তাও জানে না।
—আপনাকে একটু ঘরের বাইরে গিয়ে বসতে হবে।

বিস্মিত ক্ষেপা প্রশ্ন করে,—আমাকে ?

—হ্যাঁ। আপনার স্ত্রীকে আমি দেখব। সময় লাগবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষেপা বাইরে গিয়ে বারান্দায় একটা বেঞ্চিতে গালে হাত দিয়ে বসে। বিয়ের পর এই প্রথম এক জায়গায় এসে দেখল, যেখানে তার চেয়েও ময়নার গুরুত্ব বেশী। দেখে একটু আনন্দ পেল। ময়না বেচারার মূল্য তাহলে একেবারে নিঃশেষিত হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, ঘাটের মড়ারও এক ধরনের গুরুত্ব রয়েছে। শবদেহের সঙ্গে শব-বাহকের দল ছোটে, খই ছড়ায়, পারলে তামার পয়সা ; তারস্বরে চিৎকার করে 'হরিবোল'। তাছাড়া কাঠ-কেনা, পুরুত ভাড়া করা, ডোমের দক্ষিণা ইত্যাদিতে ট্যাকের কড়িও বেশ খসে।

কথাগুলো ভেবে খিঁচিয়ে ওঠে ক্ষেপার মন। সে একটা সুন্দর গোছের চিন্তা মাথায় আনবার চেষ্টায় পা নাচাতে শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। এতক্ষণ ধরে ওই দুধের ছেলেটা কী দেখছে এক ময়নার কেঠো শরীর ? একটা অধিকারবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দরজার সামনে যে বেয়ারা বসে থাকে, কোন কাজে সে একটু বাইরে যেতেই ক্ষেপা এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারের স্প্রীং-এর দরজা ঠেলে।

ভেতরে মুখ বাড়াতেই দেখে সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছে ডাক্তার। ক্ষেপার দিকে নজর পড়ায় বলে,—ওভাবে মুখ বাড়াবেন না। বাইরে যান।

তাড়াতাড়ি সরে আসে সে। ময়নাকে দেখতে পেল না। যে পর্দাটা ঝুলছে, তার পেছনে রয়েছে নিশ্চয়ই।

বেঞ্চির ওপর বসে ছটফট করে সে। ময়নাটাকে নিয়ে করছে কি হতভাগা। দেখবার জন্যে একেবারে পর্দার পেছনে ? কেন, চেয়ারে বসিয়ে জিভ, গলা, বুক দেখা যায় না ?

ক্ষেপার ডাক পড়ে। সে তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে দেখে ময়না একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। তার রক্তশূন্য মুখেও একটু যেন রক্তাভা।

ডাক্তার একটা প্রেস্‌ক্রিপশান এগিয়ে দিয়ে বলে,—ধরুন এটা, যে ওষুধ লিখলাম হাসপাতালে নেই, কিন্তু আপনাকে আনতেই হবে। যে-ভাবে পারেন কিনবেন।

বিতৃষ্ণায় মুখ বিকৃত করে ক্ষেপা বলে,—তবে তো খুব করলেন।

—বসুন ওই চেয়ারে। কথা আছে।

বসবার আগ্রহ উবে গিয়েছে ক্ষেপার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে,—বলুন। এই বেশ আছি।

—কোথায় কাজ করেন ?

মিউনিসিপ্যালিটিতে।

—'লোন' পাবেন না ?

—কী যে বলেন স্যার, ওরা দেবে লোন। চোরের আড্ডাখানা।

ডাক্তার একটু হতাশ হয়। কলমটা দিয়ে টেবিল ঠুকতে ঠুকতে বলে—দেখুন, আপনার স্ত্রীর অসুখ অনর্থক অবহেলা করে বাড়িয়ে তুলেছেন। ঠিকমত চিকিৎসা করালে নিশ্চয়ই সেরে যেত। উনি স্বাস্থ্যবতী হতে পারতেন।

—জন্ম-রোগী আবার সারে নাকি ?

—তর্ক করবেন না। এখনো দীর্ঘদিন ওষুধ খাওয়ালে ওঁর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হতে পারে। যে যন্ত্রণায় উনি ভুগছেন সেটা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন।

ক্ষেপার মুখে আগ্রহ ফুটে ওঠে,—সত্যি বলছেন ?

—হ্যাঁ। কিন্তু একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

ক্ষেপা লক্ষ্য করে কথাটা ডাক্তারের মুখ থেকে বার হবার সঙ্গে সঙ্গে ময়নার মুখটা নীচু হয়ে যায়।

ডাক্তার বলে,—আপনি একটা অবিবেচনার কাজ করে ফেলেছেন। ঠিক অবিবেচনাও বলা যায় না। এতদিন পরে আপনিই বা বুঝবেন কেমন করে ?

ক্ষেপা ভাবে, ছোকরা বড় লম্বা-চওড়া কথা বলে তো। তবু-ওর কথায় আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। বেশ একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলছে বটে। কালে, বড় ডাক্তার হতে পারে।

—আপনার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা।

—কী ? কী বললেন ?

—ওঁর পেটে ছেলে-পুলে এসেছে দু'মাস হল।

ক্ষেপার কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। চারিদিকটা কেমন যেন অদ্ভুত রকমের ফাঁকা হয়ে যায়। সে চেয়ারে বসে পড়ে।

—শুনুন। উপায় থাকলে আমি এখনি ওই ছেলেকে পেট থেকে বার করে দিতাম।

—এঁ্যা ?

—এই খারাপ স্বাস্থ্যে অমন হওয়ায় সন্দেহ বিপদের আশঙ্কা।

—আপনি বলছেন, ওর সত্যিই ছেলে হবে ?

—হ্যাঁ।

—আপনি ঠিক বলছেন ডাক্তারবাবু ? মানে, এ বিষয়ে ভুল হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই তো ?

তরুণ ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে,—এ বিষয়ে আমার এত অভিজ্ঞতা রয়েছে যে কলকাতার বড় বড় ডাক্তার, যাঁরা আমাকে পড়াতেন, তাঁরা একটা

সোনার মেডেল দিতে বাধ্য হয়েছেন।

—ও—ও। মাফ্ করবেন। আমি তাহলে উঠি। ওষুধ নিশ্চই খাবে। কত টাকার ওষুধ খেলে ও ভাল হয়ে যাবে স্যার ?

—কত টাকা খরচ করতে পারেন ?

—যত বলেন।

—যদি বলি চার পাঁচশো।

—তাই করব।

—এই ছেলেটি পেটে আসবার আগে যদি চিকিৎসা হত—

—কেন ? এখন অসুবিধে কি ?

—আছে। যাক আমি চেষ্টা করব। মাঝে মাঝে নিয়ে আসবেন আমার কাছে অযত্ন করবেন না।

—নিশ্চিন্ত থাকুন।

ময়নার শরীর কাঁপছিল। দুর্বলতার কম্পন নয়। সে তার স্বামীর মধ্যে এক নতুন মানুষের সন্ধান পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

—চল ময়না।

ক্ষেপা ধীরে ধীরে স্ত্রীকে চেয়ার থেকে তুলে হাত ধরে নিয়ে যায় বাইরে। তারপর একটা রিক্সা ডেকে অতি সযত্নে ওঠায়। রিক্সায় বসে বলে,—দু'বেলা দু'জনের রান্না তো ভা—রী কাজ। ও আমি একাই করে নিতে পারব ময়না। তুমি বিশ্রাম কর। খুব দরকার বিশ্রামের।

ময়না কেঁদে ফেলে। ক্ষেপা ব্যস্ত হয়ে তার কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে—আরে কাঁদতে নেই, শরীর খারাপ হবে। একে তো এই আসা-যাওয়ার পরিশ্রম, তার ওপর কান্না—শরীরে সয় ?

প্রতি শুক্রবারে রেল লাইনের ধারে গিয়েও কোনদিন আর পাখীর দেখা মিলল না মৃণালের। এইভাবে শীতকাল এসে গেল আবার। বাৎসরিক পরীক্ষাও শেষ হল।

পাখী হয়ত সত্যিই এবারে ভুলেছে তাকে। কিংবা সেদিনের উল্লাসের জন্যে নিজের প্রতিই ঘৃণা হয়েছে তার। অথবা সেদিন তাদের মেলামেশা পাখীর মা জেনে ফেলেছে।

পাখীর চিন্তা বেশ কিছুদিন মৃণালকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। তারপর পরীক্ষা এসে যাওয়ায় সব কিছু ভুলে যেতে হয়েছে। কারণ তার লক্ষ্য স্থির। ভালভাবে

পরীক্ষা তাকে দিতেই হবে। কোন রকমে স্কুলের গণ্ডী তাকে ছাড়াতে হবে।

আবার সে ফার্স্ট হল। কিন্তু বীজেশ যথারীতি পাশ করতে পারল না। সব চাইতে বড় বিস্ময় হাবলু ফেল করেছে। ওর বন্ধু দেবুও পাশ করতে পারে নি তবে সুশান্ত পাশ করে গিয়েছে। সবাই বলাবলি করে, মল্লিকদের বাড়ির ছেলে এ স্কুলে কখনো ফেল করে না। শুনে সুশান্ত না রেগে একটু বরং উদ্ধত ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে হাসতে থাকে ক্লাশের মধ্যেই।

মৃণাল নতুন ক্লাশে বসে ছটফট্ করে। দেয়ালে টাঙানো লেখাটি ইংরেজীতে। সেটির অর্থ আবছা আবছা বোঝে সে। তবে পুরোপুরি জানে না।

কিন্তু ওটির দিকে তার মন যেন নেই। তার চোখ রয়েছে হেডমাস্টারের ঘরের সামনে। সেখানে এখনো কাকাকে আসতে দেখে নি। হাবলুর বাবাকেও নয় হাবলুর বাবা হয়ত এখনো জানে না কিছু। যে-ছেলে থার্ড হয়ে ক্লাশে ওঠে, সে ফেল করতে পারে, এ ধারণা কারও থাকে না। হাবলুর বাবা হয়ত নতুন ধরনের কোন উপহার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরে।

মৃণাল হাবলুকে ছেলেমানুষের মত কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখে এসেছে। হেডমাস্টার মশায়, যারা পাশ করেছে, তাদের নামগুলো গম্ভীর স্বরে পড়ে ক্লাশ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন একটি বাড়তি কথাও বলেন নি। ক্লাশের মাস্টার অম্বিকাবাবু শুধু বলেছিলেন —এখন কেঁদে কোন লাভ নেই হাবলু। দিনের পর দিন তোমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। তুমি কানে তোলো নি। তুমি নিজেও জানতে ফাঁকি দিচ্ছ।

মৃণালের ইচ্ছে হয়েছিল, হাবলুকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু তার আগেই দেবু উঠে গিয়েছিল তার পাশে। বলেছিল,—কাঁদছিস কেনরে শালা। আমি কাঁদছি অমন কত পাশ ফেল হবে। বড় হয়ে যদি কোনরকমে টু-পাইস করতে পারিস দেখবি সবাই বেমালুম ভুলে গিয়েছে। ওই মাস্টাররাই দেখবি তেল দেবে। চুপ কর্।

মৃণাল সরে এসেছিল। দেবু দিব্য-জ্ঞান দিচ্ছে হাবলুকে। বোধিত্ব লাভ করতে আর দেরী নেই বেচারার। পাকাড়া হাবলু তো তাকে চায় না। কতবার কতভাবে একথা সে জানিয়ে দিয়েছে। তাই ওকে ছেড়ে সে চলে এসেছে নতুন ক্লাশে।

হেডমাস্টারের ঘরের সামনে কাকাকে দেখতে পেল না মৃণাল। ধীরে ধীরে উঠে সে বাইরে যায়। স্কুল কম্পাউণ্ডে অনেকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাবলুর বাবাও কিন্তু কাকা নেই। হাবলুর বাবা তাকে দেখতে পেয়ে ডাকে। মনে আছে, গত বছর একবার ভদ্রলোক তার সঙ্গে কথা বলেছিল ওদের বাড়িতেই। হাবলু সেদিন

নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিল তাকে। তারপর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে আর একবারও ডেকে কথা বলে নি। অথচ রাস্তা ঘাটে হামেশা দেখা হয়েছে।

মৃণাল কাছে যেতে হাবলুর বাবা প্রশ্ন করে,—ওর খবর কি?

চুপ করে থাকে মৃণাল।

—স্ট্যাণ্ড করতে পারে নি?

মৃণাল এবারে তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলে,—পাশ করতে পারে নি।

সে স্পষ্ট দেখতে পায়, ভদ্রলোক কাঁপছে, হয়ত পড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—এখুনি হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করুন। গতবার থার্ড হয়েছিল। এবারে উঠিয়ে দেবেন বললেই। হাবলু খারাপ ছেলে নয়।

—যাব? তুমি বলছ?

—হাঁ।

ভদ্রলোক ছুটতে থাকে। সে দেখতে পায় তার আদ্দির পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা নতুন ঘড়ির চামড়ার ব্যাণ্ড বার হয়ে আছে।

নিজের বাবাকে কল্পনায় এনে দাঁড় করায় সে স্কুল কম্পাউণ্ডে। সে-ও যেন পাশ করতে পারে নি আর হাবলু এসে তার বাবাকে বলছে,—এখুনি হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করুন। মৃণাল স্পষ্ট দেখতে পায় তার বাবার মুখ। হাবলুর কথা শুনে কঠোর হয়ে ওঠে সে মুখ। ভ্রূকুঞ্চিত হয়। গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়,—না পড়লে ফেলই হয়। ও ওই ক্লাশেই থাকবে আর এক বছর।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃণাল এগিয়ে যায় হেডমাস্টারের অফিসের দিকে। হয়ত কাকা রয়েছে সেখানে। মনে পড়ে তার, গতবছর এমনি দিনে বিনোদ আলমারীর পেছনে বসে লুকিয়ে গাঁজায় দম দিচ্ছিল। এ বছরে বিনোদ বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—এবারেও এসেছিস? এবারে আর বীজেশকে পাশ করাতে হবে না।

—কেন?

—তোর কাকা তো এসেছিল।

—কখন?

—প্রমোশানের আগেই।

—কাকা জানত?

—কে জানে? এবারে বীজেশ একটাতেও পাশ করতে পারে নি। হেডমাস্টার সোজা 'না' বলে দিয়েছেন।

মৃণাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হাবলুর বাবা বাইরে আসে। মৃণাল জানতে চায় হাবলু পাশ করেছে কিনা।

ভদ্রলোক উপেক্ষা ভরে বলে ওঠে,—না করবার কিছু নেই। ছেলে খারাপ নয়; তোমাদের মত বন্ধু-বান্ধব জুটে ওর মাথা খেয়েছে। আমি বলেছি হেডমাস্টারকে সব কথা।

মৃণাল দাঁড়িয়ে থাকে হাবলুর বাবা চলে যাবার পরেও। ভাবে, বাড়িতে এবারে কোন ক্ষমা নেই। গত বছরই টিটু ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। এবারে সেটা বদ্ধমূল হবে আরও।

কাঁধে করস্পর্শে পেছন ফিরে দেখে স্বয়ং হেডমাস্টার।

—আমি জানতাম, একবার অন্ততঃ তুমি আসবে এদিকে। কিন্তু কিছুতেই পাশ করানো সম্ভব নয় মৃণাল। কোন সাবজেক্টেই যার পঁচিশের বেশী নম্বর নেই, তাকে পাশ করানো চলে?

মৃণাল বুঝতে পারে, হেডমাস্টারের অক্ষমতা; নইলে তাঁর মত রাশভারি ব্যক্তি স্কুলের একজন ছাত্রের কাছে এভাবে কৈফিয়ৎ দিতেন না। অর্থাৎ তিনি প্রকারান্তরে জানাতে চান এর জন্যে মৃণালের পড়া বন্ধ হলে তিনি নিরুপায়।

মৃণাল ক্লাশের দিকে যাচ্ছিল; হেডমাস্টার মশায় তাকে ডেকে বলেন,—তোমার ফ্রী-স্টুডেন্টশিপ চলবে। বই-ও আমি যতটা সম্ভব যোগাড় করে দেব। পড়া বন্ধ করো না।

মনে মনে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারে না মৃণাল। মানুষটিকে সে প্রায় হাক মাস্টারের মতই শ্রদ্ধা করে; আজ সে শ্রদ্ধা আরও বাড়ল। কিন্তু তিনি জানেন না মাইনে মাফ করে দিলে এবং বই কিনে দিলেই পড়া হয় না। অন্যান্য অনেক প্রতিবন্ধক আছে। দিনের পর দিন সে না খেয়ে থাকতে পারবে না। প্রতিটি তুচ্ছ কারণে নির্মম অত্যাচারও সইতে পারবে না। তাই সম্ভবতঃ পড়াশোনায় এইখানেই ইতি।

স্কুলের পর বাড়ি ফেরার পথে বুক-লিস্টটা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে পথে ছড়িয়ে দেয় সে। বাড়িতে নিজের ঘরে ঢুকে চৌকিতে বসে পড়ে। এখন আর খোকা এসে তাকে অভ্যর্থনা জানায় না আগের মত। বাচ্চা প্রসবের বহু আগে ওকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। খোকার জন্যে পুতুলী কেঁদেছিল কিনা সে জানে না। কারণ খোকাকে যখন বস্তা-বন্দী করা হয় তখন মৃণাল বাড়ি ছিল না। ফিরে এসেও কিছু শোনে নি সেদিন। শোবার সময় খোকাকে না দেখে ধাক্কা লেগেছিল। বুঝেছিল পুত্র-কন্যা সমেত খোকার অন্নের পাট এবাড়ি থেকে চুকে গিয়েছে। কিন্তু খোকার পরিবার আর জোড়া লাগবে না; সে মানুষ নয়। তাই তার অপত্য স্নেহ যত প্রবলই হোক না কেন, ক্ষমতা অতি অসীম। নদীর ওপারে কোন বটতলায় কিংবা ধানের ক্ষেতে ওকে ছেড়ে দেবার পর, সবগুলো বাচ্চাকে নি

কোন গ্রামে ঢোকবার আগেই বাজ, চিল, কুকুর, শিয়াল ইত্যাদি বহুবিধ শত্রুর একটি ওর বংশধরদের কখনো অটুট অবস্থায় নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছোতে দেয় নি। নিজে খোকা হয়ত আত্মরক্ষা করতে পেরেছে কোনরকমে।

পুতলীকে কাঁদতে দেখেনি মৃণাল। খাওয়া বন্ধ করতেও দেখে নি। সে হয়ত খোকার চেয়েও আকর্ষণীয় কোন কিছুর প্রলোভন ভুলেছে।

আজ খোকার কথা কেন যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বেড়াল নাকি বিশ্বাসঘাতক জীব—কুকুরের ঠিক বিপরীত! বেড়াল প্রার্থনা করে অহরহ,—মনিব অন্ধ হোক, আমি লুটেপুটে খাই। অথচ কখনো এমন মনে হয় নি। বরং বলা যেতে পারে কুকুরের চেয়ে অনেক বেশী অক্ষম এরা। অক্ষম বলেই, যে কাজ শক্তি ফলিয়ে সোজা-সুজি করা যায়, সেই কাজের জন্যে কৌশল অবলম্বন করতে হয় এদের। এরা এত অক্ষম যে নিজের নিরাপত্তার জন্যে ব্যস্ত থাকে সব সময়।

কিন্তু খোকা-উপাখ্যান তো অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে। বেঁচে থাকলেও তার মূল্য এ বাড়িতে আর নেই। ঠিক তারই মত খোকা। তবে তাকে বস্তাবন্দী করে ফেলে দেওয়া যায় না।

টিটু এসেই দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বলে,—ফার্স্ট হয়েছ তো?

—হ্যাঁ।

—দাদা ফেল।

—আমি ষড়যন্ত্র করেছি।

টিটু মৃণালের ভীতিশূন্য কথার মধ্যে বলিষ্ঠতার লক্ষণ দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সে জানে না, মৃণাল সব চাইতে খারাপ অবস্থার জন্যে মনকে প্রস্তুত করে রেখেছে। নইলে সে নতুন ক্লাশের বুক-লিস্টটা অমন অনায়াসে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিতে পারত না।

মৃণাল বলে,—হেডমাস্টারকে ফিসফিস করে বলে দিয়েছিলাম। তিনি আবার ফিসফিস করে সব মাস্টারদের বলে দিলেন। তাই আমি ফার্স্ট আর রাজেশ ফেল।

টিটু ভয় পেয়ে ভাবে, তার এতদিনের একমাত্র উপার্জনের পথ বুঝি বন্ধ হতে বসেছে। সে জানে মৃণালের সব চাইতে বড় দুর্বলতা স্কুল ছেড়ে দেবার ব্যাপারে। নইলে বাবার হাতে মার খাওয়াকে ততটা ভয় পায় না সে। তার ওপর বাবা তাকে আর আজকাল আগের মত মারতে চায় না। দুঃখ করে বলেছিল একদিন,—ছোঁড়াটার যেন একটু একটু গোঁফের রেখা দেখা যায়। মামা বাড়ির ধাত। ছোটলোকের বংশ কিনা। নইলে আমাদের বাড়ির কারও আঠারো বছরের আগে ওসব কিছু দেখা যায় না।

মা রেগে বলেছিল,—গোঁফ দেখে ভয় পাও নাকি আজকাল?

—ভয়? এটা কেমন কথা বললে তুমি?
মা জবাব দেয় নি এ কথার। শুধু একটা মুখ ভঙ্গি করেছিল, যার পরিষ্কার অর্থ, বাবার হিম্মতে ভাঁটা পড়েছে।
আসলে টিটু জানে প্রকৃত ঘটনা। বীজেশও জানে। এমন কি মা-ও জানে। তবে কেউ কারও কাছে ভাঙে না। পুজোর সময় একদিন বাড়ি ফিরতে খুব দেরি হয়েছিল মৃণালের। শুধু দেরী হলে হয়ত বাবা মারত না. মাকে চোখ টিপে দিত খেতে না দেবার জন্য। কিন্তু হতভাগা কোথা থেকে যেন পেট ভরে খেয়ে এসেছিল। বাড়ি ফিরে যখন দেখল বাবা তাকে সামনে দেখেও কিছু করল না, তখন পরিষ্কার গলায় বলল,—আজ আমি কিন্তু খাব না। খেয়ে এসেছি।
টিটু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিল, মৃণালের উক্তি ঝাঁ করে মায়ের শরীরের রক্ত মাথায় ঠেলে দিয়েছিল। চেঁচিয়ে উঠল মা,- খাবিনে মানে? খাবার নষ্ট হবে? খেতেই হবে। আজ না খেলে কালকে খেতে হবে।
মায়ের রাগ দেখে বাবাও ক্ষেপে গেল। ছুটে এল লাঠি হাতে। সজোরে মৃণালের পিঠে বারকয়েক বসালো। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু একটু কেঁপে উঠল মৃণাল। তারপর বাবা আবার লাঠি তুলতেই তার চোখে একটা অদ্ভুত ধরনের উজ্জ্বলতা দেখা দিল। এ উজ্জ্বলতা টিটু আগে কখনো দেখে নি। সে ঘাবড়ে গেল। চকিতে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখে মা-ও কেমন যেন হতভম্ব। ততক্ষণে লাঠি নেমে এসেছে মৃণালের মাথার ওপর। নিমেষের মধ্যে সেই লাঠি খপ্ করে চেপে ধরে সে বলল,—দেখে শুনে মারবেন।
—কী! এত বড় আস্পর্ধা! গায়ে হাত—
—না। গায়ে হাত দিইনি, লাঠিটা ধরে রয়েছি।
—ছাড় বলছি। ছেড়ে দে—
টিটুর মা কেঁদে ওঠে। পরাজয়ের কান্না। বুঝতে পারে, তার স্বামী শত চেষ্টাতেও ওর রোগা লিক্‌লিকে ছেলেটা, যাকে বছরের পর বছর অর্ধভুক্ত রাখা হয়েছে, তার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিতে পারছে না।
মৃণালের চোখের আগুন অন্তর্হিত হয়েছিল। শান্ত স্বরে সে শুধু বলেছিল—ও ভাবে মারতে নেই। দুর্ঘটনা ঘটলে আপনারাই বিপদে পড়বেন।
টিটুর বাবা কাঁপতে শুরু করেছিল। ভয়ে, না রাগে কেউ জানে না। তবে সেদিন সে আর লাঠি তুলতে পারল না।
সেই থেকে মৃণালের কপালে এ ধরনের অত্যাচার ঘটে নি। মার যে একেবারেই থায় নি, তা নয়। তবে খুব মামুলি ধরনের। টিটু, বীজেশ বা পুতলীর হৃৎপিণ্ডে

সই যার রক্তের দোলা জাগাতে পারে নি।

আজ মৃণাল পড়াশুনায় ইস্তফা দেবে স্থির করে বসেছে। নইলে ষড়যন্ত্রের কথাটা অমন বিদ্রূপ করে বলতে পারত না। টিটুর কান দুটো গরম হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে ভায়ের মাথায় রক্ত উঠলে এমন হয়।

সে বলে,—বাবা, তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে।

মৃণাল একবার টেবিলের ওপরের খাতার স্তূপের দিকে চেয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তে বলে—দেবে?

—কেন? তুমি চলে যাবে নাকি?

—তাড়িয়ে দিলে কী করে থাকব? তবে যেখানেই থাকি মাঝে মাঝে এটা দেখা দিতে ভুলব না তোকে।

—তার মানে, তুমি শহর ছেড়ে যাবে না।

—কি করে বলি।

টিটু আর একটাও কথা না বলে চলে যায়। মৃণাল চুপ করে বসে থাকে। এসব দিনে তার কপালে খাবার জোটে না জানা কথা। বীরেশ নিশ্চয়ই মনের দুঃখে খাওয়া বন্ধ করেছে। সুতরাং তারও উপোস, তবে আজ সে পেট ভরেই খাবে। দীপা মাসী অনেকদিন আগে থেকে নিমন্ত্রণ করে রেখেছে। একটু পরে সেখানে যাবে।

বাড়িটা যথারীতি নিস্তব্ধ। মৃণাল চৌকির উপর শুয়ে পড়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। পুতলী এসে বলে,—তোমায় কে যেন ডাকছে।

—কে?

—চিনি না।

—হেডমাস্টার মশায়?

—না। তোমার কোন বন্ধু-টন্ধু হবে।

কৌতূহল নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে দেখে দণ্ড সমেত লাল পতাকা গুটিয়ে হাতে নিয়ে একটি অচেনা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাকার তরকারির বাগানের বেগুন গাছের দিকে চেয়ে। প্রচুর বেগুন ফলেছে এবারে।

ছেলেটা এক ঝলক তার দিকে চেয়ে নিয়ে আবার বেগুন দেখতে দেখতে বলে—বেড়ে বেগুন হয়েছে।

মৃণাল ছেলেটিকে ঠিক চিনতে পারে না।

ছেলেটি বলে,—তোদের বেগুন?

বিস্ময় চেপে মৃণাল জবাব দেয়,—আমার কাকার।

—পাঁচ ছয়টা গ্যাড়াবো আজ। বেগুন পোড়া খেয়েছিস্? টেরিফিক ভালো লাগে।

—কিন্তু তুমি—

—এই মরেছে। চিনতে পারিস নি? সে বাবা! এত খুঁজে পেতে আসাটাই মাটার হল। তোর জন্যে শালা কম ধকল সহ্য করতে হয়েছে? দলের আর সবাই কখন কেটে পড়েছে. খবর রাখিস? নেমকহারাম কোথাকার।

—তুমি সেই নদীর—

—আজ্ঞে হাঁ। মনে করে একেবারে কৃতার্থ করে দিয়েছিস্। আমি তোর কেমন গোলাম। নামটা কি বল্‌তো?

—বঙ্কিমচন্দ্র।

—হা-হাহা-রে। শুনে বোধ হি কানস্ একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেল। ব্যাটা ধোপ দুরস্ত ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়লাম দেখছি।

—কিরে বঙ্কা।

বঙ্কা মৃণালের দেহের পশ্চাতে জড়ানো ফ্ল্যাগের ডাণ্ডাটা দিয়ে পিঠে পিটতে বলে,-তবে? তবে যে শালা—

মৃণাল বঙ্কার চুলের গোছা টেনে ধরে বলে,—থাম্ বলছি।

বঙ্কা চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে,—গোটা ছয়েক বেগুন নিয়ে আয়তো আগে।

—কাকা দেখতে পাবে।

—কোন শালার কাকা দেখলাম। তোরটাই দেখা বাকী। যা—

মৃণাল বাগানে ঢুকে বেগুন নিয়ে এসে বোঁটাসুদ্ধ বঙ্কার হাতে দিতেই বাড়ির দরজা সামনে দণ্ডায়মান পুতলীর দিকে চোখ পড়ে।

বঙ্কাও পুতলীকে দেখে বলে ওঠে—ওটা কে রে? বাঁদরের বাচ্চার মত চোখ পিট্ পিট্ করছে?

—কাকার মেয়ে।

—বলে দেবে?

—নির্ঘাত।

বঙ্কা গম্ভীর গলায় ডাকে,—এই খুকী, শোনো। শুনে যাও বলছি।

তার ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করবার সাহস পুতলীর হয় না। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে।

বঙ্কা পুতলীর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলে,—এই যে বেগুন দেখছ আমার হাতে, এর কথা কাউকে বললে তোমায় আস্ত রাখব না। তোমার বাবাকেও মে

লাশ বানিয়ে দেব। আমায় চেনো না। আমি, ডাকাত জংবাহাদুর খান্ খান্ ওয়ালার ছেলে। যাও, টুঁ শব্দটি করবে না এ ব্যাপারে।

মুখখানা ফ্যাকাশে করে কান্না চাপতে চাপতে পুতলী চলে যায়।

মৃণাল বলে,—সেদিন কখন ফিরেছিলি ?

—কবে ?

—সেই বর্ষাকালে ডোঙা নিয়ে ?

—ওঃ, প্রায় শেষ রাতে।

—সে কিরে ? বাড়িতে কেউ কিছু বলল না ?

—কে কি বলবে ? অমন হামেশা ফিরি।

—আজ কোথায় এসেছিলি ?

—বি. ডি. ও অফিসে। এই যে দেখছিস ফ্ল্যাগ। প্রসেশান করে এসে চেঁচামেচি করলাম।

—কেন ?

—জেলেদের নৌকো আর জাল তৈরি করবার জন্যে সরকার থেকে ঋণ দাবী করতে। তাছাড়া নদীর এক জায়গায় বাঁধ দিতে হবে। নইলে বর্ষা একটু বেশী হলেই আমাদের গ্রাম ভেসে যায়।

—বি. ডি. ও. রাজী হয়েছে ?

—ওরা আবার সোজাসুজি রাজী হয় নাকি ? ওদের মুখে এক কথা।

—কি কথা ?

—'নিশ্চয় চেষ্টা করব'। না বলে উপায় কি ?

—এটা কিসের ফ্ল্যাগ রে ?

—সে বাবা। দেখে চিনতে পারছিস না

বঙ্কা ফ্ল্যাগ খুলে ধরে।

—ও, তুই এই দলের ?

—ঠিক তা নয়। ফ্ল্যাগ যদি এর চেয়েও লাল করা যায়, সেই দলের। আপাততঃ এদের সঙ্গে আছি। তুই ?

—কোন দলেই না। আমাদের হারু মাস্টার বলেন, তুই ছাত্রের দলে থাক। তারপর সব যখন বুঝতে শিখবি, তখন বিবেচনা মত রাজনীতি করিস।

বঙ্কা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে,—হুঁঃ।

—হুঁঃ, কেন ?

ভ্রূ কুঁচকে বঙ্কা বলে,—দলে ঢুকতে আবার বিবেচনা কিরে ? ভালবাসতে হয়

পার্টিকে।
—জানি। আমিও ভালবাসি। আবছা ভালবাসি। তেমন করে ভাবিনি কোন-দিন। ভাববার সময় পাইনি।
—ভাবিস একটু। তোর হারু মাস্টার বুর্জোয়াদের ওষুধ গিলে বসে আছে। ওষুধ না—মদ।
মৃণাল বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে,—এবারে বোধহয় ভাবতে হবে।
বঙ্কা বেগুন কটাকে বোঁটা সমেত দড়ি দিয়ে বেঁধে এক জায়গায় রেখে বলে,—চ' তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।
—আমার মা!
—গাছ থেকে পড়লি মনে হচ্ছে?
—আমার মা নেই।
—কোথায় গেল মরতে?
—অনেক বছর আগে রেলের চাকার নীচে। বাবাও। দুজনে একসঙ্গে।
—তুই শালা দারুণ লাকি তো—। নাকে কাঁদুনি নেই, দেখবার কেউ নেই। পাখা থাকলে দিব্যি উড়ে বেড়াতে পারতিস মাইরি। যাকগে, চলি আজ। ভেবেছিলাম তোর মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত গদ্‌গদ্ হয়ে কথা বলে কিছু খাবার সাঁটাবো। হল না। দিনটা উপোস করেই গেল। খুব তো গেলি?
—এবারে যাব! মনে আছে, আজমপুর।
বঙ্কা এক হাতে ফ্লাগ নিয়ে অন্য হাতে বেগুন কটা ঝুলিয়ে অদৃশ্য হয়। মৃণালের নীরস মনকে সতেজ করে দিয়ে চলে যায় সে।
ঘরে ফিরতে, টিটু এসে কোন রকম ভূমিকা না করেই বলে,—ডাকাতের ছেলেদের সঙ্গে ভাব করছ যে?
—ডাকাত?
—হ্যাঁ, পুতলী বলেছে।
—আর কি বলেছে, পুতলী?
—আর কিছু বলে নি।
বেগুনের কথা বলতে সাহস পায় নি পুতলী। নিশ্চিন্ত হয় মৃণাল।
—বাবাকে নাকি মেরে ফেলবে?
—কে?
—তোমার বন্ধু।
—পুতলীটার মাথায় কিছু নেই।

মায়ের সঙ্গে বাবার অনেক কথা হচ্ছে।

—হোক। সরস্বতী পুজোর আগে কুল খাস?

– খেলেই বা কি?

—কালই এনে দেব।

—বাজে কথা বলো না। এখন কুল পাওয়া যায় না।

—আনলে বিশ্বাস করবি তো?

—তখন দেখা যাবে।

– পুতুলীর কথা শুনে কাকা কি বলল?

নিস্পৃহ ভঙ্গিতে টিটু বলে,—আগে কুল এনে দিও, তারপর শুনো।

—সে তো কাল।

—কালই শুনো।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যায় মৃণালের। দীপা মাসীর বাড়ি থেকে খেয়ে ফিরতে একটু রাত হলেও কাকা কিংবা কাকীমা কিছুই বলে নি। ওরা বোধহয় ডাকাতের ভয় করছে। কী যেন একটা নাম বলেছিল বক্কা, তার বাবার? অদ্ভুত নাম। ডাকাতের ভয়ে কাকা শেষ পর্যন্ত তার পড়াশোনাতে বাধা নাও দিতে পারে। কিন্তু পুতুলীর কথা কি সত্যিই ওরা বিশ্বাস করেছে? সম্ভবত নয়। পুতুলীর মত ছেলেমানুষ ওরা নয়। তাছাড়া থানার কার সঙ্গে কাকার যেন ভাব আছে। প্রায়ই সেকথা শুনিয়ে দেয়। টিটুকে কুল দিলেও সে আসল কথা বলবে বলে মনে হয় না। টিটু যেমন অনেক কিছু তার কাছে প্রকাশ করে, তেমনি অনেক কিছু চেপেও যায়। সব কথা সে কখনই বলে না। সব কথা বললে তার অস্ত্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

তবু কালকে যেমন তার মনে হচ্ছিল, জীবনে আর কিছুই করবার নেই—জীবনটা ব্যর্থ হতে বসেছে—সকালে উঠে তেমন মনে হয় না। এখনো আশা রয়েছে হয়ত। আজমপুরের বক্কার মত বন্ধনহীন জীবন যাপনের সময় তার এখনো আসে নি। বুক-লিস্টের অভাব না হলেও, নিজেরটা ছিঁড়ে ফেলা অবিবেচনা প্রসূত। হারু মাস্টারের বাড়িতে যেতে হবে। কালকে প্রমোশনের পর থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করা হয়ে ওঠে নি।

মৃণাল বিস্মিত হয়, সময়মত জলখাবারের ডাক পড়াতে। খেতে বসে আর কাউকে দেখতে পায় না সে। তবে কাকীমা দৃষ্টির একটু আড়ালে চলে যেতেই বীজেশ এসে চাপা গলায় বলে,—একটা বিড়ি দিবি?

—আমি খাই না।

—দে না একটা। শোধ দিয়ে দেব।

—খেলেও দিতাম না।

—কাল থেকে না টেনে পেটটা ফেঁপে উঠেছে। দে না।

মৃণাল উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করে না।

বীরেশ ফিক করে হেসে বলে,—কাল থেকে নিরঞ্জন স্যার আমাকে পড়াবে।

—ঠিক হয়ে গিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—নিরঞ্জন স্যার ভাল পড়াতে পারেন না।

—তাতে কি হল? বাবাকে কথা দিয়েছে প্রমোশনের সময় আটকাবে না।

—তবে তো ভালই।

—দে না একটা বিড়ি।

বীরেশের কাঁচমাচু মুখ দেখে মনে হয় বিড়ির অভাবে সত্যিই বেচারা কষ্ট পাচ্ছে।

—বিড়ি নেই। দুটো পয়সা দিতে পারি।

—পয়সা পেলি কোথায়?

—পেয়েছি।

বীরেশ ফিক্ করে হেসে বলে,—চুরি করেছিস।

মৃণাল বলতে পারে না, দীপা মাসী তাকে কালকে জোর করে পঞ্চাশ পয়সা দিয়েছে খরচ করবার জন্যে। কিছুতেই সে নিতে চায় নি। শেষে দীপা মাসী কাঁদতে শুরু করলে নিতে বাধ্য হয়।

—আমি চুরি করি না।

—না বলে নিস?

—বীরেশ, পয়সা চুরি আমি করি না।

—তবে বুঝি গাছ থেকে পেলি? কোন্ গাছ রে? মা-গাছ, না বাবা-গাছ?

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে মৃণাল বলে,—যদি ইচ্ছে হয়, নিয়ে যা।

ঘরে এসে বীরেশের হাতে দুটো পয়সা দিয়ে তাকে বলে,—পুতলী কালকে কী সব বাজে কথা বলেছে কাকা-কাকীমাকে।

—হ্যাঁ। বলেছে, ডাকাতের ছেলে ওর হাত চেপে ধরেছিল।

—মোটেই ডাকাত নয়। ওদের মস্ত দল রয়েছে। কেউ কাউকে জমির ভাগ ফাঁকি দিলে, কারও ভাগের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে ওরা দল বেঁধে আসে। আমার সঙ্গে খুব ভাব। আজ বি ডি. ও অফিস ঘেরাও করেছিল।

—ওরে বাবা, সে তো ডাকাতের চেয়েও খারাপ।

—না ওরা এমনিতে কিছুই বলে না। পুতলীটা ছোট, তাই বুঝতে পারে নি।

।জেশ চলে যায়। মৃণাল জানে, একথা কাকা কাকীমার কানে উঠবে। যে কারণেই হাক ওরা তাকে কিছুটা সমীহ করতে শুরু করেছে। সুতরাং এ সময়ে আব একটু াপ দিয়ে হয়ত ভালই হল।

কটু পরে সে খিড়কির দরজা দিয়ে আমবাগানের ভেতরে ঢোকে। হারু মাস্টারকে ড়িতে পেলে হয়। তবে মাস্টার না থাকলেও লক্ষ্মীদি রয়েছে। এ সময়ে পায়রাকে যতে দেয় না লক্ষ্মীদি।

াই-এর মৃত্যুর 'ার থেকে তার সখ হয়েছে পুতুল গড়া আর ফুলের গাছ লাগ'নো। ন্দর পুতুল গড়তে পারে সে। ফুলের বাগানটিও চমৎকার হয়ে উঠেছে। হারু মাস্টার ।,—লক্ষ্মী হল শিল্পীর জাত। ভেতরের তাগিদেই সে এসব করছে। সৌন্দর্যের পাসিকা। সামর্থ্য থাকলে ওকে কলকাতার স্কুলে দিতাম। নিশ্চয়ই উন্নতি করত। ার অদ্ভুত মেধা। কিন্তু কিছুই হবে না। বনের ফুল সবার অলক্ষ্যে বনেই ঝরে 'ড়বে।

ণাল হারু মাস্টারের কথা বিশ্বাস করে। সে-ও লক্ষ্মীকে শিল্পী বলে মেনে নিয়েছে। যাজকে গিয়ে সে লক্ষ্মীকে একটা মা-লক্ষ্মীর মূর্তি গড়তে বলবে। ঘরে মা-লক্ষ্মীর ফটো দখিয়ে দিলে বুঝতে পারবে। মৃণাল অবাক হয়ে ভাবে, লক্ষ্মীদি নিজের নামটিও জানে না। সে জানে না তার মা প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় যে দেবীকে ফুল দেন, জল বাতাসা দেন, সেই দেবীর নাম তারই নাম। ভেবে দুঃখ পায় মৃণাল।

—এই।

প্রেসিডেন্টের ছেলে কেষ্ট বার হয়ে আসে একটা আমগাছের আড়াল থেকে। এখানে এসময়ে তাকে দেখে অবাক হয় মৃণাল। কেষ্টকে এগিয়ে আসতে দেখে সে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে। অনেকদিন আগে কেষ্ট তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। আজ আর অত সহজে পারবে না। কারণ সে আর একটু লম্বা হয়েছে। কেষ্টও আগের চেয়ে কিছুটা রোগা। তার মুখের ব্রণের দাগ আরও কালো।

—কোথায় যাচ্ছিস্ রে মৃণাল।

—তুমি এখানে কোথায় ?

—সে কথা তোর শুনে কি হবে ?

—আমার কথাও তোমাকে শুনতে হবে না।

—ওঃ খুব লায়েক হয়েছিস দেখছি। দেব হাত মুচকে।

মৃণাল প্রস্তুত হয়। সে জানে শক্তির পরীক্ষায় এখনো সে কেষ্টকে এঁটে উঠতে পারে না। তবে বাগানে ইটের টুকরোর অভাব নেই। তার পাশেই দু'তিনটে পড়ে রয়েছে আমের সময় সুশান্তদের মালির অনুপস্থিতিতে তার মত আরও অনেকে ইট ভে টুকরো করে তাই দিয়ে আম পাড়ে।

কেষ্ট হঠাৎ বিগলিত হাসি হেসে বলে,—অত রাগিস কেন রে কথায় কথায়। বল্ কোথায় যাচ্ছিস?

—সব বলব না। তোমাকে যেন এ-বাগানে আর না দেখি। রেল লাইন পড়ে রয়েছে সেখানে যাও নদীর ধারে যাও। ইচ্ছে করলে মাষ্টদির বাড়ি যেতে পার। কি এখানে নয়

—বাগানটা কি তোর কেনা?

কাকা-কাকীমা আর আগের মত ঘাঁটাতে সাহস পায় না তাকে। বন্ধুর মত ব লাভ হয়েছে তদুপরি। একটা খুঁজে-পাওয়া দ্বিগুণ শক্তিশালী আত্মবিশ্বাস তার মনকে দৃঢ়তর করে তোলে। সে স্বর চড়িয়ে বলে,—নিজের ভাল চাও তো, কে পড় কেষ্টদা।

—তুই তো সাংঘাতিক ছেলে রে? সিগারেট খাবি?

কেষ্ট নিজে একটা ধরায়। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বলে,—তোর লক্ষ্মীদিটা দারু মেয়ে। একেবারে টপ্। এই তো দেখলাম এঁটেল মাটি নিয়ে গেল।

মৃণালের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। লক্ষ্মীদি আমবাগানে আসে, সে জানত না। প্রশ্ন করে,—কোনখান থেকে মাটি নিল?

—ওই তো—ওই যে দেখছিস?

পুতুল গড়বার জন্যে মাটি নেয় নিশ্চয়। সে কেষ্টকে বলে,—এই বাগানে তোমাকে যে আর না দেখি।

—মারবি নাকি?

—মারতে পারি। একলা না পারলে দল নিয়ে আসব।

কেষ্ট হেসে বলে,—তোর আবার দল কোথায়? নেই। কাকার বাড়ির পাতকুড়োনো খেয়ে এতবড় হলি। একা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াস আর ওই প্রফেসারের বউ মাথায় হাত বুলিয়ে নেশার পয়সা নিস্।

মৃণালের মাথায় আগুন জ্বলে। তবু সে সংযত হয়। রেগে কোন লাভ নেই, একা কেষ্টকে কাবু করবার সামর্থ্য তার এখনো হয় নি।

—জেনে রেখো কেষ্টদা, দল আমি আনতে পারি।

জবাবের প্রত্যাশা না করে সে এগিয়ে চলে। ভাবে, কালই আজমপুর যাবার চে

করতে হবে—বঙ্কার কাছে। গতকাল বঙ্কার সঙ্গে কথা বলে, তার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে। জগতে এখন ভয় দেখাবার যুগ এসেছে। যারা এতদিন অপ্রতিহত ভাবে অত্যাচার চালিয়ে এসেছে, তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে হবে। সুযোগ বুঝে আঘাতও করতে হবে। দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। যুক্তি আর মৌখিক প্রতিবাদ অত্যন্ত ভোঁতা অস্ত্র। ওতে মাখনও কাটে না।

একবার পেছনে ফিরে দেখে মৃণাল, কেষ্ট একটা আমগাছের গোড়ায় বসে মৌজ করে সিগারেট টানছে। তার সাবধান-বাণীকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে নি, কারণ মাথায় এখনো সে কেষ্টর চেয়ে সামান্য ছোট এবং দেহও ছিপ্‌ছিপে। সে দুর্বল বলেই কেষ্ট অতটা নিশ্চিন্ত। সারা শরীর শক্ত করে মৃণাল। দুদিনের মধ্যে বলিষ্ঠ হওয়া যায় না বঙ্কার মত ?

বড়দিনের ছুটির পর স্কুল খুলে গেল। কাকা কিছুতেই ভর্তি হতে দিল না মৃণালকে। হেডমাস্টার এসে অনুরোধ করে গেলেন। হারু মাস্টার প্রথমে বুঝিয়ে এবং পরে রেগে গিয়ে অনেক অপ্রিয় সত্য শুনিয়ে গেল। তবু কাকা অবিচল।

মৃণাল বুঝল, মারধোর করতে সাহস না পেলেও, কাকার তুণে মারাত্মক অস্ত্রের অভাব নেই। ভেবেছিল বঙ্কার ভয়ে হয়ত পড়াশোনাটা বন্ধ করে দেবে না। সব ভুল।

সত্যিই যে তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল, একথা ভাবতে পারে না সে। ক্লাশে ফার্স্ট হয়েও সে পড়তে পাচ্ছে না, অথচ হাবলুকে বলে-কয়ে তুলে দেওয়া সত্বেও সে নতুন নতুন বই নিয়ে স্কুলে যায়। হাবলু তার সঙ্গে আবার একটু-আধটু কথা বলতে শুরু করেছে। বুঝতে পেরেছে দেবু আর সুশান্তর সঙ্গে বড় বেশী মিশেই তার লেখাপড়ার ক্ষতি হয়েছে। এমন আভাসও দিয়েছে যে, আগের মত আবার বই দেবে সে মৃণালকে। তবু ছেঁড়া তার কি সহজে জোড়া লাগে ? হাবলুর সঙ্গে কিছুতেই আগের মত মিশতে পারে না। তাছাড়া হাবলু তেমন আর সরলও নেই যেন। এতদিন নির্বোধ থেকে সহসা পৃথিবী সম্বন্ধে অতিরিক্ত জেনে ফেলে কেমন বোকা-চালাক হয়ে উঠেছে।

হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে মৃণাল একদিন বলে,—তার নামটা যেন স্কুলের খাতায় রাখা হয়। সে বই যোগাড় করে পরীক্ষা দেবে কোনরকমে।

দুঃখিত হেডমাস্টার বলেন,—তা হয় না মৃণাল। তোমার পক্ষে একা একা পড়া সম্ভব নয় এই বয়সে। তাছাড়া স্কুলে ভর্তি না হলে নাম রাখা যায় না। ভর্তি হও, সব ঠিক থাকবে। তোমার ফ্রী-স্টুডেন্টসিপ'টা যাতে থাকে, সে চেষ্টা আমি

করব। তুমি বরং কাকাকে যে করে হোক রাজী করাও।

মৃণাল চলে আসে। সব ছেলে ক্লাশে। সে একা শুধু স্কুলের বাইরে। মৌমাছির চাকের মত একটা গুন্গুন্ শব্দ ভেসে আসছে স্কুল বাড়ি থেকে। ছাত্র আর শিক্ষকদের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ। হাটের মত অতটা নয়—তবু বেশ বোঝা যায়। মৃণাল জানে, এমন অবস্থায় অন্য কেউ হলে কেঁদে ফেলত। কিন্তু সে কাঁদতে পারে না—কোনদিন পারবে বলেও বিশ্বাস হয় না।

আজমপুরে যাবে সে। বন্যার সঙ্গে দেখা করবে, এর মধ্যে একবার গিয়ে দেখা করে এসেছে। হেঁটে যেতে অনেকটা সময় লাগে। তাই ভবিষ্যতে যাবার জন্যে সাইকেল চালানো আরও ভালভাবে শিখতে হবে। এখনো অবিশ্যি মোটামুটি চালাতে পারে। সহপাঠী মকবুল তার সাইকেলখানা দিয়ে সাহায্য করেছে।

বন্যা তাকে দেখে খুব খুশী হয়েছিল। ঘুরে ঘুরে নিজের গ্রাম দেখিয়েছে। আবার আসতে বলেছে। সে যাবে। বন্যাকে কাকার এবং তার পড়াশোনার সব কথাই বলেছে। এবারে গিয়ে বলতে হবে কাকাকে ভয় না দেখালে চলবে না। কাজটা গর্হিত হবে। কিন্তু কী করতে পারে সে? তার নিজের দল নেই, সে দল ছাড়া—একা। সুতরাং বন্যার দলের সহায়তা তাকে নিতে হবে।

পথে পথে ঘুরতে থাকে মৃণাল। ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যাবার জায়গা নেই। এক যেতে পারে দীপা মাসীর বাড়ি। কিন্তু কি হবে সেখানে গিয়ে? মাসীকে আজকাল বড় বেশী ন্যাকা ন্যাকা মনে হয়। বলে,—এই তো আমার সোনামাণিকের গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে।

শুনতে বড় খারাপ লাগে তার। তবে একথা ঠিক, মাসী তার কোন ক্ষতি করে নি কখনো। তার ন্যাকামী হল স্বভাবগত। একে ন্যাকামী বলাও হয়ত ভুল। কারণ অন্যের কাছে মাসী গম্ভীর। আসলে মাসী তার মধ্যে কী যেন খুঁজে পায়।

আর একদিন মাসী বলেছিল,—তোকে নিয়ে আমার বিরাট দ্বন্দ্ব। একদিকে তুই আমার মাতৃত্বকে তৃপ্তি দিস, অন্য দিকে আর এক ব্যাপারে হাতছানি দিস্। বুঝবি না। অনেক বড় হয়ে যদি কখনো আমাকে প্রশ্ন করিস বুঝিয়ে বলব। তুই মৃণাল, আমার ছেলের মত—আবার তুই আর একজন।

—কে?

চিনবি না। একজন ছিল, ঠিক তোরই মত। হুবহু এক।

দীপা মাসীর চোখের জল গড়িয়ে পড়েছিল।

মাসীর কথা মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে মৃণাল চলতে চলতে বহুদিন পর আবার জয় মা-কালী সাইকেল স্টোর্সে এসে বসে।

লু বলে,—কিরে মৃণাল, কি মনে করে বাবা।

-এম্‌নি। স্কুল ছেড়ে দিলাম কিনা।

-তুই ছাড়লি, না কাকা ছাড়ালো।

-একই কথা। লেখাপড়া বন্ধ, এটাই হল আসল কথা।

-তোর কাকা একটা হারামজাদা। আমার নিজের কথা নয় এটা। শ্বশুর মশায় লে একথা।

-জীবনদাকে দেখছি না তো?

·খেতে গিয়েছে বাড়িতে।

শুনলাম মান্তুদির ছেলেপিলে হবে?

লু হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলে,—কে বলল রে? মাত্র তো দুমাস। তুই ানলি কি করে?

·তোমার শ্বশুর সত্যনারায়ণের পূজো করতে এসে, কাকীমাকে বলেছিল সেদিন।

হ্যাঁ। ঠিক কথাই বলেছে।

-জীবনদার খুব আনন্দ বুঝি?

-সে কথা আর বলতে? মুখে আগুন দেবার মানুষ আসছে।

-যদি মেয়ে হয়?

-বালাই। ওকথা উচ্চারণ করিস না। জীবন শুনতে পেলে ফাটাফাটি হয়ে যাবে। বিশ্যি মেয়েও হতে পারে। সেটাও ভাগ্য। তবে লোকে তো আশা করে ছেলে -ছেলের কথাই আগে মনে হয়।

ণাল হেসে বলে,—একটা বিড়ি দাও তো।

-অভ্যাস করেছিস তাহলে? ভালই করেছিস। এই নে—

ণাল সেটি কোন রকমে ধরিয়ে সাবধানে টানতে থাকে। গলার ভেতরে কিছুতেই োয়া নেয় না।

রও কিছুক্ষণ বসে থেকে সে উঠে পড়ে। এই ভাবেই দিনের পর দিন কাটাতে বে তাকে। এখানে বসে, ওখানে বসে। এখানে দুটো গল্প করে, ওখানে একটা ড়ি টেনে। শেষে হয়ত এই সাইকেল স্টোর্স কিংবা কোন খাবারের দোকানে জে লেগে যাবে। তার দোকানে এসে সুশান্ত একটা চেয়ারে বসে কড়া মেজাজে বে,—দুটো সিঙারা—এক কাপ চা—জল্‌দি।

থাটা ভাবতেই আগুন জ্বলে মৃণালের মাথায়। সে জোর পা চালিয়ে কাকার ফিসে যায়। সোজা কাকার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকে দেখতে পেয়ে কাকার লাল হয়ে ওঠে। গম্ভীর ভাবে চেয়ার ছেড়ে বাইরে এসে ফেটে পড়ে,—কেন

এসেছিস এখানে ?

—আমি পড়ব।

—ইস্ পড়বে। কে পড়াবে ?

—কাউকে পড়াতে হবে না। মাইনা লাগবে না। বই-ও কিন্‌তে হবে না।

কাকা কাঁপতে কাঁপতে বলে,—ওসব চলবে না। আমার বাড়িতে থাকতে হলে ও চলবে না।

—বাড়িটা আপনার একার নয়।

—কী ? কী বললি ?

—বলছি, বাড়িটা আপনার একার নয়। ঠাকুর্দার বাড়ি।

কাকার মুখ বিবর্ণ দেখায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,—তুই—তুই—আচ্ছা—আ

—বাড়িতে গিয়ে দেখাব—

মৃণালের রোগা শরীর ঋজু হয়ে ওঠে। তারও চোখ লাল, চোয়াল শক্ত। সে ব

—মারতে চেষ্টা করলে, ব্যথা পাবেন।

—তুই—তার মানে—আমাকে মারবি ?

—না। তবে আমাকে মারতে দেব না। আমার জমিগুলো ঠিকঠাক করে দি আমার অংশে একাই থাকতে পারব

-ওসব চলবে না। তোর জমি এক ফোঁটাও নেই। দাদার ছেলে বলে আ দিয়েছিলাম তোকে। আজই তাড়িয়ে দেব। যারা তোর মাথা খাচ্ছে, তা মামলা ঠুকতে বলগে। আমি জানি, ওই হারু মাস্টার সব অনর্থের গোড়া।

হন্‌হন্ করে কাকা অফিস ঘরের ভেতরে চলে যায়।

মৃণাল কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অফিসের ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা।

আবার ছোটে জয়-মা-কালী স্টোর্সে। গিয়ে দেখে জীবন এসেছে, ভেলু নেই।

জীবন হেসে বলে,—শুনলাম তুই জেনে ফেলেছিস্ ?

—হ্যাঁ জীবনদা। খাওয়াতে হবে।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু শশুরটা ঝামেলা বাধাচ্ছে দেখছি। সাত তাড়াতাড়ি বেড়াচ্ছে।

—ভালই তো। সুসংবাদ চেপে রাখতে নেই।

—বোস্।

—না জীবনদা। এক জায়গা থেকে ঘুরে এসে বসব।

—আমাকে একটা সাইকেল দেবে ?

—সাইকেল ? চড়তে জানিস ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় যাবি?

—আজমপুর।

—সে তো বেশ দূর। হঠাৎ সেখানে যাবি কেন?

—দরকার আছে। দেবে একটা সাইকেল?

—ভেঙে টেঙে ফেলবি না তো? পরের জিনিস সব।

—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি।

জীবন সাইকেলের স্তূপ থেকে একটা বেছে বার করে এনে বলে,—এটা নে। বীরুবাবুর সাইকেল। বীরুবাবু শিলং গিয়েছেন। ধরা পড়বি না।

মৃণাল তাড়াতাড়ি সেখানা নিয়ে চেপে বসে। বক্কার কাছে যেতে হবে। তার দলকে না এনে উপায় নেই। কাকা আইন দেখাচ্ছে। সে শুনেছে, ওসবে অনেক ঝামেলা। মামলা করার সামর্থ্যও তার নেই। বোঝেও না কিছু। শাসিয়ে যদি সুবিধা আদায় করা যায়।

খোয়া ফেলা রাস্তা শেষ হয়ে যায়। কাঁচা রাস্তা শুরু হয়। মৃণাল সাধ্যমত তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টা করে। খুব পাকা সাইকেল আরোহী সে মোটেই নয়। মকবুলের দৌলতে যেটুকু শিখেছে। মকবুল ছেলেটা পড়াশোনায় ভাল—স্বভাবও খুব নম্র। গ্রাম থেকে রোজ সাইকেলে এসে স্কুল করে। টিফিনের অবসরে শিখে নিয়েছে মৃণাল। এতদিনে বিদ্যাটা কাজে লাগানো গেল ভেবে মকবুলের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার বুক ভরে ওঠে।

দুপাশে মাঠ। এদিক থেকে রেল লাইন দেখা যায় না। তবে ট্রেনের শব্দ ভেসে আসছে। ব্রীজের ওপর উঠেছে ট্রেন। ওই ব্রীজ পার হতে গিয়ে এবারে একজন কাটা পড়েছে। মৃণাল খবরটা শুনেই ছুটে গিয়েছিল তাকে দেখতে। কিন্তু রক্ত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় নি। আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল লাশ। লোকটার নাম জানে না সে—তবে মুখ চেনে। গ্রাম থেকে লাউ বিক্রি করতে আসত বাজারে।

ট্রেনের শব্দ আর নেই। এখন মৃণাল ভাবতে পারে না সে দেড়-দু বছর আগে ওই শব্দ তার শরীরকে পঙ্গু করে দিতে চাইত। তার চোখের সামনে ভেসে উঠত মায়ের ফর্সা পা—বাবার বিকৃত দেহ। সে-দৃশ্য এখনো যে তার চোখের সামনে একেবারে ভাসে না এমন নয়। তবে তীব্রতা অনেক কম। বাবার কথা, মায়ের কথা তার মনে হয় মাঝে মাঝে। আজ যেমন হয়েছিল কাকার অফিসে গিয়ে। বাবাও ওই অফিসে কাজ করত। আবছা মনে পড়ে, একবার বাবার সঙ্গে সে

গিয়েছিল ওই অফিসে। সেইদিন জীবনে সে প্রথম চা খায়। খুব উপাদেয় লেগেছিল তার কাছে। এখন অবিশ্যি সে চা খায় না নিয়মিত। দীপা পিসীর বাড়িতে গেলে পাওয়া যায়। কাকীমা দেয় না—চিনি আর দুধের খরচা বাঁচায়। যে বয়স্কা স্ত্রী-লোকটি বাসন মেজে দেয়, সে তো রোজই মুখ ঝামটা দেয় কাকীমাকে। বলে,—মাইনের সঙ্গে দুবেলা দুকাপ চা-ও তো দেবার কথা ছিল বউ। তবে কেন এমন পাঁচ বানাও। একি মুখে তোলা যায়?

—কেন, কী হয়েছে শুনি?

—এটা কি চা? না আছে একরত্তি দুধ, না আছে ছিটেফোঁটা চিনি। অনেক হাড় কিপ্টে দেখেছি বাবু, তোমার মত এমনটি আর চোখে পড়ল না।

—অত কথা শুনিও না অম্বিকের মা। কী এমন নবাব-নন্দিনী এসেছ তুমি? চ দেব কথা ছিল বলে, মাথা বিকিয়ে দিইনি। এমন কথা ছিল না যে এক কাপ চায়ে পাঁচ হাতা দুধ আর এক কিলো চিনি দেব।

—অম্বিকের মা প্রায়ই চা ফেলে দিয়ে দুপ্‌দাপ্‌ করে উঠে যায়। কাজের শেষে আরাম করে চা খাবার ভাগ্যও নেই তার, কাকীমার জ্বালায়।

আজমপুর গ্রামে ঢুকে মৃণাল দেখে গ্রামবাসীরা সবাই পথে দাঁড়িয়ে। সবাই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জটলা করছে। দৃশ্যটা খুবই অস্বাভাবিক। একটা কিছু ঘটে গিয়েছে। বঙ্কার বাড়িতে গেলেই বোঝা যাবে। সে পথের মানুষের দিকে চাইতে চাইতে ধীরে ধীরে সাইকেল চালায়। হয়ত ওদের মধ্যে বঙ্কাও রয়েছে কিন্তু চোখে পড়ে না তাকে।

একজন লোক হাত তুলে থামিয়ে তাকে প্রশ্ন করে,—কোথা থেকে আসছ গো?

মৃণাল বলে।

—ও। তা চলেছ কোথায়?

—বঙ্কার বাড়িতে। বিশেষ দরকার তার সঙ্গে।

—বঙ্কা? বঙ্কা ঘোষ?

—হ্যাঁ।

সবাই এসে ঘিরে ধরে তাকে। একজন বলে ওঠে,—ভাল দিনে এসেছ তুমি।

…কেন? সে নেই?

—এই তো নিয়ে গেল তাকে।

—কে? কোথায় নিয়ে গেল?

প্রশ্নটা করেই মৃণালের আশঙ্কা হল, হয়ত রূঢ় জবাব শুনবে,—শ্মশানে।

—এই তো পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল তার দলকে।

নিশ্চিন্ত হলেও, হতাশ না হয়ে পারে না মৃণাল। এতদূর আসাটা হল পণ্ডশ্রম। প্রশ্ন করে,—কেন ধরে নিয়ে গেল ?

—সে অনেক কথা। ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে এখনি যাও। সাইকেল রয়েছে তোমার।

—কিন্তু ও তো ছোট।

—তবু ওকে ভয় পায় পুলিশ। শীগ্‌গির যাও।

মৃণাল জোর প্যাডেল করে। অনেকটা দূর গিয়ে সে দেখল পুলিশ বেষ্টিত বঙ্কারা চলেছে হাঁটাপথে। এ পথে অন্য কোন গাড়ি আসবার উপায় নেই।

সে পেছন থেকে চিৎকার করে,—বঙ্কা।

অগ্রবর্তী দল থেমে যায়। মৃণাল কাছে এসে বলে,—তোর কাছে এসেছিলাম যে—

বঙ্কা হেসে বলে,—সাইকেল পেলি কোথায় রে শালা ?

—একটা দোকান থেকে।

—খুব দরকারে পড়েছিস মনে হচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

—কাকা বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—ইস্, কালকে আসতে পারলি নে।

—কি করি বলত ?

—ছাড়া পেলে, তবে—

—ঠিক আছে। তোকে এরা খেতে দেবে তো ?

—জানিনে। প্রথম যাচ্ছি। তবে না দিয়ে যাবে কোথায় ? আমরা হলাম বিপ্লবী। তুই-ও-হ। দেখবি দারুণ জিনিস।

—হব।

—জানি, তুই হবিই। তোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। তখন আমার রোয়াব এতটা খাটবে না।

—কেন ?

—তুই শালা সাংঘাতিক ছেলে। বুঝিস না নিজে ?

—না। চলিরে। সাইকেলটা আমার ফেরৎ দিতে হবে।

—এসে, তোর সঙ্গে দেখা করব।

হতোদ্যম হয় মৃণাল। তবু একবার পেছন ফিরে বঙ্কার চোখোচোখি হতে হাত নাড়িয়ে উৎসাহ দেয়। বঙ্কা বিপ্লবী !

শহরে ফিরে এসে মৃণাল সাইকেলখানা জমা দেয় স্টোর্সে।

জীবন বলে,—পনেরো মিনিট বেশী সময় নিয়েছিস।

ভেলু বলে,—হোক্‌গে। এ তো আর ভাড়া দিস্‌নি। নে, মৃণাল একটা বিড়ি ধরা।

—নাঃ, এখন খাব না। এক গ্লাস জল খাই বরং।

ভেতরে গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢক্‌ঢক্‌ করে নিঃশেষ করে ফেলে বাইরে আসে।

ভেলু বলে,—এঃ, শীতের দিনেও চোখ মুখ লাল করে ফেলেছিস? স্কুল ছেড়ে দিয়ে তোর মাথায় ভূত চাপল নাকি?

জীবন বলে,—ওর কাকাটাকে ল্যাম্প-পোস্টে ঝোলান উচিত। ক্লাশের ফার্স্ট বয়। শালা, হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরে। নিজের ছেলে তো আকাট।

এদের কথা মৃণালের কানে যায় না। সে ভাবে, এবারে কী করতে পারে? কাকা হয়ত বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। দীপা মাসীর বাড়িতে কিছুতেই থাকতে পারবে না। ওর বরকে সহ্য করা অসম্ভব। তাছাড়া মাসীও দিন-রাত্তির কাছে পেয়ে তাকে উত্যক্ত করে মারবে। হারু মাস্টারের বাড়ি থাকবার প্রশ্ন ওঠে না। মাস্টারের নিজেরই দিন চলে না। ক্ষেপা-ঘোষকে বলে দেখা যেতে পারে। ওদের ঘর খালি পড়ে থাকে। তাছাড়া কয়েকদিনের জন্যে দুটো খেতে দেওয়াও হয়ত অসম্ভব হবে না ওর পক্ষে। বন্ধার জন্যে কয়েকদিন অপেক্ষা করেও সে যদি ফিরে না আসে, তবে একটা কাজ যোগাড় করে নিতে হবে ইতিমধ্যে। কাকার অন্যায়ের প্রতিবিধানের চেষ্টা না করে, তার মা-বাবার এই ছোট্ট শহরটি ছেড়ে কিছুতেই সে যাবে না।

ক্ষেপার বাড়িতেই যাবে সে। তাকে আজকাল আর কেউ মাতাল অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে না। প্রশ্ন করলে হাসে। বলে,—ছেলে জানতে পারলে, বলবে কি? শেষে বাপের দেখাদেখি সে-ও যদি মাতাল হতে শেখে?

তার কথার ধরনে সবাই আমোদ পায়। একথা কারও অজানা নয় যে ক্ষেপা ঘোষ বাপ হতে চলেছে। মৃণাল কালও লক্ষ্য করেছে, ক্ষেপার স্ত্রীর রোগা-চিম্‌ড়ে শরীরেও যেন একটু মাংস লেগেছে। ফর্সা রঙ আগের মত ফ্যাকাশে দেখায় না—গোলাপীর ছোপ্‌ লেগেছে।

ক্ষেপা ঘোষের বাড়ি গিয়ে পৌঁছোতেই সে দেখতে পায় মিউনিসিপ্যালিটির কয়েকজন লোক তার বাড়ি থেকে খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বার হয়ে আসছে। ওদের একজনের হাতে একখানা নতুন শাড়ি।

মৃণাল একজনের নাম জানে। চৈতন্যবাবু। রাস্তার জলের কল মেরামত করে। তাকে প্রশ্ন করে,—ক্ষেপাদা কোথায়?

—হাসপাতালে।
—ছেলে হয়েছে?
চৈতন্যবাবু চট্‌পট্ জবাব দেয়,—না, ছেলে হবার দেরী ছিল দু' এক মাস।
—তাহলে হাসপাতালে কেন?
তুমি জান না? ক্ষেপার বউ তো মারা গেল একটু আগে।
—ক্ষেপাদার বউ? মারা গিয়েছে?
—হ্যাঁ।
মৃণাল পাথর হয়ে যায়। এ-ধরনের মৃত্যু সে কল্পনাও করে নি। ঠিক যেন ট্রেনে কাটা পড়া। ভাল মানুষটি নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি ফিরছে কিংবা লাউ নিয়ে বাজারে যাচ্ছে বেচতে—মুহূর্তের মধ্যেই সে আর নেই। কালও সে দেখেছে ক্ষেপার বউ ময়নাকে। তার সঙ্গে হেসে কথা বলল।
চৈতন্যবাবুরা এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা দূর। মৃণাল ছুটে যায় তাদের কাছে।
—কেন মারা গেল?
—পেটের ছেলের জন্যেই মরল, আবার কেন?
—ছেলের জন্যে মরে যায়?
—মরে—মরে। এমনিতেই কি লোকে তাদের বলে শত্রু? সবচেয়ে বড় শত্রু।
—কালও তো ভাল দেখেছি।
—ঠিক দেখেছ।
মৃণাল চুপ করে চলে ওদের সঙ্গে।
ওরা বলাবলি করে,—হাসপাতালে নেই ওষুধ, নেই যন্ত্রপাতি। পেট কেটে ছেলেটাকে বার করতে পারলে বেঁচে যেত।
—কে বার করবে শুনি? ডাক্তার তো নেই এখানে। তাকে বড় অফিস থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।
—মাত্র তো একজন ডাক্তার—তাকেও ডেকে পাঠায়?
—ভাগ্যে নেই। নইলে এতদিন থাকতে আজকেই বা হবে কেন অমন? বউটার স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়ে উঠেছিল। ডাক্তার থাকলে বাঁচতে পারত।
মৃণালের চোখের সামনে ক্ষেপা ঘোষের উদ্দীপনাপূর্ণ মুখখানা ভেসে ওঠে। মাতাল ক্ষেপার সঙ্গে সে-ক্ষেপার কত পার্থক্য। মাতাল ক্ষেপার চোখের জ্যোতি যেন নিভে থাকত। আজকালকার ক্ষেপার চোখে জ্বলত আলো—সে আলোয় ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন।
হঠাৎ থেমে পড়ে মৃণাল। প্রশ্ন করে,—ছেলেটা বাঁচতে পারত?

ওরা এ কথার জবাব দেয় না। প্রয়োজন বোধ করে না।

মৃণাল আর যায় না ওদের সঙ্গে। একটা বউ-এর মৃত্যুশীতল চেহারা দেখে কী করবে সে? ক্ষেপার অশ্রু দেখেও লাভ নেই। কিংবা হয়ত ক্ষেপা কাঁদছে না। মৃত্যুর আকস্মিকতায় তার কান্না স্তব্ধ। সে যেমন চেয়েছিল তার মায়ের ধবধবে ফর্সা কাটা পায়ের দিকে, তেমনি ভাবে চেয়ে রয়েছে ক্ষেপা ফর্সা বউ-এর মুখের দিকে। সে মুখে কোন ভাষা নেই—ভাবও নেই। নির্বিকার সে মুখ। ঠিক যেন ঘুমিয়ে রয়েছে হারু মাস্টারের শিশু-পুত্রকে দেখে মৃণালের তাই মনে হয়েছিল। ক্ষেপাকে সান্ত্বনা দেবার সাধ্য নেই তার। যেমন পারে নি হারু মাস্টারকে সান্ত্বনা দিতে। সান্ত্বনার কথাগুলো অশ্রুসজল হয়ে ওঠা প্রয়োজন। তার সে ক্ষমতা নেই

মৃণাল ফিরে আসে। ক্ষেপা ঘোষ আবার মদ ধরবে। দ্বিগুণ মাতাল হবে। এবারে কোন কারণে রেল লাইনের ওপর মত্ত অবস্থায় পড়ে গেলে, বউ-এর চাল লাইনের ওপর ছিটকে না পড়লেও, তাকে আর টেনে তোলা যাবে না। গাড়ির চাকা তার দেহের ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে যাবে। বাধা পাবে না। বাধা দেবার সামর্থ্য থাকলেও দেবে না মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেপা ঘোষ। পথে ঘাটে পড়ে থাকলেও সে আর গাছপালার সঙ্গে কথা কইবে না। দ্বিগুণ মাতাল হলে সেই সামর্থ্য থাকে না মানুষের। মৃণাল দেখেছে তেমন মানুষ। তখন শুধু একটা অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ ওঠে— পৃথিবীর সব কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

কিছুটা চলে আবার থেমে পড়ে মৃণাল। শ্মশানে গেলে হত। একটা দেহ চিরকালের জন্যে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে—যে-দেহকে সে চিনত। শেষবারের মত দেহটিকে দেখে নিলে হত।

নাঃ, যাবে না শ্মশানে।

কিন্তু কোথায় যাবে? কাকা ঠিক অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ব্যূহ রচনা করে রেখেছে তাকে বাড়িতে ঢুকতে না দেবার জন্যে। তবু একবার যাবে সে— নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার শেষ চেষ্টা করবে। তবে প্রথমেই যেতে চায় না।

দুপুর গড়িয়ে চলতে লাগল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই শীতের সূর্য লাল হয়ে উঠবে। একটা অস্থায়ী আস্তানার সন্ধানের চেষ্টা তাকে করতেই হবে—যতদিন বঙ্কা ফিরে না আসে। বঙ্কা এলে সেও ওর দলের একজন হবে। বঙ্কা লেখাপড়া করে না। কিন্তু সে যে ভাল কাজ করে, এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আজ, তার গ্রামবাসীর চোখে-মুখে, কথায়-বার্তায়, ভাবে ভঙ্গিতে। বঙ্কা সত্যিই বিপ্লবী। বিপ্লবীদের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ভাব বরাবর পোষণ করে এসেছে মৃণাল। দেশ-বিদেশের অনেক

বিপ্লবীর কথা সে পড়েছে। বঙ্কা হয়ত তাদের মধ্যে একজন। বিপ্লবী বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ।

চলতে চলতে একসময় হারু মাস্টারের বাড়ির উঠোনে পা দেয় সে। মাস্টার এখন স্কুলে। লক্ষ্মীদির সঙ্গে কিছুটা সময় সে কাটাতে পারবে। মাথায় যে-আগুন জ্বলছে, লক্ষ্মীদির কাছে কিচ্ছুক্ষণ থাকলে সে-আগুন নির্বাপিত হবে। ঠাণ্ডা মাথায় আবার সে ভাবতে পারবে।

কিন্তু কোথায় লক্ষ্মীদি? উঠোনের মধ্যে সদ্য সমাপ্ত একটি গণেশ মূর্তি শুকোচ্ছে। আশেপাশে কেউ নেই। ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে, লক্ষ্মীদির মা একমনে বিড়-বিড় করছে। ছেলেটি মারা যাবার পর থেকে এমন হয়েছে তার। এমনিতে সবকিছু ভাল। একা থাকলে অদৃশ্য কারও সঙ্গে ক্রমাগত কথা বলে চলে।

—লক্ষ্মীদি কোথায় কাকীমা?

হারু মাস্টারের বউ চমকে উঠে তাকায়,—ওমা তুই? আমি ভাবলাম কি, কে ডাকে আমায়? খোকা নাকি? চেয়ে দেখি, ওমা তুই দাঁড়িয়ে রয়েছিস। তা, তুই বুঝি লক্ষ্মীকে খুঁজছিস?

—হ্যাঁ।

—এই তো ছিল একটু আগে। হাতে কাদা মেখে পুতুল গড়ছিল। দেখগে, বোধহয় আমবাগানে গিয়েছে মাটি আনতে।

আমবাগানে আসে মৃণাল। বাগান পার হলেই তাদের বাড়ি। কাকা এসে বসে রয়েছে নিশ্চয়।

গাছের পাতা স্তব্ধ। শীতের স্তব্ধতা—ঝড়ের পূর্বাভাস বলা যায় না।

মৃণাল এগিয়ে যায়। লক্ষ্মীদি কোথা থেকে মাটি নেয় সে জানে।

এগিয়ে গিয়ে যে দৃশ্য তার চোখে পড়ে তাতে দৃষ্টি তার বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে নিতে এতটুকু ভুলচুক হয় না তার। একটা বড় ইটের টুকরো হাতে তুলে নিয়ে বিদ্যুত-গতিতে সে ছুটে যায় যেখানে প্রিন্সিপ্যালের ছেলে কেষ্ট লক্ষ্মীদিকে মাটির ওপর শুইয়ে ফেলেছে, আর লক্ষ্মীদি কাটা পাঁঠার মত ছটফট্ করছে মুক্তি লাভের আশায়। তার দেহ মাটিতে মাখামাখি, তাতে শাড়ি এলোমেলো। লক্ষ্মীদির মুখে এক বিচিত্র ক্রন্দনের চাপা আওয়াজ—এমন কখনো শোনে নি মৃণাল।

কিছুতেই এই বোবা মেয়েটিকে বাগে আনতে না পেরে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে কেষ্ট। লক্ষ্মীদির মাথাটা চেপে ধরেছে সে মাটির সঙ্গে। কি ভাবে কামড়াতে হয় লক্ষ্মীদি জানে না। মানুষকে যে সময় বিশেষে জখম করতে হয় তাও জানে না। সে অসহায়।

একেবারে কাছে এসে ইঁটের টুকরোটি দিয়ে কেষ্টর মাথায় সজোরে আঘাত করে মৃণাল। মুহূর্তের মধ্যে কেষ্টর হিংস্র থাবা আলগা হয়ে যায় লক্ষ্মীদির দেহ থেকে। হাত দু'খানা অসাড় হয়ে পড়ে। সে ছট্‌ফট্ করতে করতে কাত হয়ে একপাশে গড়িয়ে পড়ে। তার মাথার নীচের জমি তাজা রক্তে লাল হয়ে ওঠে।

লক্ষ্মীদি কোনরকমে উঠে শাড়ি ফেলে রেখে সায়া সমেত ছুটে এসে মৃণালকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকিয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে। তার মুখ রক্তবর্ণ--চোখে জল। এতদিনে মৃণালের খেয়াল হল, সে বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে। অথচ একবছর আগেও লক্ষ্মীদি তার চাইতে মাথায় হয়ত একটু বড়ই ছিল।

কিছুক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁপুনি থামে লক্ষ্মীদির। মৃণাল তার শাড়িটা কুড়িয়ে এনে দেয়। লক্ষ্মী সেটা গায়ে জড়িয়ে নেয়। মৃণাল তার হাত ধরে বাড়ির দিকে নিয়ে চলে। যাবার আগে চেয়ে দেখে, কেষ্ট তেমনি পড়ে রয়েছে—শরীরে কোনরকম চাঞ্চল্য আছে বলে মনে হয় না। হয়ত মরে গিয়েছে।

লক্ষ্মীদিকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে প্রথম মৃণালের খেয়াল হয়, বিপ্লবী হবার সুযোগ জন্মের মত তার হাতছাড়া হয়ে গেল। পরিবর্তে আজ থেকে সে হল খুনী। মানুষ খুন করেছে সে। একটু পরেই পুলিশ আসবে তাকে ধরে নিয়ে যেতে। কাকাকাকীমা আজ কিংবা কাল বাড়িতে পায়েস তৈরি করবে। সামান্য উপলক্ষ্যেই কাকীমার পায়েস তৈরীর বাতিক।

নাঃ, সে থাকবে না এ-শহরে। কাকা-কাকীমা, হেডমাস্টার, হারু মাস্টার এবং সমস্ত স্কুলের ছেলেদের চোখের সামনে পুলিশ তাকে খুনী বলে ধরে নিয়ে যাবে—এ অসহ্য। কিন্তু কোথায় যাবে সে ? যেদিকে দুচোখ যায়। যাবার আগে একবার হারুমাস্টারকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা বলে যেতে হবে। এখনো স্কুল চলছে। মাস্টারকে সেখানেই ধরতে হবে। না বললেও চলত। কিন্তু লক্ষ্মী কথা বলতে পারে না। তার মাকেও বলা যাবে না। কারণ অল্পেতেই সে মূর্ছা যায় ইদানীং। তাছাড়া কেষ্ট পড়ে রয়েছে। যদি তার প্রাণ থাকে, বাঁচানো দরকার। সময় নষ্ট করলে সে বাঁচবে না। মৃণাল চেয়ে দেখে লক্ষ্মী নিঃশব্দে কাঁদছে। অবিরল অশ্রু ধারা গড়িয়ে পড়ছে। সেই জল মুছিয়ে দিয়ে ইসারায় বলে সে, হারু মাস্টারকে ডেকে আনতে যাচ্ছে।

তার কথা বুঝতে পারে লক্ষ্মী। বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছে সে। তবু উঠে দাঁড়িয়ে মৃণালের গালে আর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সেও বোধহয় অনুভব করে, মৃণালের বিপদ ঘটবে। মৃণাল অনুভব করে যদি পরিত্রাণ সে পায়, তবে লক্ষ্মীদির আশীর্বাদেই পাবে।

স্কুলে গিয়ে দেখতে পায় হারু মাস্টার তাদেরই ক্লাশে রয়েছে। অন্য দিন হলে হয়ত

দ্বিধাবোধ করত সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু এই মুহূর্তে মনেও হল না সেকথা। সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচের উর্ধ্বে সে এখন।

ক্লাশের দরজার সামনে উস্‌কো-খুস্‌কো চুল নিয়ে সে দাঁড়ায়। আজকে এই নিয়ে দুবার আসা হল তার। সকাল সাড়ে দশটায় এসেছিল হেডমাস্টারকে অনুরোধ করতে তার নাম যেন রাখা হয় ছাত্র হিসাবে। তারপর কয় ঘণ্টাই বা অতিবাহিত হয়েছে? ক্লাশের ছেলেরা একই বেঞ্চে বসে রয়েছে তখন থেকে। মাঝে শুধু টিফিনে একটু উঠেছিল। অথচ এই সময়টুকুর মধ্যে তার জীবনে ওলোটপালট ঘটে গেল। এখন আর সে একঘণ্টা আগেকার ক্ষেপার দুঃখে দুঃখী মৃণাল নয়, এখন সে খুনী।

ক্লাশসুদ্ধ ছেলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তাদেরই ফার্স্ট বয়—অথচ বেঞ্চিতে বসবার অধিকার নেই আজ। কারও দিকে দৃষ্টি পড়ে না মৃণালের। পড়লে দেখতে পেত বকুলের দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ—দেখত দেবু, সুশান্তর বাবার দৌলতে প্রমোশন পেয়ে গা টেপাটেপি করছে। দেখতে পেত, হাবলু ওদের দলে ভিড়ে গিয়ে হাসবার চেষ্টা করছে।

—স্যার।

হারু মাস্টার ভ্রূ কুঁচকে বলে,—এখানে কী?

—একটু বাইরে আসুন।

—কী বললি? বাইরে? স্কুল থেকে নাম কেটেছে বলে হুকুম করবি? জানিস এখনো তোকে কান ধরে ওঠ্‌-বোস্‌ করাতে পারি?

—খুব দরকার স্যার, একটু বাইরে আসুন।

মৃণালের চোখে মুখে এমন কিছু ছিল, যার জন্য বিরুক্তি না করে হারু মাস্টার বাইরে আসে।

—স্যার, আপনি একবার জানতে চেয়েছিলেন লক্ষ্মীদির জন্যে জীবন দিতে পারি কিনা—

—ভণিতা রেখে তাড়াতাড়ি বল। যত সব—

—স্যার, প্রাণ দেওয়া সহজ, কিন্তু অপমান সহ্য করা একটু কঠিন। তাই চলে যাচ্ছি। প্রাণ আমাকে দিতেই হবে—ফাঁসী কাঠে।

—কী বললি?

মৃণাল ধীরভাবে আমবাগানের ঘটনা বলে যায়। এমনকি অনেকদিন আগেও আমবাগানের মধ্যে কেষ্টকে দেখতে পেয়ে সাবধান করে দিয়েছিল, সেকথা বলতেও ভোলে না। সে দেখতে পায় তার কথা শুনতে শুনতে মাস্টার লক্ষ্মীদির মত কাঁপছে।

—স্যার, আপনি শক্ত হোন। নইলে কেষ্টদাকে হাসপাতালে পাঠানো যাবে না। সে মরে গিয়েছে হয়ত। কিন্তু প্রাণ থাকলে, তাড়াতাড়ি পাঠানো দরকার।

মৃণাল দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। তাকে এগিয়ে যেতে হবে—যেতে হবে শহরের সীমারেখার বাইরে—যেখানে পুলিশ তাকে ধরলে কেউ চিনবে না। পেছন ফিরে চাইলে সে দেখতে পেত হারু মাস্টার তার নাম ধরে ডাকবার চেষ্টা করছে, অথচ পারছে না। গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছে না। পাগলের মত শুধু দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে অদৃশ্য কাকে ধরবার চেষ্টা করছে। ক্লাশ থেকে কয়েকটি ছেলে ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলে।

রেল লাইনের দিকে চলতে শুরু করে মৃণাল। পথে দীপা মাসীর বাড়ি। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। দিবানিদ্রা বোধহয় এই বিকেলেও শেষ হয় নি মাসীর। এগিয়ে চলে সে। কিছুদূর গিয়ে দেখে জীবনদার বাড়ির বাইরে মাস্তুদি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছেলে হবে মাস্তুদির।

মাস্তুদি হেসে বলে,—কোথায় চললি রে?

—কাজে।

—ইস্ কী এমন কাজ। সব শুনেছি। তুই তো স্কুল ছেড়েছিস্।

মৃণাল এগিয়ে যায়।

মাস্তুদি পেছন থেকে বলে,—দেখিস্ তো, তোর কেষ্টদা আছে নাকি চায়ের দোকানে। এলো না তো—

মৃণাল জবাব দেয় না।

—কীরে, দেখবি তো? কথাই কানে যায় না যে—

রেল লাইনের কাছাকাছি যেতে একটা বেড়াল তার পিছু নেয়। শীর্ণ চেহারা—লোম-ওঠা। কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। সে ছুটলে বেড়ালটিও ডাকতে ডাকতে পেছনে ছোটে। অবাক হয় মৃণাল। দাঁড়িয়ে পড়ে। বেড়ালটি কাছে এসে তার গায়ের সঙ্গে গা ঘষতে শুরু করে। কারও পোষা বেড়াল নিশ্চয়ই। নইলে মানুষ দেখলে এত উতলা হবে কেন? খেতে চাইছে। দেখেই মনে হয়, খেতে পায় নি অনেক দিন। না খেতে পেলে খোকাও এমন করত। কেউ ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে। এ-ও হয়ত খোকার মত স্বাস্থ্য সম্পন্ন ছিল এককালে। এখন এই অবস্থা হয়েছে। বেড়াল জাতকে যদি প্রশ্ন করা যায় "স্বাধীন হবে?" ঠিক বলবে,—"না"। মনুষ্য সমাজে বাস করে স্বাধীনতা লাভ বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াবে। এটির যা হয়েছে। খোকারও হয়ত এমন হয়েছিল।

মৃণাল নীচু হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেড়ালটির দিকে চায়। তারপর তাকে কোলে লে নিয়ে বলে ওঠে,—খোকা তুই!

ম্যাও—

তোর এ দশা?

—ম্যাক্—কাও—

াণাল দাঁড়িয়ে পড়ে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার কথা মনে পড়ে। হরিণ শিশু াকুন্তলার আঁচল টেনে ধরেছিল। হাসি পায়। পথের ওপর বসে পড়ে খোকার ায়ে কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে বলে,—ও বাড়ি যাস্‌নে খোকা। অন্য জায়গা খুঁজে নে। ও বাড়িতে আমি থাকব না।

শষে এক সময়ে খোকাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে কঠোর স্বরে বলে,—আমার পছনে আসবি না বলছি। এলে ইট ছুঁড়ব। জানিস আমি খুনী। মানুষ খুন রেছি। তুই তো সামান্য বেড়াল।

বু খোকা সঙ্গ ছাড়ে না। মৃণাল একটা ইট তুলে নিয়ে খোকাকে লক্ষ্য করে মারে। য় পেয়ে খোকা পেছনে না সরে গিয়ে তারই পায়ের কাছে ছুটে আসে।

—এভাবে আত্মরক্ষা করতে নেই। এই দেখ তবে--

াণাল আস্তে লাথি মারে। খোকা একটু দূরে সরে যায়। আবার একটা ইট নিয়ে ুঁড়েই ছুটতে শুরু করে মৃণাল। একটু গিয়ে পেছন ফিরে দেখে খোকা করুণ দৃষ্টিতে ার দিকে চেয়ে রয়েছে—চোখে তার অপার বিস্ময়। এতদিন পরে হয়ত সন্দেহ করছে স, তাকে বস্তাবন্দী করে নির্বাসনে পাঠাবার চক্রান্তে মৃণালেরও সক্রিয় অংশ ছিল।

াইনের ওপর ওঠে মৃণাল। সেই শিমুল গাছ—স্লিপারগুলো তেমনি পড়ে রয়েছে। াবা তাকে কোলে তুলে নিয়েছিল ওইখানে। হোঁচট খেয়ে পায়ের নখ উঠে গেলেও স কাঁদে নি। আজও তার কান্না পাচ্ছে না। সে একটু দাঁড়িয়ে বাবা মায়ের মুখ নের মধ্যে আনবার চেষ্টা করেও পারে না। আবছা হয়ে গিয়েছে সব, আগের ত স্পষ্ট ভেসে ওঠে না। তবু সেই আবছা মুখ মনে করে একটু উচ্ছ্বাস মিশিয়ে াপন মনে কথা বলবার চেষ্টা করে, যাতে কান্না পায়।

লে,—বাবা তুমি চেয়েছিলে, তোমার ছেলে মানুষের মত মানুষ হোক। কিন্তু দেখো, ামি তা হতে পারলাম না। আমি খুনী হলাম। আমি বিপ্লবী হতে চেয়েছিলাম বা। বিপ্লবীরা এককালে প্রাণ বিসর্জন দিত ফাঁসীর মঞ্চে, আর খুনীরা মরে ফাঁসীর াঠে। দুটোই এদিকে এক।

ান্না পায় না। কারণ তার মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে, এখনো কি বিপ্লবীদের ফাঁসীর মঞ্চে যতে হয়? কখনো তেমন শোনে নি তো—

—বাবা, তুমি কান্না ভালবাসতে না মনে আছে। কেন ভালবাসতে না জানি না ; হারু মাস্টারের কথায় মনে হয়, কান্না মানুষকে দুর্বল করে দেয়—তার মনের দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে যায়। আমি কাঁদিনি। তবু মানুষ হতে পারলাম না। অথচ কেষ্টদা আজ না মরলে, যে করেই হোক তোমার ইচ্ছা পুর্ণ করব। কেষ্টদা যদি না মরে বাবা, আমি বক্সার মত নির্ভীক হব। আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ব।

পেছনে ঢক্ ঢক্—ঢক্ ঢক্ শব্দ শোনা যায়। কেবিনের কাছে এসে পড়েছে ইলেকট্রিক ট্রেন। তাই মিষ্টি হুইসেলের আওয়াজ। মুহূর্তের মধ্যে সাঁ করে বার হয়ে গেল। দূরে রেল লাইনের ওপর সূর্য নীচের দিকে নামছে। রক্তবর্ণ ধারণ করে নি ততটা। আরও নীচে নেমে ঠিক রেল লাইনের মাথায় বসে প্রকাণ্ড রেড-সিগ্ন্যাল জ্বেলে রাখবে। তারপর টপাটপ্ গাড়িগুলোকে গিলে খাবে।

সূর্যের কিরণ পৃথিবীর সব জীবাণু নষ্ট করে দেয়। পৃথিবীর স্বাস্থ্য সম্পন্ন করে রাখে মোটামুটি। সূর্যের উত্তাপ বাষ্প সৃষ্টি করে—জল দেয়—প্রাণীজগতের সৃষ্টি করে—তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। হারু মাস্টার বলে,—সব পাপের ক্ষয় করে দেয় ওই সূর্য—সর্ব পাপ বিনাশকারী। মাস্টার বলে,—বাইরের জীবাণুর মত অন্তরের জীবাণুকেও ধ্বংস করে দেয় ওই সপ্তাশ্বচালিত দেবতা। মাস্টারের মত কথায় কথায় সে সব কিছুকে দেবতা ভাবতে পারে না। ব্যথা বেদনা সে মোটামুটি সহ্য করেছে এটুকু জীবনে, কিন্তু কখনো মনে মনে ভগবান নামে অদৃশ্য কাউকে ডাকে নি। মনেও হয় নি ডাকতে। তবে বিস্ময়ে কোন কিছুকে যদি দেবতা বলা হয়, তাহলে সূর্য দেবতা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সপ্ত অশ্ব অর্থাৎ সাত রঙ,—ইংরাজীতে সংক্ষেপে মনে রাখতে হলে বলতে হয় ভিব্জিওর।

মৃণাল চেয়ে থাকে পশ্চিম দিকে। তার মনেও কি পাপ আছে? বুঝতে পারে না কেষ্টকে সে মেরে ফেলেছে—কিন্তু খুন করবে বলে মারে নি। কেষ্ট সাংঘাতিক এক অন্যায় করতে চলেছিল। তাকে ওভাবে না মারলে লক্ষীদি এবং সে—কারও নিস্তার ছিল না। তবু হয়ত সে অন্যায় করেছে। ওই সূর্য কি সেই অন্যায়টুকু ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে না?

মনে হয় মৃণালের, সূর্য তাকে আহ্বান জানাচ্ছে। ওটা আর রেড-সিগ্ন্যালের নিষেধ নয়—আহ্বানের হাতছানি। মনের কলুষ মুক্ত হবার সিংহদ্বার। হয়ত সে ধরা পড়বে—তার ফাঁসীও হবে। কিন্তু অন্তর থেকে সে জানবে—সে দোষ মুক্ত।

মৃণাল এগিয়ে যায়।

—মৃণালদা—

পাখী ছুটে আসছে লাইনের ওপার থেকে। পাখীর মাথায় চুলে নীল রঙের ফিতে

বাঁধা। ওর চুলের রাশি হাওয়ায় তবু উড়ছে।
আজ এতদিন পরে ও এল কেন? কথনো তো আসে নি। আজ কি শুক্রবার? হ্যাঁ, তাই বটে। আজ শুক্রবার।
কাছে এসে মৃণালের হাত চেপে ধরে হাসে আর হাঁপায় পাথী। তারপর একটু জিরিয়ে নিয়ে বলে,—আমার ওপর খুব রাগ করেছ, তাই না মৃণালদা?
—না তো।
—ইস্. বললেই বিশ্বাস করলাম। সাহস হয় না মৃণালদা। ভেবেছিলাম আমায় না দেখতে পেয়ে তুমি ওদিকে যাবে। শুক্রবার বিকেলে রোজ বাইরে বসে থাকি। তবু গেলে না।
মৃণাল কোন জবাব দেয় না। কী বলবে বুঝতে পারে না। পাথী যেন আজ অনেক দূরে সরে গিয়েছে। আগের মত আর তার সঙ্গে মেশা যায় না।
—তুমি এত গম্ভীর কেন মৃণালদা? হাসছ না একটুও।
—আমি চলে যাচ্ছি পাথী।
—কোথায়?
—ঠিক জানি না।
—সে কি!
মৃণাল কিছু বলতে পারে না। পাথীর মুথথানা থমথমে হয়ে ওঠে। অতি কষ্টে সে বলে,—তুমি তোমার দুঃথের কথা একদিন আমায় বলবে বলেছিলে।
—আমার এমন কিছু দুঃথ ছিল না পাথী। ভালভাবে থেতে না পাওয়া ততটা দুঃথ নয়, যদি পড়তে পারা যায়। লেথাপড়া শিথলে ওসব দুঃথ চলে যায়। তবে আমি অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছি। আমার মুথে আর হাতে যে সব দাগ দেথে তুমি ভাব, আমি খুব মারামারি করি, সেগুলো আমার কাকার লাঠি আর লাথির দাগ।
—উঃ।
—তোমায় কথা দিয়েছিলাম বলব বলে, তাই বললাম।
—তুমি চলে যেও না মৃণালদা। আর একটু সহ্য করতে পারবে না?
—একটু কেন? আমি আরও অনেক বেশী সহ্য করতে পারি। কিন্তু আজ চলে যেতেই হবে।
—যেও না মৃণালদা।
—আমি খুনী পাথী।
—খুনী?
—হ্যাঁ। তুমি আমাকে বাঘ বলতে। বাঘ মানুষ মারে। আমিও মেরেছি।

—আমি বিশ্বাস করি না।

মৃণাল তখন ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে। স্তব্ধ পাখী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। শেষে দৃঢ়স্বরে বলে,—তুমি তো কোন অন্যায় করো নি।

চমকে ওঠে মৃণাল। পাখীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চায়।

—আমি ঠিক বলেছি মৃণালদা। তুমি অন্যায় করো নি।

—কেউ শুনবে না সেকথা। পুলিশ আমাকে ধরবেই। আমার ফাঁসী হবে। তাই চলে যাচ্ছি।

পাখীর ওষ্ঠদ্বয় থরথর করে কাঁপতে থাকে। ওর চোখের জল টপটপ্ করে মাটিতে ঝরে পড়ে। অতি কষ্টে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,—বাঘ রোগা হলেও পালায় না।

—আমি তো পালাচ্ছি না। একটু দূরে সরে যাচ্ছি। ওই সূর্যের দিকে। সেখানে পুলিশ আমায় ধরলে কেউ চিনতে পারবে না।

পাখী কিশোরী—মৃণালের মতই অনভিজ্ঞ। তাই বলতে পারল না, একটি মেয়ের পবিত্রতা রক্ষা করতে মানুষকে হত্যা করাও আইনের চক্ষে ততটা অপরাধ নাও হতে পারে।

—চলি পাখী।

মৃণালের হাত চেপে ধরে মাথা ঝাঁকিয়ে পাখী বলে,—না।

—পাখী। কেষ্টদা যদি বেঁচে থাকে তাহলে আমার ফাঁসী হবে না। হাত ধরে থেকো না। ছেড়ে দাও।

—যেও না মৃণালদা।

একটু আগে খোকাও এইভাবে তার পথ রোধ করেছিল। তাকে ঢিল ছুঁড়ে নিবৃত্ত করতে হয়েছে। পাখীকে তো সে ঢিল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। কারণ পাখী তার মনের অপরাধ-বোধকে অনেক পরিমাণে লাঘব করে দিয়েছে। সে অবিচল কণ্ঠে বলেছে, কোন অন্যায় করে নি মৃণাল। পাখীর মনে সূর্যেরই প্রতিবিম্ব। সামনের ওই সূর্য।

—তোমার মত মেয়ে আমি কখনো দেখিনি পাখী। কখনো দেখব না। ফাঁসী যদি না হয়, তবে আবার তো আসব। তখন দেখা হবে। ছেড়ে দাও এখন।

মৃণালের কথার অবাধ্য হতে পারে না পাখী। হাত ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে থাকে।

মৃণাল লাইনের ওপর দিয়ে চলে। সূর্য লাইনের মাথায় এসে বসেছে। মৃণাল সেদিকে এগিয়ে যায়। তার দীর্ঘ ছায়া পাখীকে ছাড়িয়ে লাইন বরাবর আরও পুবে প্রায় কেবিনের কাছাকাছি চলে গিয়েছে। সেই ছায়া ধীরে ধীরে পাখীর কাছে আসে।

তারপর দূরে সরে যেতে থাকে। একটু ছুটে গিয়ে পাখী সেই ছায়ায় মৃণালের মাথা স্পর্শ করে। কিন্তু তখনি সরে যায় সেটি।

পাখী ডাকতে চেষ্টা করে মৃণালকে। পারে না। অনেক দূরে গিয়ে মৃণাল একবার দাঁড়িয়ে পেছনে ফেরে। হাত নাড়ায়। পাখীও হাত তোলে। সে সূর্যের পটভূমিকায় মৃণালের সর্বাঙ্গ কালো দেখে। তার মুখ দেখতে পায় না। শুধু তার চলার ভঙ্গিটা চিনতে পারে।

মৃণাল আবার চলতে শুরু করে।

পাখী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।